শকুন সৈনিক

ইন্দু দাঁ

মমতা প্রকাশনী
৬৮বি, নেতাজী সুভাষ রোড
কলিকাতা-১

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী মমতা দাঁ
মমতা প্রকাশনী
৬৮বি নেতাজী সুভাষ রোড
কলিকাতা-১

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া, ১৩৫৯

প্রচ্ছদচিত্রণ : দেবব্রত চক্রবর্ত্তী

মুদ্রক :
শ্রীবিজয় চন্দ্র চন্দ্র
শ্রীজগদ্ধাত্রী প্রেস
৫।২, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন
কলিকাতা-৭

উৎসর্গ

স্বাধীনতা পরবর্ত্তী কালে
কল্যাণ সাধনের ভার
অর্পিত হওয়া সত্ত্বেও
পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙালীর প্রতি
যথেষ্ট উদাসীন যাঁরা,
তাঁদের উদ্দেশে—

মুখবন্ধ

স্বাধীনতা পরবর্ত্তী কালে পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণ সাধনের ভার বারবার যাঁদের হাতে অর্পিত হয়েছে, তাঁরা দশকের পর দশক ধরে যে ভাবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে পরিচালনা করছেন এই ভাবে চললে অদূর ভবিষ্যতে এ বঙ্গভূমিতে বাঙালী জাতির অস্তিত্ব আদৌ থাকবে কিনা এই প্রশ্ন আমার অন্তরে বার বার জেগেছে এবং এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে কলম ধরতে হয়েছে। গল্পের খাতিরে কিছু স্থান কাল পাত্রের কথা লিখতে হয়েছে যার সঙ্গে বাস্তবের মিল নাও থাকতে পারে।

যাঁদের জন্য রচনা, এ-গ্রন্থ পাঠ পূর্ব্বক তাঁদের যদি সামান্যতম পরিবর্ত্তন ঘটে তবেই এ গ্রন্থের সার্থকতা।

ইন্দু দাঁ

লেখকের অন্য গ্রন্থ সমূহ

উপন্যাস ঃ

উষ্ণ হৃদয় শীতল হাওয়া

বড়বাজার

ওষুধ

বেড়াদার

শেষ স্পর্শ

গল্পগ্রন্থ ঃ

সৈকত

ছোটদের ছবিছড়া ঃ

দ্যাবারাম চালুরাম

সকাল থেকে সন্ধ্যে

কাব্য ঃ

কাব্য সুষমা

মনশ্রী

পীযূষ পেয়ালা

বকুল কোরক

মৌন নির্ঝর

অবরুদ্ধ অভিমানে

কল্পনার ক্যানভাস

বিক্ষুব্ধ সংলাপ

নিঃশব্দ অস্তিত্ব

গীতগ্রন্থ ঃ

বিরহবীণ

শকুন সৈনিক

কুরচি গ্রামের বাড়ীটায় ঢুকলে বড় একটা সাড়া পাওয়া যায় না ছেলেটির। ছোটবেলা থেকেই ছেলেটি একটু বেশী রকমের চুপচাপ। যদিও সংসারের কর্মভার আপন স্কন্ধে তুলে নেবার বয়স তার হয় নি, তবু সংসারের ছোটখাট অনেক কাজই সে নির্বিবাদে করে দেয়, আর, এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক অনটনের শতেক পীড়নের মধ্যে থেকেও স্কুল-কলেজের প্রত্যেকটি পরীক্ষায় ভাল ফল করে সে এখন বিজ্ঞান বিভাগে সাম্মানিক রসায়ন শাস্ত্র নিয়ে স্নাতক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

তেরশ' একানব্বইয়ের বৈশাখের পাঁচ তারিখ। আজ দুপুর থেকেই কুরচি গ্রামের আকাশ জুড়ে কালো মেঘের ঘনঘটা। আজও বাড়ীর পূর্বদিকের দাওয়ায় বসে পড়াশুনায় মগ্ন ছিল অভিরূপ। এমন সময় হঠাৎ দুপুরের আলো কমে অন্ধকার নেমে এল। বেশ কিছুক্ষণ থমথমে গুমোট ভাব থাকার পর অল্প-অল্প এলোমেলো হাওয়া শুরু হল এবং ঐ এলোমেলো হাওয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই কালবৈশাখীতে পরিণত হল! আচম্বিতে ঝড় ওঠায় বাবা মুরারিবাবুর নির্দেশে অভিরূপ বই-খাতা গুটিয়ে ঘরের মধ্যে রেখে দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়ে একমনে ঝড় দেখতে লাগল, আরও মিনিট দুয়েকের মধ্যে ঝড়ের দোসর বৃষ্টি এসে পড়ল। পুবের দাওয়ার পাশেই এক ঝাড় কলাগাছ এবং তার ঠিক গা ঘেঁষে উঠে গেছে দুটো তালগাছ।

অভিরূপ দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একমনে ঝড়ের প্রতাপ ও বৃষ্টির দাপট দেখছিল, এমন সময় মা শ্রীলেখা দেবী পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'ঘরে যা বাবা, গায়ে বৃষ্টির ঝাপ্‌টায় ঠাণ্ডা লেগে যাবে।' মায়ের কথায় কোন উত্তর না দিয়ে অভিরূপ যেমন ছিল ঠিক সেই রকম দাঁড়িয়ে কালবৈশাখীর উন্মত্ত দাপট দেখতে লাগল। ঝড়ের দাপটে দাওয়ার সামনে কলাঝাড়ের প্রত্যেকটা কলাপাতা ছিঁড়ে তছনছ হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে, পাশের তাল-

গাছ দুটো এমন দুলছে যে, মনে হচ্ছে এখনই গোড়া শুদ্ধ্ উপড়ে হুড়মুড় করে বাড়ীর টিনের চালের উপর পড়বে। দেখতে দেখতে অভিরূপ বেশ কিছুটা শঙ্কিত হয়ে উঠল। এমন সময় কোথা থেকে একটা পাতা সমেত তেঁতুলের ভাঙ্গা ডাল উড়ে এসে ঝপাং করে তাদের উঠোনের মাঝখানে পড়ল। মিনিট খানেকের মধ্যে একটা ভাঙ্গা দোমড়ান জং-ধরা করোগেটেড টিন সীট উড়ে তাদের বেড়ার গায়ে এসে পড়ল। আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ হচ্ছে না ভেবে অভিরূপ যেই ঘরে ঢুকবে বলে পিছন ফিরেছে অমনি ঝুপঝুপ করে কলাগাছের উপর কিসের শব্দ হ'ল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে কিছু বুঝতে না পেরে অভিরূপ চট্ করে ঘর থেকে একটা ছাতা নিয়ে উঠোনে নেমে কলাগাছের ঝাড়ের কাছে গিয়ে দেখল যে, সেখানে দুটো শকুনের বাচ্চা পড়ে রয়েছে। অভিরূপের বুঝতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হ'ল না যে, প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে তালগাছের বাসা থেকে আশ্রয়চ্যুত হয়ে বাচ্চা দুটো ঐখানে পড়েছে। বাচ্চা দুটো জলে ভিজে প্রায় আধমরা হয়ে গেছে এবং শীতে প্রচণ্ড কাঁপছে দেখে অভিরূপ 'মা মা' বলে চিৎকার করে উঠতেই বারান্দার একপাশে উপবিষ্টা শ্রীলেখা দেবী তাড়াতাড়ি উঠে এসে বললেন, 'কি হয়েছে? চেঁচাচ্ছিস কেন?' 'দ্যাখ দ্যাখ মা, শকুনের বাচ্চা দুটো কি রকম হয়ে গেছে বৃষ্টিতে ভিজে! এখুনি মরে যাবে, মা তাড়াতাড়ি একটু আগুন করে দাও, বাচ্চা দুটোকে সেঁকব, না হলে ওরা মরে যাবে। আর তুমি কেরোসিন-কুকার জেলে একটু দুধ গরম করে দাও, ওদের খাওয়াব।'

অভিরূপের কথায় শ্রীলেখা বিস্মিত হয়ে একবার ছেলের দিকে তাকালেন কিন্তু মুখে কিছু বললেন না, কারণ তিনি ভালই জানেন তাঁর একমাত্র সন্তান অভিরূপ কি রকম জেদী; সে যখন জিদ ধরেছে তখন শকুন বাচ্চাই হোক আর যাই-ই হোক তাকে সেঁকতেও হবে আর গরম-দুধও দিতে হবে। অভিরূপ কলাতলা থেকে বাচ্চা দুটোকে হাতে নিয়ে উঠোন পেরিয়ে যেই বারান্দায় উঠতে যাবে এমন সময় একটা ধেড়ে শকুন এসে তার মাথায় ছোঁ

মারবার চেষ্টা করল, অভিরূপের মাথাটা ছাতার জন্য বেঁচে গেল, কিন্তু ছাতার কাপড়টা শকুনের নখের খোঁচায় ছিঁড়ে গেল। শকুনের সজোরে ছোঁ মারার জন্য অভিরূপ ছাতা সমেত প্রায় উল্টে পড়েই যাচ্ছিল, কিন্তু কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বারান্দায় উঠে এসে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল দু-দুটো ধেড়ে শকুন তখন তালগাছ থেকে নেমে তাদের বাড়ীর বেড়ার বাঁশের উপর বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তারই দিকে চেয়ে আছে। শকুন দুটোর দৃষ্টি দেখে অভিরূপের সামান্য ভয় হ'ল ; কিন্তু ততক্ষণে শ্রীলেখা দেবী একটা মাটির মালসায় খান-চারেক ঘুঁটে পুড়িয়ে আগুন করে নিয়ে সেখানে হাজির হলেন। মায়ের হাত থেকে আগুনের মালসাটা নিয়ে ছাতাটা মাকে ধরিয়ে দিয়ে অভিরূপ বাঁশের বেড়ার উপর বসে-থাকা শকুন দুটোকে দেখিয়ে বলল, মা এই ছাতাটা নিয়ে তুমি একটু পাহারা দাও, না হলে এদের মা-বাবা আমায় ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।' ছেলের কথার ইঙ্গিত বুঝে শ্রীলেখা দেবী ছাতা হাতে গিয়ে বেড়ার উপর থেকে ধেড়ে শকুন দুটোকে তাড়িয়ে দিলেন, তারা তীব্র চিৎকার করে উড়ে গেল বটে কিন্তু মিনিট খানেকের মধ্যেই পুনরায় এসে বেড়ার উপর বসল। শ্রীলেখা দেবী আবারও ছাতা হাতে তাদের তাড়া করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু অভিরূপ মাকে বারণ করে বলল, 'মা, তুমি বৃথাই ওদের তাড়াচ্ছ, তোমার ছেলের কাছ থেকে তোমাকে যদি কেউ চলে যেতে বলে, তুমি পারবে? ওদের না তাড়িয়ে বরং ত্রকটু পাহারা দাও যাতে ওরা আমায় ছোঁ না মারতে পারে।' অভিরূপের কথায় শ্রীলেখাদেবী একটু বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'শকুন বাচ্চার জন্যও তোর দরদ আবার তার মায়ের জন্যও দেখছি দরদ তোর কম নয়, তা এই শকুন সেবা করে কি পুণ্যি হবে?' অভিরূপ বলল, 'পুণ্যি কিছু হবে কিনা জানি না মা তবে ছোট-বেলা থেকে তোমার কাছ থেকেই যা শিক্ষা পেয়েছি তাতে এটুকু বুঝি যে, শকুনমাতাও মা, তার পক্ষী-হৃদয়েও মায়ামমতা আছে, না হ'লে দেখছ না বাচ্চাগুলো পড়ে যেতেই ওরাও যুগলে চঞ্চল হয়ে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে গাছ থেকে নীচে নেমে এসে বেড়ার উপর

কেমন বসে আছে!' ছেলের সঙ্গে কথা বাড়ানো বৃথা বুঝে এবং সমস্ত ব্যাপারটা আপন মাতৃহৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে অনুধাবন করে শ্রীলেখাদেবী চুপ করে গেলেন।

ইতিমধ্যে কিছুক্ষণ সেঁক-তাপ দেওয়াতে বাচ্চা দুটোর কাঁপুনি বন্ধ হয়েছিল, এবার অভিরূপ আঙ্গুল দিয়ে ঠোঁঠ ফাঁক করে একে একে তাদের দুধ খাওয়াল। ধেড়ে শকুন দুটো কিন্তু তখনও অভিরূপ ও বাচ্চা দুটোর উপর নজর রেখে বেড়ার উপর ঠায় বসেছিল এবং মাঝে মাঝে কর্কশ কণ্ঠে ডেকে উঠছিল।

সেঁকতাপ পেয়ে এবং গরম দুধ পান করে কিছুক্ষণের মধ্যে বাচ্চা দুটো বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। বাচ্চাগুলো এতই ছোট যে, তাদের উড়ে যাবার মত ডানার জোর তখনও হয় নি, তাই অভিরূপ ঠিক করল বাচ্চা দুটোকে কয়েক দিন এখন বাড়ীতেই রাখবে এবং একটু বড় হলেই ছেড়ে দেবে যাতে তারা নিজেরা উড়ে নিজেদের বাসায় যেতে পারে। নিজের চিন্তাধারাটা সে সঙ্গে সঙ্গে মাকে জানিয়ে দিতেই শ্রীলেখাদেবী বললেন, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? হিন্দুর ছেলে, এও জানিস না! বাড়ীতে কি কেউ শকুন পোষে? সেঁকেছিস খাইয়েছিস, ঝড় কমে গেলে ওদের ঐ বেড়ার উপর বসিয়ে দে ওদের মা-বাবারা ঠিক ঠোঁটে করে ওদের তুলে নিয়ে যাবে, বাড়ীতে ওদের পুষে রাখলে বাড়ীর কারও একগাছি চুল ও থাকবে না, দিন-রাত ঐ ধেড়ে শকুন দুটো নামবে আর ছোঁ মেরে-মেরে সকলকে শেষ করে দেবে।' মায়ের কথাটা নেহাৎ অযৌক্তিক নয় ভেবে অভিরূপ শকুন বাচ্চা দুটোকে ছেড়ে দেওয়াই ঠিক করল এবং ঝড় থামলে সে বাচ্চা দুটোকে বেড়ার উপর বসিয়ে দিল; কিন্তু বড় শকুন দুটো বার বার ছোঁ মেরেও ওদের ঠিক ধরতে পারল না, শুধু ক্ষত-বিক্ষত করে তুলল দেখে অভিরূপের মায়া হল, সে আবার বাচ্চা দুটোকে এনে দাওয়ায় একটা ঝুড়ি চাপা দিয়ে রেখে দিল। রাত্রে শুতে যাবার আগে তাদের আরও একবার দুধ খাওয়ালো এবং সাবধানে রেখে দিল যাতে বিড়াল বা অন্য কোন জন্তু-জানোয়ার ওদের খেয়ে ফেলতে না পারে।

পর দিন বর্দ্ধমানে কলেজে যাবার সময় মাকে ওদের যত্ন করতে অনুরোধ করে অভিরূপ বের হয়ে গেল, সন্ধ্যায় কলেজ থেকে ফেরবার সময় বর্দ্ধমানের রানীগঞ্জ বাজার থেকে একটা সস্তা দেখে খাঁচা কিনে আনল এবং তাতে শকুন বাচ্চা দুটোকে ভরে দাওয়ার কাঠামোর শরদলের কাঠের সঙ্গে ভালভাবে বেঁধে খাঁচাটা ঝুলিয়ে দিল। দু-তিন দিন যত্ন করে খাওয়ানোতে শকুন বাচ্চা দুটো বেশ চাঙ্গা হ'য়ে উঠল। প্রত্যেক দিন সকাল থেকে প্রায় সারাদিনই ধেড়ে শকুন দুটো উড়ে এসে বেড়ার উপর বসে থাকে এবং খাঁচার দিকে লক্ষ্য রাখে, মাঝে-মাঝে কর্কশ স্বরে ডেকে ওঠে; সে ডাকের প্রত্যুত্তরে বাচ্চা দুটোও খাঁচার মধ্যে থেকে চিঁ চিঁ করে সাড়া দেয়। মাঝেমাঝে ধেড়ে শকুন দুটো বেড়ার উপর থেকে উড়ে খাঁচার কাছে আসে, খাঁচাটা ঠোকরায় আবার চলে যায়। অভিরূপ পড়াশোনার ফাঁকেফাঁকে সব কিছুই লক্ষ্য রাখতে থাকে। এভাবে প্রায় দিন পনর কেটে গেল, ইতিমধ্যে অভিরূপ আদর করে বাচ্চা দুটোর নাম রাখল। একটার চেহারা একটু ছোটখাট, তাই তার নাম দিল 'বেঁটে'; আর একটা বেশ বড়সড় হয়ে উঠছে তার নাম রাখল 'বীর'। এখন সে প্রায়ই শকুন বাচ্চা দুটোকে নাম ধরে ডাকে এবং আশ্চর্য হয়ে দেখে যে, কয়েক দিনের মধ্যেই নাম ধরে ডাকলে বাচ্চা দুটো মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে চায় এবং চিঁ চিঁ শব্দ করে। অভিরূপের মনে হয় এ বুঝি তারই ডাকের প্রত্যুত্তর। প্রথম-প্রথম দু-একদিন ধেড়ে শকুন দুটো বাড়ীর লোককে ঠোকরাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তারপর আর সে চেষ্টা করে নি, কারণ হয় তো তারা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের বাচ্চারা বেশ যত্নেই আছে। দুপুরের দিকে বাড়ীটা নিঝুম হ'লে ধেড়ে দুটো একে-একে খাঁচার গায়ে এসে বসে, খাঁচার তারের ফাঁক দিয়ে বাচ্চাদের ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে আদর করে, আবার চলে যায়।

এভাবে মাস দেড়েক কেটে গেলে পর বেঁটে আর বীর বেশ বড়সড় হয়ে উঠল। এখন ওদের ডানাগুলোও বেশ বড় হয়েছে এবং খাঁচার ভিতরেই মাঝে-মাঝে ডানা ঝাপটে ওড়বার চেষ্টা করে। ওদের ডানা

ঝাপটানো দেখে শ্রীলেখা দেবী একদিন ছেলেকে বললেন, 'অভিরূপ ! বাবা এবার শকুন বাচ্চা দুটোকে ছেড়ে দে, ওরা বেশ বড় হয়ে উঠেছে, এখন ওরা বাসায় যেতে পারবে।' মায়ের কথা শুনে অভিরূপও বুঝল, সত্যিই বেঁটে আর বীরকে এবার ছেড়ে দেবার সময় হয়েছে, কিন্তু ছাড়তে যেন তার মন সায় দিচ্ছে না, বেঁটে-বীরের প্রতি কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে, তাই মায়ের কথায় দিচ্ছি দেব করেও আরও কয়েকটা দিন শকুন বাচ্চা দুটোকে খাঁচাতেই আটকে রাখল, অবশেষে আরও দিন সাতেক কেটে যাবার পর একদিন রবিবার সকালে সত্যি-সত্যিই বেঁটে ও বীরকে খাঁচা থেকে বাইরে এনে মাথায় ও শরীরে হাত বুলিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আদর করে একে-একে তাদের আকাশের দিকে উড়িয়ে দিল। ছোট-ছোট শকুন দুটো আচম্বিতে মুক্তির স্বাদ পেয়ে নীল আকাশের সুদূরে উড়ে চলে গেল। বাচ্চা দুটোকে উড়তে দেখে তাদের মা-বাবাও তাল গাছের মাথা থেকে উড়ে তাদের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। নীচে উঠোনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে নিবিষ্ট চিত্তে অভিরূপ চার শকুনের উড়াউড়ির খেলা দেখতে লাগল। মিনিট পনের আকাশে উড়ে বেঁটে ও বীর এসে আবার তাদের বেড়ার উপর বসল এবং সঙ্গে সঙ্গে ধেড়ে শকুন দুটোও তাদের কাছে এসে বসল। দু-এক মিনিট বেড়ার উপর বসে চার শকুন মিলে বেশ কিছুটা চিঁহি-চিঁহি করে আওয়াজ তুলে তালগাছের মাথায় চলে গেল। অভিরূপের মনে হল বাসায় যাবার আগে যেন শকুন চারটে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে গেল।

বেঁটে বীর চলে যাওয়ার পরে অভিরূপের মনটা বেশ বিষন্ন হয়ে পড়ল। সে আজ পড়তে বসল না, প্রায় সারাদিনই বাড়ীর দাওয়ায় বসে তালগাছের মাথার দিকে তাকিয়ে থাকল। দেখতে দেখতে অভিরূপ বুঝল উপর থেকে শকুন চারটেও গলা উঁচিয়েও মাঝে-মাঝে তার দিকে চেয়ে দেখছে। দুপুরের দিকে বেঁটে আর বীর আবার এসে বেড়ার উপর বসল, অভিরূপ কাছে গিয়ে তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিল, তারা কিন্তু উড়ে যাবার চেষ্টা করল না, বরং কুটকুটে

চোখগুলো বন্ধ করে অভিরূপের হাতের আদরটুকু বেশ রসিয়ে-রসিয়ে উপভোগ করল এবং চিঁ-চিঁ করে ডাকতে শুরু করল। অভিরূপ চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাদের আনন্দটুকু নিজেও উপভোগ করতে থাকল, এমন সময় হঠাৎ বেঁটে উড়ে রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়ে বসল। রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়ে বসা দেখে শ্রীলেখা দেবী বুঝলেন যে, শকুন দুটোর খিদে পেয়েছে, তাই তিনি দুটো মালসায় করে ওদের জন্য ভাত তরকারি দু' একটা মাছের টুকরো এনে উঠোনের একপাশে নামিয়ে দিলেন। খাবারগুলো পেয়ে বেঁটে ও বীর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো খেতে শুরু করে দিল এবং খাওয়া শেষ করে একটু এদিক ওদিক চেয়ে শকুন বাচ্চা দুটো আবার উড়ে তাদের বাসায় চলে গেল।

পক্ষীবিশারদ না হয়েও অভিরূপ ও শ্রীলেখা দেবী বুঝলেন শকুন বাচ্চা দুটো সত্যিই তাদের আদর-যত্নের মায়ায় পড়ে গেছে, তাই তারা শকুন মাতা-পিতার কাছ থেকে উড়ে তাদের বাড়িতে খেতে এসেছে। তাদের এই খেতে আসা এবং খেয়ে চলে যাওয়া দেখে অভিরূপ হাসতে-হাসতে মাকে বলল, 'মা, এই কুটুম জোড়াটি বোধহয় তোমার পাকাপাকি অতিথি হয়ে গেল, মনে হচ্ছে বাবুরা খাওয়ার সময় হলেই এখানে আসবেন।' 'আহা, তা আসুক, ওরা আর কতটুকু খাবে? তাছাড়া আমাদের সংসারের হেঁসেলে ভাত-ডাল যা বেড়ে যায় তাই দিয়েই ওদের হয়ে যাবে। সেজন্য চিন্তা করতে হবে না, তবে এই গরু-খেকো ভাগাড় খেকো ধেড়েগুলোর কাছে তালগাছে থাকবে আর এখানে খেতে আসবে এইটেই যা মুস্কিল।' 'মুস্কিল আর কি মা! ওরা যদি ভাগাড়ে না যায়, নোংরা না ঘাঁটে, তা'হলে আর মুস্কিল কি আছে?' ছেলের কথায় মা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, 'না, যাবে না, তুই কি সারাদিন ওদের পাহারা দিয়ে বেড়াবি?' শ্রীলেখার মৃদু ধমকের সুরে বলা কথাগুলোর উত্তরে অভিরূপ স্বগতোক্তির মত ধীরে-ধীরে বলল, 'দেখো, কোনদিন ভাগাড় খেতে যাবে না, কারণ ছোটবেলা থেকে দুধ-ভাত, মাছ-ভাত, গুগ্‌লি ভাত এসবে অভ্যেস হয়ে গেছে ওরা আর ভাগাড় খেতে যাবে না,

গেলে আজকে খাবার সময় ওরা এখানে আসত না।' কথাগুলো খুব জোরের সঙ্গে বলতে না পারার কারণ অভিরূপ এভাবে বললেও মনে মনে তার একটা দ্বন্দ্ব থেকে যাচ্ছিল, সে ভাবছিল শকুন রক্ত যাদের ধমনীতে প্রবহমান সেই বেঁটে আর বীর কি ভাগাড় না খেয়ে থাকতে পারবে? শেষ পর্যন্ত তাই ভয়ে-ভয়ে দ্বিধান্বিত চিত্তেই কথাগুলো সে মাকে বলল। মা ছেলের কথার মাঝে মুরারিবাবু যে কখন এসে দাওয়ায় উপস্থিত হয়েছিলেন সেটা কেউই খেয়াল করে নি। অভিরূপের কথা শেষ হতে না হতে তিনি শ্লেষের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'ও দুটো কি বামুনের ঘরের বিধবা যে, ভাগাড়ে না গিয়ে দুধ ভাত খেয়েই জীবন কাটাবে?' বেশ রাগতকণ্ঠে কথাগুলো বলে তিনি স্থান ত্যাগ করলেন। বেশ কিছুদিন শকুন দুটোকে নিয়ে অভিরূপ ও তার মায়ের বাড়াবাড়ি দেখে ভিতরে-ভিতরে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন, তাই এতদিন পরে এই কথা ক'টির মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, শকুন নিয়ে এ ধরণের বাড়াবাড়ি তিনি আদৌ ভাল চোখে দেখছেন না। এই ভাল চোখে না দেখার কারণ বাড়ীর খাবার খরচ হচ্ছে বলে যতটা না, তার থেকে বেশী শকুন নিয়ে বাড়াবাড়িতে অভিরূপের পড়াশুনা ব্যাহত হচ্ছে বলে। মুরারিবাবু নিজে লেখাপড়া বেশী দূর শিখতে পারেন নি, ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরই বাবা মারা যেতে তাঁকে জোত্-জমি, চাষবাস দেখাশুনার জন্য পড়াশুনা ছাড়তে হয়েছিল। তাঁর কাকারা পিতৃবিয়োগের মাস দুয়েকের মধ্যেই তাদের একান্নবর্তী পরিবার থেকে পৃথক করে দিয়েছিলেন। নিজের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পড়াশুনা করে উঠতে পারেন নি বলে ছেলের পড়াশুনার ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ, তাই পড়াশুনায় দু' একদিন ফাঁকি দিলে অভিরূপের প্রতি তাঁর বুকের গভীরে অভিমান জমে ওঠে। অভিরূপও বাবার এই দুর্বলতার কথা জানে বলেই লেখাপড়ায় কোনদিন ফাঁকি দেয় না এবং সেইজন্যই স্কুল কলেজে পরীক্ষার ফল তার বরাবরই ভাল হয়। বাবার হঠাৎ এই উষ্মার কারণ বুঝে আর মুহূর্তমাত্র দেরী না করে সে পড়ার ঘরে ঢুকে গেল।

অভিরূপ লক্ষ্য করছে প্রতিদিন কলেজ যাবার সময় বাড়ী থেকে বের হয়ে বাস ষ্ট্যাণ্ডের দিকে পা বাড়ালেই বেঁটে আর বীর তালগাছ থেকে উঠে তার মাথার উপর চক্কর দিয়ে উড়তে-উড়তে বড় রাস্তার ধারে বাসষ্ট্যাণ্ড পর্যন্ত আসে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বাস না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত কাছাকাছি কোন একটা গাছের ডালে বসে থাকে কিংবা অদূর শূন্যে উড়তে থাকে, আবার বিকেলে তার ফেরার সময়ও বাস ষ্ট্যাণ্ডের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করে। বেঁটে ও বীরের এই কাণ্ড দেখে অভিরূপের বেশ মজা লাগে : মাঝে-মাঝে আপন মনে হাততালি দিয়ে সে 'এই বেঁটে, এই বীর' বলে চিৎকার করে ওঠে আর পাখি দুটোও তার কাছাকাছি হবার চেষ্টা করে।

পনেরই আগষ্ট ছুটির দিন মুরারি বাবুর শরীরটা খারাপ, শ্রীলেখা বেলা দশটা নাগাদ পড়ার ঘরের কাছে এসে অভিরূপকে বললেন, 'বাবা, তোর বাবার শরীরটা আজ বেশ ভাল নেই, মজুরদের জলখাবারটা মাঠে দিয়ে আয়।' মায়ের কথায় অভিরূপ গিয়ে এলুমিনিয়ামের গামলায় চারজন মজুরের জলখাবার সাজিয়ে গামছায় বেঁধে কাঁধে করে মাঠে দিয়ে ফিরছে এমন সময় ঠিক তার পিছনে হাত পাঁচেক দূরে ঝপাং করে একটা শব্দ হতেই অভিরূপ পিছন ফিরে দেখতে পেল বেঁটে ততক্ষনে একটা বিষধর আল-কেউটে সাপের ড্যাক ঠোটে করে তুলে নিয়ে উড়ে গিয়ে দূরের একটা গাছে বসল এবং আছড়ে আছড়ে সাপটাকে মেরে ফেলল। সাপটা মরে যেতেই সেটাকে ফেলে দিয়ে বেঁটে আবার এসে অভিরূপের মাথার কাছাকাছি উড়তে লাগল। অভিরূপ ব্যাপারটা দেখে হতভম্ব হয়ে হাত দুটো জোড়া করে কপালে ঠেকিয়ে বেঁটেকে ধন্যবাদ ও ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রণতি জানিয়ে মনে মনে বলল, 'রাখে হরি তো মারে কে? বাঃ বেঁটে বাঃ তুই আমার রক্ষাকর্তা, তুই-ই আমার ভগবান।' এরপর দ্রুত সে বাড়ীর দিকে পা চালাল, কারণ ঘটনাটা মাকে বলার জন্য তার মনটা ততক্ষণে ছটফট করতে শুরু করেছে। বাড়ীতে এসে মাকে সব বলতেই মা ছেলের বুকে-মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'ইস্ ভাগ্যিস বেঁটে ছিল, তা

না হলে আজ কি যে হত।' এর পর তিনি মুরারিবাবুকে ঘটনাটা বলবার জন্য ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। সব শুনে মুরারিবাবু কোন মন্তব্য না করে চুপ করে রইলেন, তাঁর মুখ দেখে শ্রীলেখার মনে হল হয়ত ব্যাপারটা তিনি বিশ্বাস করেন নি, তাই একবার স্বামীর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি নিজের কাজে চলে গেলেন।

দিন কয়েক পর একদিন সকালবেলায় মায়ের চিৎকারে অভিরূপ পড়ার ঘর থেকে দৌড়ে বের হয়ে এসে শুনতে পেল মা বলছেন, 'যাঃ মুখপোড়া, কাকে চায়ের চামচ নিয়ে পালাল, যাঃ আমার নতুন চামচখানা, মাত্র মাস-খানেক আগে দু-দুটো ছেঁড়া জামা দিয়ে বাসন-ওয়ালার কাছ থেকে নিয়েছি, আর কাকে নিয়ে পালাল!' মায়ের বিলাপধ্বনিতে সচকিত হয়ে অভিরূপ আকাশের দিকে চেয়ে দেখল একটা কাক চামচটা ঠোঁটে চেপে ধরে উড়ে দূরে চলে যাচ্ছে। অভিরূপ ও শ্রীলেখা দেখলেন তালগাছের মাথা থেকে বেঁটে ও বীর উড়ে গিয়ে দুদিক থেকে কাকটাকে ঠোকর মারতেই কাকটা ভয়ে চামচটা ছেড়ে দিয়ে পালাল। জায়গাটা আন্দাজ করে অভিরূপ গিয়ে চামচটা কুড়িয়ে নিয়ে এসে মাকে দিল। শকুনদুটোর এরূপ কাণ্ডকারখানা আজ দাওয়ায় বসে মুরারিবাবুও লক্ষ্য করলেন এবং নিজের অজান্তেই তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি মনে মনে ভাবলেন—সত্যি এ তো আজব কাণ্ড। কত আত্মীয়-স্বজনে তাঁর কত দ্রব্য আত্মসাৎ করেছে, এখনও চেষ্টা করছে, আর সামান্য শকুনে চামচ উদ্ধার করে দিল। সব কাজের ফাঁকে-ফাঁকে আজ সারাদিনই মুরারিবাবু তালগাছের মাথার দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। দুপুরে বেঁটে আর বীর ভাত খেতে এলে আজ মুরারিবাবু তাদের কাছে গিয়ে তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। শকুন-দুটো আনন্দে চিঁচিঁ রব তুলল।

এদিকে বর্ষা গিয়ে শরৎকাল পড়ে গেছে, প্রস্ফুটিত কাশফুলে মাঠ-ঘাট সাদা হয়ে গেছে, আকাশে কোদালে-কুরুলে মেঘের খেলা, পল্লী-প্রকৃতি ফসলের কৈশোরের চঞ্চলতায় উদ্বেল। দুর্গাপূজার আর সামান্য কয়েকদিন বাকী। সেদিন সোমবার, অভিরূপের কলেজ

যাবার সময় মুরারিবাবু তাঁর সেভিংস য়্যাকাউন্টের পাঁচশ টাকার একটা চেক সই করে দিয়ে তাকে বললেন, 'এই চেকটা বর্দ্ধমানের স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙ্গিয়ে আনিস, সামনে পুজো, মুনিষ-রাখালদের জামা-কাপড় দিতে হবে, বাড়ীরও টুকটাক জিনিষপত্র কিনতে হবে, চেকটা ভাঙ্গিয়ে সাবধানে টাকা আনবি। পথে-ঘাটে বাসে-ট্রেনে আজকাল বড় চোর ছ্যাঁচোড়ের বাড়াবাড়ি, দেখিস সাবধানে আনিস।' নিজেদের আর্থিক সামর্থের কথা অভিরূপ ভালই জানতো, তাই বাবা বারবার 'সাবধানে আনিস' বলায় তার বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না যে তাদের সামান্য সঞ্চয় থেকে পাঁচশ টাকা পকেট মার হয়ে গেলে বা ছিনতাই হয়ে গেলে কতটা ক্ষতি হবে। সামান্য বিঘে চৌদ্দ জমি থেকে আজকালকার কর্মবিমুখ সদা-আন্দোলন-প্রবণ ক্ষেত-মজুরদের দাবীদাওয়া মিটিয়ে সংসারের খরচ, তার পড়াশুনার খরচা, যাতায়াতের খরচখরচা চালিয়ে বাবার হাতে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাই বহুকষ্টে সঞ্চিত সামান্য অর্থ থেকে পাঁচশ যাওয়াটা তাদের কাছে পঞ্চাশ হাজার যাওয়ার মতই, সুতরাং সে 'আচ্ছা সাবধানেই আনব' বলে বের হয়ে গেল।

কলেজে পেঁৗছে সকালের দিকের গোটা কয়েক ক্লাস করে অভিরূপ বেলা দেড়টা নাগাদ ব্যাঙ্কে গিয়ে চেক ভাঙ্গিয়ে টাকা নিয়ে ব্যাগে ভরে তিনকোনিয়া বাসস্ট্যাণ্ডে এসে 'বর্দ্ধমান-কামাল' বাসে উঠল। বাসে ওঠার সময় গেটেতেই তার ব্যাগটায় একটা প্রচণ্ড টান অনুভব করল, অভিরূপের মনে হল ব্যাগের ষ্ট্র্যাপ ছিঁড়ে তার কাঁধ থেকে ব্যাগটা বের হয়ে গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতটা দিয়ে শক্ত করে ব্যাগটা ধরে একটা সিট খুঁজে নিয়ে বসে পড়ল, বসেও তার শান্তি হল না, মনের ভিতর একটা সন্দেহের দোলা খেলা করতে শুরু করল। সে ভাবতে লাগল নিশ্চয়ই ব্যাঙ্ক-গেট থেকে কোন চোর অনুসরণ করে এসেছে এবং বাসে ওঠার সময় অসতর্ক মুহূর্তে ব্যাগ ধরে জোরে টান মেরেছে, সে চুপচাপ বসে বাসের ভিতরটায় ভাল

করে চোখ বুললো কিন্তু কিছু বুঝতে পারল না, তবে বারবার বাবার সাবধান বাণী তার মনে হতে লাগল।

সারা রাস্তা অত্যন্ত সতর্ক হয়ে বসে শেষে বেলা প্রায় চারটে নাগাদ অভিরূপ নিজের গ্রামের ধারে পাকা রাস্তার উপর নামল। নিজের গ্রামের কাছে পৌঁছে গেছে বলে সে বেশ কিছুটা স্বস্তি বোধ করল। এদিক ওদিক না তাকিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনে বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। কয়েক পা যাবার পরেই অভিরূপ বুঝতে পারল কেউ তাকে অনুসরন করছে, কিন্তু কিছু করে ওঠবার আগেই একটা হোঁৎকা মত লোক তার বুকের সামনে একটা লম্বা ছুরি ঠেকিয়ে তাকে চুপচাপ থাকতে নির্দেশ দিল, আর একটা লোক ততক্ষণে অভিরূপের কাঁধের ব্যাগটা অন্য একটা ছোরার ঘায়ে কেটে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। জনশূন্য নির্জন মেঠো রাস্তায় অভিরূপ দুটো গুণ্ডার হাতে দুখানা ছোরা দেখে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে চিৎকার করতেও ভুলে গেল। ইতিমধ্যে কিন্তু অভিরূপের মাথার খুব কাছাকাছি বেঁটে আর বীর এসে চক্কর কাটতে শুরু করেছিল। হঠাৎ অভিরূপ দেখল একটা শকুন তার বুকে ছুরি ঠেকিয়ে রাখা লোকটার ডান হাতটায় সজোরে ছোঁ মারতেই ছুরি ছিটকে ধানক্ষেতে গিয়ে পড়ল আর লোকটার হাতের খানিকটা মাংস খাবলে উঠে গেল। পিছনের যে লোকটা ব্যাগটা কেটে নেবার চেষ্টা করছিল সেও অন্য শকুনটার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ততক্ষণে ধানক্ষেত ধরে দৌড়তে শুরু করেছে। অভিরূপ গুণ্ডা দুটোর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে এক দৌড়ে গ্রামের খুব কাছাকাছি গিয়ে পিছন ফিরে লোক দুটোকে দেখতে না পেয়ে একটু অবাক হল, কিন্তু পরক্ষণেই ধানের উপর শকুনদের ছোঁ মারা দেখে বুঝতে পারল যে লোক দুটো শকুনের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ধানক্ষেতের দু' জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে, সে তাড়াতাড়ি গ্রামে গিয়ে খবর দেওয়াতে তার বন্ধু-বান্ধবরা লাঠিসোঁটা নিয়ে হৈ হৈ করে তাড়া করে যেতেই শকুনের ছোঁ অবহেলা করে লোক দুটো ভয়ে ধানক্ষেত থেকে উঠে মাঠে-মাঠে দৌড়ে পালাতে লাগল কিন্তু বেশীদূর যেতে পারল

না, গ্রামের ছেলেদের হাতে ধরা পড়ে বেদম পিটুনী খেয়ে পায়ে হাতে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তবে ছাড়ান পেল।

ওদিকে গ্রাম প্রান্তে কি একটা গণ্ডগোল হচ্ছে শুনে এবং সেই গণ্ডগোলের সঙ্গে সম্পর্কিত অভিরূপ নামটা কানে আসতেই মুরারিবাবু সব কাজ ফেলে প্রায় দৌড়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই গ্রামের সেই পশ্চিম প্রান্তে এসে হাজির হলেন এবং গ্রামের অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে অভিরূপকে ফিরতে দেখে কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করলেন। অভিরূপ কাছে আসতে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি বিস্মিত দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন, তখনও বেঁটে ও বীর নামের শকুন দুটো প্রায় তাঁদের মাথার ঠিক উপরেই ঘোরাঘুরি করছে। অবচেতনে মুরারিবাবুর হাত দুটো আপনা থেকেই জোড়া হয়ে কপালে গিয়ে ঠেকল এবং মুহূর্তে সমস্ত শকুন-জাতির প্রতি তাঁর এতদিনকার বিতৃষ্ণা ঘৃণা উবে গিয়ে একটা শ্রদ্ধাবোধ জেগে উঠল। পর দিন দুপুরে শকুন দুটো খেতে এলে মুরারিবাবু নিজের বরাদ্দ থেকে একটা মাছের খান নিয়ে দু' টুকরো করে বেঁটে আর বীরকে হাতে করে খাইয়ে দিলেন এবং অভিরূপের জীবন বাঁচানোর জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাদের পিঠে গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন ; শকুন দুটোও কুটকুটে চোখগুলো বন্ধ করে মুরারিবাবুর উষ্ণ হাতের আদর চুপচাপ উপভোগ করে আনন্দের অভিব্যক্তি স্বরূপ চিঁ-চিঁ করে আওয়াজ তুলল। তাদের পিঠে হাত বুলতে বুলতে অভিরূপকে ডেকে মুরারিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কিভাবে এ দুটোকে চিনতে পারিস কোন্‌টা বেঁটে আর কোন্‌টা বীর?' বাবার প্রশ্নে হাসতে হাসতে অভিরূপ একটা একটা করে শকুন দুটোকে ধরে তাদের চেনবার চিহ্নগুলো দেখিয়ে দিল। মুরারিবাবু দেখলেন যে বেঁটের গলাটা আর লেজের কিছুটা অংশ সাদা আর বীরের পেটের নীচের দিকটা সবটা সাদা ও বাকী অংশ সমস্তটা কাল রঙের। আসলে মুরারিবাবু এতদিন শকুন দুটোকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে বিরক্তিই বোধ করেছেন। কিন্তু বারবার তাঁর একমাত্র সন্তান অভিরূপের জীবন রক্ষার কথা

শুনে এবং সেদিনের কাকে চামচ নিয়ে যাওয়ার ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করে এতদিনে শকুন দুটো সম্বন্ধে তাঁর মনের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, তাই আজ ছেলের মাধ্যমে ওদের চিনে রাখছেন।

ইতিমধ্যে অভিরূপের বন্ধুবান্ধবের মুখ থেকে শকুন দুটোর সম্বন্ধে বিভিন্ন গল্প ক্রমে ক্রমে গ্রামের লোকের কর্ণগোচর হতে লাগল। প্রবীণদের মধ্যে কেউ শুনে বলল, 'যত সব বাজে ভাঁওতা' কেউ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে মন্তব্য করল, 'তা হবে', আবার কেউ কোন মন্তব্যই করল না। দিন এভাবেই চলছিল। এদেশে আর পাঁচটা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের যেমন করে দিন কাটে ঠিক সেই ভাবেই মুরারিবাবুর পরিবারেরও দিন কেটে যাচ্ছিল।

কয়েক দিন পরে এসে গেল দুর্গাপূজার আগমনী বার্তা। সেদিন ভোরবেলায় বেতারে মহালয়ার অনুষ্ঠান শুনে বাড়ীর দাওয়ায় বসে মুরারিবাবু ও শ্রীলেখা দেবী চা পান করছিলেন এবং অভিরূপ একটা নিমকাঠি নিয়ে উঠোনে পায়চারী করতে করতে দাঁত মাজছিল, এমন সময় সাত-সকালে মুরারিবাবুর নাগাড়ে-কিষেণ ভোলা এবং রাখাল মধু বাড়ির উঠোনে এসে বস্তা নিয়ে দাঁড়াল। মুরারিবাবু তাদের দেখে বললেন, 'কি রে ধান চাই না কি?' ভোলা বলল, 'হ্যাঁ বাবু, পূজো তো ধরেন আর এসে গেল, এখন ধান না দিলে আর কবে দেবেন?' 'আজ ঘোর অমাবস্যা, তার উপর হিসাব যা দেখেছি তাতে এর মধ্যেই তো সারা বছরের ধান তোদের দুজনেরই এক মণ হিসাবে বেশী নেওয়া হয়ে গেছে। পাওনা তো আর নেই তবু তোরা যখন চাইছিস তখন আরও একমণ করে তোদের দুজনকে আমি দেব, তবে আজ নয়, আজ অমাবস্যার দিনটা বাদ দিয়ে আসছে কাল স্নান করার সময় মরাই খুলে ধান দেব, যা আজকে এখন কাজ করগে যা', বলে মুরারিবাবু জামার পকেটে হাত দিয়ে একটা টিনের কৌটো বের করে তার থেকে দুটো বিড়ি নিয়ে একটা ভোলার হাতে

দিয়ে আর একটা নিজে মুখে গুঁজলেন। নিজে বিড়িটা ধরিয়ে দেশলাইয়ের বাক্সটা ভোলার হাতে দিয়ে বললেন, 'নে বিড়ি ধরা।' দেশলাই জ্বেলে বিড়ি ধরিয়ে বাবুর মুখের দিকে চেয়ে ভোলা বলল, 'তা হ'লে দেবেন না বলছেন?' ভোলার কণ্ঠস্বরের রুক্ষতায় মুরারি বাবু সামান্য বিরক্তি বোধ করলেন, কিন্তু নিজের কণ্ঠকে যথেষ্ট সংযত রেখে তিনি পুনরায় বললেন, 'দেব না কখন বললাম। তোদের তো বললাম আজ অমাবস্যা, আগামীকাল দুপুরে স্নানের সময় মরাই খুলে তোদের ধান দেব। দেব বলেছি যখন তখন নিশ্চয়ই দেব, যা এখন কাজ করগে যা।' মনিবের কথায় সন্তুষ্ট না হতে পেরে ভোলা মধুকে ডেকে নিয়ে বাড়ী থেকে বের হয়ে গেল। ভোলা বের হয়ে যাওয়ার পরে মুরারিবাবু বসে-বসে ভাবতে লাগলেন গোটা বাংলাদেশের লোক জানে আজ মহালয়া, ঘোর অমাবস্যা, অমাবস্যায় মরাই খুলতে নেই, অথচ ভোলা ও মধু যেখানে অন্যদিন বেলা সাতটার আগে গাছপালায় রোদ চকচক না করলে কাজে আসে না সেখানে ধানের জন্য এই সাত-সকালেই চলে এসেছে! ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে একটা আজ সন্দেহের দোলা ঝিলিক দিয়ে উঠল। একবার মনে হল এর পিছনে অন্য কোন অভিসন্ধি নেই তো, কেউ প্ররোচিত করে ভোলাকে তাঁর কাছে পাঠায় নি তো? মুরারিবাবু যখন এসব চিন্তা করেছিলেন দাঁত মাজতে মাজতে অভিরূপ তখন হঠাৎ বলে উঠল, 'ভোলার কথাবার্তা যেন আজ একটু গরম-গরম মনে হল, কি ব্যাপার বলতো বাবা? ভোলাকে কি কেউ আগে থেকেই গরম করে পাঠিয়েছে ধান চাইতে?' ছেলের কথায় একবার তার মুখের দিকে চেয়ে মুরারিবাবু বললেন, 'আমারও কি রকম যেন সন্দেহ হচ্ছে, যাই হোক, এ নিয়ে তুই যেন গোয়াল-বাড়ীতে বা জমির ধারে গিয়ে আবার ভোলাকে কিছু বলিস না, যা বলবার আমিই বলব,' মুরারিবাবু যখন ছেলেকে কথাগুলো বলছিলেন ঠিক তখনই দেখা গেল মাঝের পাড়ার মণ্ডলদের দুলাল ও নন্দীদের দীনবন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ভোলা ও মধু আবার বাড়ীতে ঢুকল। মুহূর্তে মুরারিবাবু ও অভিরূপ ব্যাপারটা বুঝে নিলেন যে, তাঁদের

আশঙ্কাই তাহ'লে ঠিক, ভোলা ও মধুর পিছনে ইন্ধনদাতা রয়েছে।

বাড়ীতে ঢুকে দাওয়ার কাছ পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই দুলাল কর্কশকণ্ঠে বলে উঠল, 'কি জ্যেটামশাই, ভদ্রতাও শেখেন নি নাকি? বাড়ীতে একটা ভদ্রলোক এলে তাকে বসতে বলতে হয় জানেন না?" দুলালের কথার উত্তরে মুরারিবাবু বললেন, 'উঠোন পার হয়ে দাওয়ার কাছ পর্যন্ত পৌঁছলে তবেই তো বসার কথা, কিন্তু তার আগেই তো মন্তব্য করে ফেললে, বসতে দিই কি না দিই দেখ আগে।' এর পর তিনি নিজে উঠে গিয়ে দাওয়ার একপাশে দড়িতে সাজিয়ে রাখা চটের উপর সুতো দিয়ে কাজ-করা দু-খানা আসন এনে দাওয়ার একপাশে পেতে দিয়ে বললেন, "বস"। 'থাক থাক আর আসন দিতে হবে না, আমরা জোতদারের দাওয়ায় বসি না; হ্যাঁ, যেজন্য এসেছিলাম সেটা হল গিয়ে আপনাকে কৈফেৎ করতে, আপনি ভোলা ও মধুকে ধান দিচ্ছেন না কেনে তার কৈফেৎ চাই,' বলে সরোষে দীনবন্ধু মুরারিবাবুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। কৈফেৎ অর্থাৎ কৈফিয়ৎ চাইছে শুনে রাগে মুরারিবাবুর অন্তর অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল, কিন্তু তিনি সংযত কণ্ঠে বললেন, 'এই তো এলে বাবা, আগে বস, চা-টা খাও তারপর বলছি।' 'না, না, আমাদের অত সময় নাই, আপনার সঙ্গে বেপারটার ফয়সালা করে এক্ষুণি আমাদি'কে আবার কামাল ছুটতে হবে। সেখানে হরে রায়ের ধান খেয়েছিল বলে শালা ছুঁচোটা ঐ গাঁয়ের পেমথ বাগ্দীর দুটো গরু খোঁয়াড়ে দিয়েছে। আজ শালাকে ঘেরাও করা হবে। নিজের পয়সায় খোঁয়াড় থেকে গরু ছাড়িয়ে এনে বারোয়ারী তলায় শালাকে নাক ছেঁচড়া দিতে হবে। শালা কত বড়লোক হয়েছে দেখব, এত বড় আস্পর্ধা! গরীব লোকের গরু খোঁয়াড়ে দেওয়া! আজ শালারই একদিন কি আমাদেরই একদিন।' বলে দুলাল থামল।

দুলাল এতক্ষণ যার কথা বলছিল কামালের সেই হরে রায় অর্থাৎ হরিপ্রসাদ রায়কে মুরারিবাবু চিনতেন। বিঘে আষ্টেক জমির মালিক, পরিবারে আট-দশ জন খাওয়ার লোক, সামান্য ধানজমি ছাড়া গোটা

কয়েক ভাল জাতের গাই পুষে দুধ, ছানা বিক্রয় করে কোন রকমে সংসার প্রতিপালন করে। মুরারিবাবু ভালই জানেন হরি রায়ের বড্ড টানাটানির সংসার। সেই হরি রায় সম্পর্কে দুলালের মন্তব্য বা ধ্যান-ধারনার বা শাস্তি দেবার আভাসের কথা শুনে তিনি বুঝতে পারলেন দুলাল-দীনবন্ধুর মত ছেলেরা ঈর্ষা-প্রণোদিত হয়ে কি ভাবে ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে। যাই হোক, এদের সঙ্গে কথা বাড়ানোর অর্থ নিজের অসম্মান ডেকে আনা, তাই হরি রায়ের প্রসঙ্গে না গিয়ে তিনি সরাসরি ভোলা—মধুর ধানের ব্যাপারটায় চলে এলেন। ঘর থেকে একটা খাতা এনে হিসাব করে দুলালকে বোঝাতে চাইলেন এবং বললেন, 'ভোলার এবং মধুর ইতিমধ্যেই একমণ করে ধান বেশী নেওয়া হয়ে গেছে, তবু আমি ওদের আগামী কাল আরও একমণ করে ধান দেব বলেছি।' একথা ভোলা ও মধুর কাছ থেকে দুলাল ও দীনবন্ধু আগেই শুনেছিল তবু জবরদস্তির সঙ্গে তারা বলল, জোতদারদের খাতায় ও সব অনেক নেকা থাকে, যা নেকা থাকে সব সত্যি নাকি? ও-সব ফালতু কথা ছাড়ুন, ধান আজই এখুনি আমাদের সামনেই দিতে হবে, নিন্ উঠুন, মরাই খুলুন।' আদেশের সুরে কথাগুলো বলে দুলাল দাওয়ার পাশ থেকে হেঁটে উঠোনের দক্ষিণ দিকের পাশে বাঁধা মরাইতলায় গিয়ে যুদ্ধং—দেহী মূর্তিতে কোমরের দু-পাশে হাত রেখে বিশেষ ভঙ্গীকরে দাঁড়াল।

তার দাঁড়ানোর ভঙ্গীটা দেখে মুরারিবাবু এবং অভিরূপের মনে হ'ল এখুনি মরাই খুলে ধান না দিলে দুলাল নিজেই জোর করে মরাই খুলে ধান বের করে ভোলা—মধুকে দেবে। অভিরূপ দাঁতন-কাঠিটা ফেলে পাতকুয়োতলায় গিয়ে মুখ ধুয়ে দাওয়ার একপাশে বসে-বসে এতক্ষণ সবই শুনছিল। এবার সে মুখ খুলল, বলল 'আজ মহালয়া, ঘোর অমাবস্যা, হিন্দু মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে হয়ে এখুনি মরাই খুলতে কি করে বলছ গো দুলালদা? তুমি কি আজকাল ঠাকুর-দেবতা, অমাবস্যা-পূর্ণিমা মানছ না নাকি? সত্যি-মিথ্যা, পাপপুণ্য, ন্যায়-অন্যায় বলে তো কতকগুলো কথা আছে। আজকে এই ঘোর

অমাবস্যার দিনে অন্যায়ভাবে জোর করে মরাই খুলিয়ে ধান নিয়ে ওদের পাওনা না থাকা সত্ত্বেও তুমি যদি ভোলা-মধুকে দাও তাহলে তোমার পাপ হবে না ? না দুলালদা, এ পাপ তুমি করো না, বরং বাবা যা বলছেন সেটা শোন, আগামী কাল তোমাদের ডেকে' এনে তোমাদের সামনেই আমি নিজে মরাই খুলে ভোলা-মধুকে ধান দেব।' অভিরূপের কথা শেষ হতে-না-হতেই মরাইতলা থেকে সরে অভিরূপের সামনে এসে তার চিবুকে হাত দিয়ে মুখটা ঝাঁকিয়ে দুলাল প্রায় চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে কর্কশস্বরে, 'ওঃ রে আমার চাঁদুরে, বদ্দমানে কলেজে পড়ে তোর খুব বাড় হয়েছে দেখছি, শুনেচি তুই নাকি সাইন্স নিয়ে পড়িস ! তুই ঠাকুরদেবতা অমাবস্যে-পূর্ণিমে মানিস নাকি ? বড্ড জ্ঞান দিচ্ছিস যে আমাকে ! আহা বড়নোকের নন্দদুলাল রে আমার।' বলে অভিরূপের চিবুক ধরে দুলাল আর একবার ঝাঁকিয়ে দিল। চিবুক ধরে উপর্য্যুপরি দু-বার ঝাঁকিয়ে দেওয়াটাকে অত্যন্ত অসম্মানজনক ও অবমাননাকর বোধ হওয়ায় অভিরূপ এবার গম্ভীর কণ্ঠে সামান্য মেজাজের সঙ্গে বলল, 'দেখ দুলালদা, তোমরা গ্রামেরই ছেলে, গ্রামেরই এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসেছ, ব্যবহারগুলো, কথাবার্তাগুলো একটু ভদ্রভাবে করতে পার না ?' অভিরূপের এই কথায় দুলাল অত্যন্ত কর্কশস্বরে চিৎকার করে 'য়্যাই সাইন্সিস্টের বাচ্চা, খবদ্দার অভদ্দর অভদ্দর করবি না, মেরে একেবারে মুখ ভেঙ্গে দেব', বলতে বলতে লুঙ্গীতে মালকোঁচা মেরে দুলাল এক লাফে মরাইয়ের উপর উঠে মরাইয়ের চাল খুলে খড়গুলো উঠোনে ছড়িয়ে ফেলতে-ফেলতে চিৎকার করে বলতে থাকল, 'এই দ্যাখ, আজই এখনই তোর বাপের মরাই খুলে ওদের ধান দেব, দেখি তোর কোন বাপ আটকায়।'

শ্রীলেখাদেবী এতক্ষণ দাওয়ার এক পাশে বসে সমস্ত ঘটনা দেখছিলেন, কিছু বলেন নি, এবার তিনি মরাইতলায় গিয়ে হাতজোড় করে দুলালকে বললেন, 'বাবা, দুলাল, আমি তোমার মায়ের মত, আমি তোমায় নিষেধ করছি, আজ ভর্ত্তি অমাবস্যায় মরাই খুলো না

বাবা, জানতো তোমার জ্যাঠামশায় এক কথার লোক। উনি যখন বলেছেন আগামীকাল ধান দেবেন তখন ধান ভোলা-মধু নিশ্চয়ই পাবে, তুমি মরাই থেকে নেমে এস, আমার কথা শোন বাবা··· ··।' শ্রীলেখার কথা শেষ হতে না হতেই দুলাল চিৎকার করে তার সঙ্গী দীনবন্ধুর উদ্দেশে বলে উঠল, 'এ্যাই দীনে, ঐ মাগীটাকে মরাইতলা থেকে সরিয়ে দে তো, মরাই ভেঙ্গে ধান আজ আমি বের করবই।' দেখি কে আটকায়।' অভিরূপের বিশ বছরের টগবগে তরুণ তরতাজা শরীর, তার সামনে তার মা শ্রীলেখা দেবীকে মাগী বলে সম্বোধন করায় অভিরূপের শরীরে, আগুন লেগে গেল, সেও চিৎকার করে, 'কি এত স্পর্ধা! আমারই বাড়ীতে আমারই মরাই ভাঙ্গতে-ভাঙ্গতে আমার মাকে এত বড় অপমান? এই ক্লীব ইতর অমানুষে ভর্তি গ্রামে কোন অন্যায় কাজে বাধা পাও না বলে তোমাদের সাহস দিনে-দিনে বড্ড বেড়েছে, না? আমার মা মাগী? আর তোমার মা সতী সাবিত্রী? আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন', বলে অভিরূপ ধুতিটা মালকোঁচা মেরে এক লাফে মরাইয়ে উঠল। মরাইয়ে উঠতেই দুলাল দু-হাতে সজোরে তার গলাটা চেপে ধরল। মুহূর্তে অভিরূপের মনে হল তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এখুনি সে মারা যাবে। প্রাণপণ চেষ্টায় যখন সে গলা থেকে দুলালের হাত ছাড়াতে চেষ্টা করছে এমন সময় অভিরূপ দেখল বেঁটে আর বীর এসে ঝপাং ঝপাং করে দুলালকে ছোঁ মারতে লাগল. হঠাৎ দুলাল অভিরূপের গলা ছেড়ে, 'ওরে বাবারে, ওরে বাবারে,' বলে ডান কানটা ধরে আর্ত চিৎকার করতে-করতে মরাই থেকে লাফ দিয়ে উঠোনে নেমে দৌড়তে দৌড়তে বাড়ীর বের হয়ে গেল। চকিতে উপরে চেয়ে অভিরূপ দেখল বেঁটের পায়ে দুলালের ডান কানের প্রায় অর্দ্ধেকটা ধরা।

মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝে সে মরাই থেকে লাফ মেরে দুলালের পিছনে ছুটতে গিয়ে দেখল দরজার বাইরে গ্রামের বহু ছোট-বড় চাষী পরিবারের বয়স্ক প্রবীণ ও তরুণরা জুটে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে;

কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে অভিরূপ তাদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে আবার ছুটতে যাবে এমন সময় সরকার বাড়ীর ভৈরব সরকারের মেয়ে সুমিতা কোথা থেকে ছুটতে-ছুটতে এসে অভিরূপের পথ আটকে দাঁড়িয়ে চরম উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলল, 'কোথায় যাচ্ছ অভিরূপদা? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? তুমি একা ঐ শয়তানগুলোর পিছনে দৌড়চ্ছ? চল, বাড়ী চল।' সুমিতার এই কথায় অভিরূপ চিৎকার করে উঠল, 'পথ ছাড়, সুমি, সত্যিই আমার আজ মাথা খারাপ হয়ে গেছে, যা হয় হবে আমার, আজ শয়তান দুটোকে শিক্ষা দেবই শীঘ্র পথ ছাড়, না হলে শয়তান দুটো গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাবে। গ্রামের কেউ কিছু বলে না বলেই ওরা যা খুশী তাই করে যাচ্ছে, ওদের অন্যায়ের হাত থেকে মা-বোনেদেরও নিস্তার নেই! ওরা ভেবেছে কি? গত কয়েক বছরের মধ্যে গ্রামটাকে ওরা শ্মশান করে তুলেছে। আজ ওদেরই একদিন কি আমারই একদিন', বলে অভিরূপ আবার ছুটতে যায় দেখে সুমিতা অভিরূপের পায়ের কাছে বসে পড়ে তার পা-দুটোকে দু-হাতে জাপটে ধরে তীব্র শ্লেষসিক্ত কণ্ঠে বলতে লাগল, 'গ্রামটা কি একা তোমার! এই যে ক্লীব-পঙ্গু ইতর মজা-লুটনেওয়ালারা শয়ে-শয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তোমাদের বাড়ীর দোরগোড়ায় এরা কি গ্রামের কেউ নয়? এদের বাড়ীতে কি মা-বোন নেই? আজ জেঠিমাকে অপমান করেছে বলে এরা দাঁড়িয়ে মজা দেখছে আর আগামীকাল কি পরশু যখন এদের মা-বোনেদের অসম্মান করবে? কি করবে ঐ শয়তানগুলো তখন?' সুমিতার কথা শেষ হতে না হতে, অভিরূপ বলল—'তখনও এরা চুপ করেই থাকবে, ওদের গালাগালি অপমান সব রকমের অন্যায়কে এতদিন ধরে প্রশ্রয় দিয়েছে? ওরা যখন যা দাবী করেছে সব বিনা প্রতিবাদে নতমস্তকে মিটিয়ে দিয়েছে বলেই আজ এই অবস্থা।অত্যন্ত সাধারণ একটা ঘটনা নিয়ে গালাগালি অপমান, এমন কি, ঘরে ঘরে দাঙ্গা বাধিয়ে দিতে পর্যন্ত ওরা দ্বিধা করছে না; আর এইসব মাটির পুতুলের মত চেতনা-বোধহীন গাঁয়ের লোকগুলো

নিজের-নিজের মাথা বাঁচাবার জন্য ওদের অত্যাচারের হাড়কাঠে মাথা গুঁজে দিয়ে দিন-দিন গ্রামগুলোকে শ্মশান করে তুলছে। গ্রাম থেকে একটার পর একটা বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার শহরের দিকে পালাচ্ছে কোন • দিক দিয়ে কিছু করতে না পারলে ওরা বয়কটের নীতি চালিয়ে গ্রামগুলোকে ছারখার করে তুলছে, ওরা নিজেরা বুঝছে না যে পাড়ায় আগুন লাগালে নিজের ঘরটাও যে কোন মুহূর্তে জ্বলে যেতে পারে……। '

অভিরূপ অত্যন্ত উত্তেজনার সঙ্গে হাঁফাতে-হাঁফাতে কথাগুলো শেষ করতেই ভীড়ের মধ্যে থেকে কে একজন মন্তব্য করল, 'হ্যাঁ ঠিকই তো, আমরা তো কলেজে পড়ি নাই, আর বাপের একমাত্র আদুরে দুলালও নই যে, যার-তার সঙ্গে যখন-তখন লড়াই করব, তাই এখন সবাই চাচা আপন প্রাণ বাঁচা নীতি নিয়েছি, তোমার মত দীনে-দুলালদের সঙ্গে বীরত্ব ফলাতে যাইনি ; তা তোমার মত বীরপুত্র যখন এ গ্রামে রয়েছে তখন আর ভাবনা কি ? এবার থেকে তুমিই সব ব্যাপারে লড়াই কর, আর আমরা না হয় তোমার বীর্যবত্তা দেখে দু-চক্ষু সার্থক করি।'

ভীড়ের মধ্যে থেকে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে বলা কথাগুলো শুনে সমবেত সকলে একবার উচ্চরোলে হেসে উঠল এবং একে-একে স্থান ত্যাগ করতে লাগল। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই অভিরূপের বাড়ীর দরজার সামনেটা ফাঁকা হয়ে গেলে হতবাক অভিরূপ ও সুমিতা দেখল স্থানত্যাগকারী গ্রামবাসীদের দল থেকে একজন কিছুদূর যাওয়ার পর পুনরায় অভিরূপের নিকট ফিরে এসে তার হাত দুটো ধরে বললেন, 'কাজটা ভাল হল না বাবা, জানিস তো ওরা কত দলবদ্ধ, সংঘবদ্ধ, এর পর হয়ত দলবল নিয়ে বাড়ী চড়াও হবে, লুঠতরাজ করবে, আগুন লাগাবে, খুন জখম করবে। আমি বলি কি বাবা অভিরূপ, তুই বরং দিন কতক গ্রাম থেকে অন্য কোথাও সরে থাক, ওরা একটু ঠাণ্ডা হলে আবার গ্রামে ফিরবি।' ভিড়ের মধ্যে থেকে ফিরে এসে অভিরূপের হাত ধরে যে মানুষটি এতক্ষণ এই কথাগুলি

বলছিলেন তিনি অভিরূপের শৈশবের গৃহশিক্ষক ফণীভূষণ চক্রবর্তী। অভিরূপ শিশুকাল থেকে ছাত্র হিসাবে খুবই ভাল, তাই আশেপাশের দু-দশখানা গ্রামে পড়াশুনার চর্চা যাঁরা করেন সকলেই অভিরূপকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। ফণীবাবুও অভিরূপকে শিশুকাল থেকে বিশেষ স্নেহপ্রীতির দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, তাই তিনি ভিড়ের মধ্য থেকে ফিরে এসে তাকে সাবধান করে দিতে চাইলেন।

মাস্টারমশায়ের কথায় অভিরূপ কিছু বলার আগেই সুমিতা কণ্ঠ যথেষ্ট সংযত রেখে বিনম্র ভঙ্গীতে তাঁকে বলে উঠল, 'কি বলছেন স্যার, আজ যদি এ-গ্রামের একটা ভাল ছেলেকে এই গ্রামেরই অন্য দুটো বাজে ছেলের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হয় তাহলে গ্রামটায় থাকবে কে? থাকবে কারা?' সুমিতার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অভিরূপ বলে উঠল, 'হ্যাঁ মাস্টারমশায়, সুমি ঠিকই বলেছে, গত তিন-চার বছরে নানা অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে দত্ত-কাকারা গ্রাম ছাড়লেন, ভুবনদা মার্ডার হলেন, হেড-স্যার সতীশবাবুর মেয়ের উপর বলাৎকার হ'ল, মেয়েটা পাগল হয়ে গেল, সতীশ স্যার সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে শ্বশুরবাড়ীর দেশে গিয়ে বাসা বাঁধলেন, প্রামাণিক পরিবারকে ধোপা-নাপিত, মুনিষ-রাখাল বন্ধ করে বয়কটে কোণঠাসা করে মুচলেকা লিখিয়ে ভীষণ অসম্মানের সঙ্গে গ্রামে বাস করতে দেওয়া হচ্ছে। কথায়-কথায় ধান দাও, চাল দাও, মজুরী বাড়াও বলে দাবী তুলে যাকে-তাতে যখন-তখন অপমান করা হচ্ছে, হেনস্তা করা হচ্ছে আর এসবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরোধ করা তো দূরে থাকুক, কেউ মুখ ফুটে ঐ দুলাল মোড়ল আর দীনে নন্দীদের সামনে প্রতিবাদের একটি শব্দও উচ্চারণ করছে না, বরং ওদেরই সঙ্গে আঁতাত করে অন্যের ক্ষতি করে সুযোগসন্ধানী ক্লীব কতকগুলো মানুষ নিজেদের জায়গা-জমি সম্পত্তি বজায় রাখতে সচেষ্ট। সামান্য মানসম্মান জ্ঞান ও আর্থিক সচ্ছলতা যাদের আছে তারা গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে পালাচ্ছে। এভাবে যে গ্রামগুলোতে শ্মশানের স্তব্ধতা নেমে আসছে দিনের পর দিন, এর কোন প্রতিবিধান হবে না? জন্মে থেকে

দেখছি আমাদের এই বাঙালী জাতটার মধ্যে শয়ে-শয়ে ধর্মীয় দল, রাজনৈতিক দল, আর চিরকালই হয় ধর্মের জন্য, নয় তো রাজনীতির তখ্‌ত-তাউশে বসার জন্য একদল বাঙালী আর একদল বাঙালীকে মারতে সদা ব্যস্ত, তারা একবারও ভাবছে না যে, গোটা ভারতবর্ষের লোক, এমন কি, বিদেশের মানুষরাও রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, রবিঠাকুরের এই জাতটার কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে গেছে। এদেশের বাঙালী জাতটা যে এত দ্রুত ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে এ-কথা আপনি কি ভেবেছিলেন মাস্টারমশায় ?'

উত্তেজনার সঙ্গে কথাগুলো বলে অভিরূপ হাঁফাতে থাকে, তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সুমিতা বলে উঠল, স্যার, বাঙালীদের এই মারামারির ফাঁক দিয়ে বছরের পর বছর ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান থেকে মানুষ এসে গ্রাম-শহর সব ভরিয়ে তুলছে, ব্যবসা-বাণিজ্য দখল করে বসছে, বাংলার অর্থনীতি আজ অন্যদের হাতে আর আমরা বাঙালীরা ক্রমে-ক্রমে তাদের ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীতে পরিণত হচ্ছি, এ সমস্ত কথা কি ঐ দুলাল মোড়ল দীনে নন্দীর মত মাতব্বরদের মাথায় ঢোকে ? স্বার্থনীতির মৌতাতে যারা বুঁদ হয়ে থাকে তারা কি এসব নিয়ে ভাবতে পারে ? স্যার, অভিরূপদা যা বলেছে ঠিকই বলেছে।'

সুমিতা থামলে ফণীবাবু তার মাথায় হাত দিয়ে মাথাটা সামান্য ঝাঁকিয়ে বললেন, 'ওরে পাগলী, আমি সব বুঝি, আমি তোদের মাস্টারমশায় এটা ভুলে যাচ্ছিস কেন ? তোরা যেটা বুঝিস, আমি সেটা বুঝি না এটা ভাবলি কি করে ? শোন্, আমার আটষট্টি বছর বয়স হ'ল, এই বয়স পর্যন্ত বহু রকমের আন্দোলন দেখলাম, কিন্তু একটা সংঘবদ্ধ অন্যায়ের বিরুদ্ধে দু-একটা ছেলেমেয়ের প্রতিরোধে বা প্রতিবাদে কি লাভ হবে বলতে পারিস ? শুধু-শুধু মাথা খারাপ করিস না, তোদের দুজনেরই সামনে পরীক্ষা, এ সময় অনর্থ একটা কিছু ঘটে গেলে তোদের পরীক্ষা বরবাদ হবে,' বলতে বলতে দুজনের মাথায় হাত দিয়ে নিজের শরীরের দু'পাশে টেনে নিয়ে

অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে ফণীবাবু আবার শুরু করলেন, 'ছাখ, অভিরূপ, সুমিতা, তোদের উপর আমার অনেক আস্থা, তোদের নিয়ে আমার অনেক আশা, আগে তোরা লেখাপড়া শিখে নিজেদের যোগ্য করে তোল, একটা আই. এ. এস. কিংবা আই. পি. এস. হবার চেষ্টা' কর, নিজের-নিজের পদের জোরেই তখন অনেক কিছু সংশোধন করে নিতে পারবি। যা, সকাল থেকে সম্ভবতঃ কেউ কিছু খাস নি, মুখগুলো শুকিয়ে গেছে, বাড়ী গিয়ে মুখে কিছু দে আগে ; মনে রাখিস আই. এ. এস. কিংবা আই, পি. এস', বলতে বলতে ফণীবাবু আর না দাঁড়িয়ে বাড়ীর দিকে পা চালালেন। অভিরূপ এবং সুমিতাও যে যার নিজের বাড়ী ফিরে গেল।

বাড়ীতে পৌঁছে অভিরূপ মুখে-হাতে জল দিয়ে সামান্য জলখাবার খেয়ে পড়তে বসল। সকাল থেকে নানারকম উত্তেজনায় আজ তার পড়তে বসাই হয় নি। এখন পড়তে বসেই মাস্টারমশায়ের 'লেখাপড়া শিখে আগে নিজেদের যোগ্য করে তোল, একটা আই এ. এস. কিংবা আই. পি. এস. হবার চেষ্টা কর, নিজের নিজের পদের জোরেই তখন ····· কথাগুলো মনে পড়ে গেল এবং তার মাথায় চিন্তা ঢুকল আই. এ. এস., আই. পি.এস. অফিসার হতে পারলেই যদি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত তাহ'লে তো এখন যারা আই.এ.এস., আই. পি. এস. পদে বহাল রয়েছে, জনসাধারণের করের অর্থে যাদের মাসে মাসে বেতন হচ্ছে তারা যদি জনসাধারণের কথা অন্ততঃ সামান্যও ভাবত এবং কড়া-হাতে শাসন করত, তাহলে গ্রামে-গ্রামে, শহরে-বন্দরে, হাটে-মাঠে যার যা খুশী করা চলত না। আসলে আই.এ. এস., আই. পি. এস. বা অন্য কোন ধরনের কোন উপরওয়ালারা কেউই কিছু নয়, কোন্‌টায় নিজেদের ভালো, কোন্‌টায় নিজেদের মন্দ, কোন্ পথে চললে সমষ্টির উপকার হবে, সমাজে-সংসারে শান্তি বজায় থাকবে এই বোধটাই আজকের দিনের মানুষ হারিয়ে ফেলেছে। পৃথিবীর সমস্ত দেশ যখন কৃষি, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, খাদ্য ইত্যাদি মূল বিষয়গুলিতে দ্রুত অগ্রগতি সাধন করছে আমরা তখন এদেশে

সামান্য কয়েকজন মানুষের দ্বারা ভুল পথে পরিচালিত হয়ে নিজেদের মধ্যে লাঠালাঠি খুনোখুনি করে মরছি।'

সে আরও ভাবতে লাগল, এদেশের অসৎ সমাজ-নায়কগণ মানুষের বিদ্বেষ, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, লোভ ইত্যাদি সহজাত রক্তজ ব্যাধি-গুলিকেই চিরকাল ইন্ধন দিয়ে আসছে। যে দেশের মানুষ নিজেদের খাবারে নিজেরাই ভেজাল দেয় সে দেশে ভাল মানুষ, ভাল কাজ, আশা করাটা বোধ হয় অত্যন্ত অন্যায়, বিশেষ অধুনা পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটি মানুষ নিজেকে অত্যন্ত বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, সবজান্তা বলে ভাবে; কেউ কারও সদ্‌যুক্তি নেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। নম্রতা, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধাভক্তি, ভালবাসা প্রভৃতি শব্দগুলো যেন বইয়ের পাতায় লিখে সাজাবার জন্যই অভিধানে সঙ্কলিত হয়েছিল অন্য কোন প্রয়োজনে নয়। নিজে হাজার অসৎ কর্মে লিপ্ত থাকব, বড়-বড় বচন দান করব, পথে-ঘাটে অভব্য আচরণ করব অথচ অপরকে সব সময় সৎ হতে পরামর্শ দেব, বাকসংযম শিক্ষাদানে তৎপর হব, সভ্যতার স্কুলে পাঠ নিতে নির্দেশ দেব অর্থাৎ সংক্ষেপে লঘু-গুরু নির্বিশেষে সকলকে জ্ঞান দান করাটাই এখনকার বাঙালীর প্রধান কর্তব্য হয়ে উঠেছে। কিভাবে যে এদেশের মানুষ নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দেবার যোগ্যতা অর্জন করবে তা কে জানে·······খুব সম্ভবতঃ এদেশের এখন অন্ততঃ একজন সুভাষ বোসের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

পড়তে বসে চিন্তা করতে-করতে অভিরূপ পড়তেই ভুলে যায়। সাম্মানিক রসায়নের বৃহৎ গ্রন্থ তার চোখের সামনে খোলাই পড়ে থাকে অথচ সে বই থেকে একটি শব্দও পড়তে পারে না। সাত-পাঁচ চিন্তা করতে-করতেই অভিরূপ একসময় বই ছেড়ে উঠে পড়ল এবং ঘরের মধ্যেই পায়চারী করতে লাগল।

পায়চারী করতে-করতে সুমিতার ডাক শুনে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই দাওয়ায় বসে সুমিতা ফিসফিস করে তাকে বলল, 'গ্রামের লোকে বলাবলি করছে ছুলো আর দীনে কাটোয়া হাসপাতালে গেছে

চিকিৎসা করাতে। দিন-ছুয়েক বাদে ফিরে ওরা নাকি এ গ্রাম থেকে তোমাদের বাস ওঠাবে। সত্যি যদি ওরা জোট বেঁধে এসে হামলা করে তো কি হবে অভিরূপদা! জ্যাঠামশায়, তুমি কি করবে? গ্রামের লোক যে কোন সাহায্য করবে না সে তো সকালেই দেখলে, সত্যিই কি হবে অভিরূপদা…… ?'

সুমিতার কণ্ঠস্বরে যে চিন্তা-মিশ্রিত ব্যাকুলতা ঝরে পড়ল তাতে অভিরূপের বুঝতে অসুবিধা হল না যে, তার শৈশবের সঙ্গিনী সরকার বাড়ীর এই মেয়েটি অন্ততঃ চরম বিপদ ঘটলেও তাদের ছেড়ে যাবে না। মনে-মনে অভিরূপ এই ভেবে কিছুটা নিশ্চিন্ত হ'ল যে, এ গ্রামে পৌরুষবিহীন পুরুষ-বেশী জানোয়ারগুলোর চেয়ে সুমিতার উপর বিপদের সময় অনেক বেশী নির্ভব করা যায়। সুমিতার উদ্বেগাকুল কথাগুলো শুনে সে একবার সুমিতার চোখের দিকে চেয়ে স্পষ্টভাবে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, তার যেন এই মুহূর্তে সুমিতাকে অপরূপা বলে মনে হ'ল। গ্রামের নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের সাদামাটা শ্যামলারঙের এই মেয়েটির মধ্য হঠাৎ যেন অজস্র ঝাড়ের আলো দেখতে পেল অভিরূপ।

সুমিতার মুখের দিক থেকে চোখ না সরিয়েই সে বলল, 'সেই কোন ছোটবেলা থেকে পাশাপাশি বড় হয়েছি দুজনে, এরমধ্যে তুই যে কখন সুমি থেকে সুমিতা হয়ে উঠেছিস তা এতদিন খেয়ালই করি নি। সুমি, তুই কত বড় হয়ে গেছিস! আচ্ছা সুমি, তুই আমাকে সত্যিই খুব ভালবাসিস?'

আচম্বিতে অভিরূপের এ রকম কথা বলার ধরনে সুমিতা বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল কারন একই স্কুল কলেজে দুজনে পড়েছে ও পড়ছে, গ্রাম থেকে শহরে পড়তে প্রায়ই একই সঙ্গে বাসে যাতায়াত করে দুজনে, কিন্তু অভিরূপের মুখ থেকে এ ধরনের কথা কোনদিনই সুমিতা শোনে নি। বয়সের স্বাভাবিক ধর্ম্মে এবং অন্তরের গভীর টানে অনেক সময়েই সুমিতার মনপ্রাণ উন্মুখ হয়েছে অভিরূপের মুখ থেকে ভালবাসার কথা, প্রেমের বানী শোনবার জন্য, কিন্তু

ভুলেও অভিরূপ কোনদিন কোন কারনে কোন দুর্বলতা প্রকাশ করে নি।

আজ হঠাৎ অভিরূপদেরই বাড়ীর দাওয়ায় নিরালা অবসরে তার মুখ থেকে, আচ্ছা সুমি তুই আমাকে সত্যিই খুব ভালবাসিস? শব্দগুলো প্রশ্নের ভঙ্গীতে উচ্চারিত হতে শুনে পরিবেশ-পরিস্থিতি ভুলে সলজ্জ-বিনয়ে মুখটা মাটির দিকে নামিয়ে নিয়ে কম্প্রকণ্ঠে সুমিতা বলল, 'কেন তুমি এতদিন বুঝতে পার নি? আজ নতুন করে প্রশ্ন করতে হচ্ছে?

সুমিতার এই সলজ্জ ভঙ্গী দেখে অভিরূপকে দুষ্টুমিতে পেয়ে বসল, সে প্রশ্ন করল, 'আমার জন্য জীবন দিতে পারিস?' অভিরূপের কথা শেষ হতে না হতেই সুমিতা, 'যে কথা অন্তরের গভীরে থাকলে মর্যাদা বাড়ে সে কথাকে বাইরে টেনে এনে কি লাভ অভিরূপদা? তুমি শুধু এটুকু জেনে রাখ এ গ্রামে জীবন্ত অভিরূপ ঘোষ যদি না থাকে তো সুমিতা সরকারের জীবন্ত দেহও কেউ আর দেখবে না, কারন তখন সুমিতা সরকারের আর বাঁচবার প্রয়োজন থাকবে না, তুমি ছাড়া আমি এক······'বলে আরও কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু অভিরূপ হঠাৎ তার ডান হাতের তালুটা দিয়ে সুমিতার মুখটা ও ঠোঁটদুটো চেপে ধরতেই সুমিতার বাক্য বন্ধ হয়ে গেল, শুধু দু-জোড়া চোখ পরস্পারের দিকে নীরবে চেয়ে থেকে বুকের ভাষাকে বুঝিয়ে দিল। ক্ষণপরে নীরবতা ভঙ্গ করে অভিরূপই বলল, ছ্যাখ সুমি, সত্যিকারের বিপদের দিনে যদি প্রয়োজন পড়ে তুই কেবল আমি যা বলব সেই মত আদেশ পালন করবি, কোন কৈফিয়ৎ তলব করবি না, বুঝলি? যদি বিনা কৈফিয়তে আমার হুকুম তামিল করিস তবেই জানব তুই আমায় প্রাণাধিক ভালবাসিস।' 'তথাস্তু ক্যাপটেন্,' বলে সুমিতা উঠে দাঁড়িয়ে মিলিটারী-ভঙ্গীতে অভিরূপকে একটা স্যালুট দিল। তার এই ভঙ্গীতে অভিরূপ ও সে নিজে একই সঙ্গে হেসে ফেলল। এরপর বেলা প্রায় দুপুর হয়ে গেছে বুঝে সুমিতা নিজের বাড়ীর দিকে রওনা হল।

কাটোয়া হাসপাতাল থেকে দিন পনর পরে ছাড়া পেয়ে ত্বলাল গ্রামে ফিরল এবং প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গ্রামের লোকের মুখে-মুখে তার একটা নতুন নামও শুনতে পেল। 'কানকাটা ত্বলো' নামটা শেষ পর্যন্ত তার কানে পৌঁছল। তু-একদিনের মধ্যে দীনের মত তার নিজস্ব অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও কানকাটা ত্বলো বলে সম্বোধন করতে লাগল। এই নতুন নামে সাড়া দিতে-দিতে সে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করতে লাগল এবং ভিতরে-ভিতরে ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল। অবশেষে যে পরিবারের জন্য তার কানটা কাটা গেছে সেই পরিবার অর্থাৎ মুরারী-বাবু ও অভিরূপের উপর তার ভীষণ রাগ হতে লাগল।

রাগ, অসভ্যতা ঈর্ষা তার মজ্জাগত, তাই সে মনে-মনে ঠিক করে ফেলল—এ অপমানের প্রতিশোধ দিতেই হবে। সামান্য একটা শকুনের জন্য তার ত্বলাল চন্দ্র মণ্ডল নামটাই বদলে গিয়ে 'কানকটা ত্বলো' হয়ে গেল! সে ভাবতে লাগল শকুনটা গাছ থেকে উড়ে না এলে সেদিন ঐ সাইন্সিস্টের বাচ্চা, শালা, ঐ অভিরূপটাকে একবার দেখে নিত! ঘটনাটার কথা ভাবতে-ভাবতে অভিরূপ মুরারিবাবুকে ছেড়ে শকুনি-ত্বটোর উপর তার ভীষণ ক্রোধ জন্মালো। আপনমনে সে ঠিক করল আজই শালা ঐ শকুনি ত্বটোকে শেষ করে দিতে হবে।

গোটা গ্রামের লোক সবাই জানত শকুন-ত্বটো ত্বপুরে খাবার জন্য গাছ থেকে নেমে অভিরূপদের বেড়ার উপর বসে। ত্বলো শকুন ত্বটোকে মারবার সুযোগ হিসাবে ঐ সময়টাকেই বেছে নিল, এবং পাশের গ্রাম পাঁজোয়া থেকে ত্বজন সাঁওতালকে বিষাক্ত তীর-ধনুক সমেত নিয়ে এসে অভিরূপদের বাড়ীর বেড়ার কাছাকাছি এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখল।

ভর-ত্বপুরে, গ্রামের বহু লোকেই যাতায়াতের পথে এ-ঘটনা প্রত্যক্ষ করল কিন্তু পৌরুষহীন ক্লীব গ্রামবাসীগণ কেউই এই অন্যায় কাজের জন্য মুখ ফুটে ত্বলোকে 'কি হচ্ছে এখানে?' বলে সামান্য প্রশ্ন পর্যন্ত করল না। তাদের ভাবখানা এই যে, জবরদস্তি মরাই ভাঙতে বাধা

দিলে এ রকম তো হবেই। বিষাক্ত তীর দিয়ে শুধু শকুন কেন মুরারিবাবু বা অভিরূপকে মারলেও যেন কারও কোন মাথাব্যথা নেই। সমস্ত ব্যাপারটা দেখে বুঝেও মেয়েমানুষের মত গ্রামের পুরুষ-গুলো মাথা নীচু করে যে-যার কাজে চলে যাচ্ছে।

এমন সময় সুমিতা এক গোছা এঁটো বাসন নিয়ে অভিরূপদের বাড়ীর পিছনের ডোবাটায় মাজতে যাচ্ছিল, ব্যাপারটা তার চোখে পড়তেই সে হৈ চৈ করে উঠল, চিৎকার করে বলে উঠল, 'কি গো কি করছ দুলোদা, এখানে? কাকে তীর মারবে গো?' কথাগুলো সে এত জোরে বলে উঠল যাতে অভিরূপদের বাড়ী থেকে শোনা যায়। কথা শেষ না করেই সুমিতা আবার চিৎকার করে 'অভিরূপদা অভিরূপদা' বলে ডাকতে লাগল। ডাক শুনে অভিরূপ তার পড়ার ঘরের জানলায় এসে বাইরে তাকাতেই বুঝতে পারল সুমিতা ডাকছে, সে প্রশ্ন করল, 'কি রে, কি হয়েছে? ভর দুপুরবেলা অত চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?' অভিরূপের কথা শেষ হতে-না-হতে সুমিতা কিছু জবাব দেবার আগেই দুলো ছুটে এসে সুমিতার মুখটা হাত দিয়ে চেপে ধরল।

আচমকা দুলোর ধাক্কাটা সামলাতে না পারায় সুমিতার হাতের বাসনগুলো ঝন্‌ঝন্‌ করে রাস্তায় পড়ে গেল। সুমিতার উপর কিছু একটা ঘটছে বুঝতে পেরে অভিরূপ ছুটে বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে আসতেই দুলো সুমিতাকে ছেড়ে ছুটে গিয়ে অভিরূপের গলাটা চেপে ধরল। অভিরূপের গলা চেপে ধরায় গাছ থেকে বীর উড়ে এসে এবার দুলোর হাতে ছোঁ মারতেই দুলো ভয়ে অভিরূপের গলা ছেড়ে দিয়ে চিৎকার করে সাঁওতাল দুটোকে বলে উঠল, 'মার শালা ঐ শকুনিটাকে, মার শালা……' দুলো 'মার শালা বললে কি হবে, যে দুটো সাঁওতাল ছেলেকে সে পাঁজোয়া থেকে নিয়ে এসেছিল তাদের একজনকে অভিরূপ খুব ভালভাবেই চিনত। তার নাম 'মাতলা', বছরখানেক আগে মাতলার বাবার অসুখের সময় বর্ধমান হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে অভিরূপ তাকে বাসে ভালভাবে বসাবার জন্য সিট ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং কলেজের ছেলেদের কাছ থেকে

এক টাকা দু-টাকা করে চাঁদা তুলে মাতলাকে শ-দেড়েক টাকা সাহায্যও করেছিল।

অভিরূপকে বাড়ী থেকে বের হতে দেখে মাতলা তীর-ধনুক নামিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা কি বোঝবার চেষ্টা করছিল; তারপর দুলোর গলা টিপে ধরা এবং তার হাতে শকুনের ছোঁ মারা দেখে মাতলা সেখান থেকে একটু দূরে গিয়েছিল, কিন্তু অন্য সাঁওতাল ডেবরা তখন ধনুকে তীর লাগিয়ে শকুনটার দিকে যেই তাক করেছে অমনি বেঁটে এসে তার হাতে সজোরে ছোঁ মারতেই হাতের তীরটা খসে মাটিতে পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে শকুনিটার ধেড়ে বাবা-মা গাছ থেকে নেমে সজোরে দুলোর এবং ডেবরার চোখে মুখে পিঠে উপর্যুপরি ছোঁ মারতে লাগল। তিন-তিনটে শকুনের আক্রোশে পড়ে দুলো ও ডেবরা তখন প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে রাস্তা ধরে ছুটতে লাগল, কিন্তু ততক্ষণে বীর আবার তার পিছু নিয়েছে, অবশেষে সুযোগ পেয়ে সজোরে আর একটা ছোঁ মেরে দুলোর বাঁ-কানটা ছিঁড়ে নিয়ে উড়তে-উড়তে এসে অভিরূপের পায়ের কাছে ফেলে দিল। চকিতে একবার মাটিতে তাকিয়ে অভিরূপ বুঝতে পারল যে, দুলোর আর একটা কানও তা হ'লে গেল।

ইতিমধ্যে ভয়ে মাতলা সেখান থেকে ছুটতে শুরু করেছিল আর বেঁটেও তার পিছু নিয়েছিল, কিছুদূর গিয়ে বেঁটে মাতলার মাথায় ছোঁ মেরে কাঁচা চামড়াসমেত এক গোছা চুল নিয়ে উড়তে-উড়তে এসে গাছে বসল। দুশমনেরা অর্থাৎ দুলো, মাতলা আর ডেবরা স্থান ত্যাগ করার বেশ কিছুক্ষণ পরে বীর ও তার বাবা-মা অর্থাৎ ধেড়ে শকুন দুটো এসে গাছে বসল।

এতক্ষণ রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে স্থানকাল ভুলে সুমিতা শকুন-গুলোর কাণ্ড দেখছিল। দেখতে-দেখতে শকুনগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার দু-চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এসেছিল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সে তালগাছের মাথার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, এমন সময় তার মাথার পিছনে কার হাতের স্পর্শে চমকে উঠতেই পাশে

অভিরূপকে দেখে সে আশ্বস্ত ও অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চাইল। অভিরূপ তাকে বলল, 'যা, বাসনগুলো রাস্তা থেকে কুড়িয়ে ধুয়ে নিয়ে বাড়ী যা, তোর ভয় নেই, যতক্ষণ না তুই বাড়ী ঢুকবি আমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব, যা।' অভিরূপর কথায় তার চমক ভাঙ্গল, সে বাসনগুলো কুড়োবার জন্য নীচু হয়েও আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে তাল-গাছটার মাথার দিকে দেখতে লাগল এবং বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'এতদিন তোমার বেঁটে আর বীরের গল্প লোকের মুখেই শুনেছি, আজ নিজের চোখে দেখলাম, আচ্ছা অভিরূপদা, ভাগাড়-খেকো, নোংরা পাখী বলে আমরা যে শকুনগুলোকে ঘেন্না করি তাদের কাছ থেকেও কি এ-গাঁয়ের লোকে কিছু শিখতে পারে না? আশ্চর্য!'

সুমিতার এ কথায় অভিরূপ বলল, 'মানুষ যখন নিজেদের সমাজকে ধ্বংসের শেষ ধাপে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুতি নেয় তখন তারা বিবেকহীন হয়ে পড়ে, চেতনাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। বাবা-মায়ের কথাই শোনে না, তারা আবার শকুনের কাজ দেখে শিক্ষা নেবে!' 'নাঃ অভিরূপদা, এই শকুনগুলোর কাছ থেকেও শিক্ষা নেওয়ার আছে, দেখলে না, সাঁওতালটার তীরকে ওরা কেয়ারই করল না, ধনুকে তীর লাগানো দেখেও ওরা পালাল না অর্থাৎ নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে ওরা তোমাকে আর আমাকে বাঁচাল! 'সত্যি রে সুমি, এই শকুনগুলোর মত একদল মানুষ যদি থাকত তাহ'লে পশ্চিমবাংলার চেহারাটাই হয়ত পাল্টে যেত।' বলে অভিরূপ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল এবং সুমিতা বাসনগুলো নিয়ে ডোবার দিকে গেল।

ইতিমধ্যে গ্রামে রটে গিয়েছিল, অভিরূপকে আজ আবার মারতে গিয়েছিল বলে কানকাটা দুলোর আর একটা কানও শকুনে কেটে দিয়েছে, কানটা রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে; তাই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা একে একে অকুস্থলে হাজির হল, তাদের কারও হাতে পাঁচটা পয়সা, কারও হাতে ফুল-দূর্ব্বা, কারও হাতে একটা নতুন লাল পাড় শাড়ী, কেউ এনেছে ঘটি করে এক ঘটি দুধ।

সবাই এসে একে একে জিনিসগুলো ঐ তালগাছের গোড়ায় রেখে গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে শকুনগুলোকে প্রণাম করতে লাগল। এর মধ্যে আবার অতি-উৎসাহী ভূধর ও শঙ্কর খোল-করতাল নিয়ে হরিনাম করতে-করতে গাছটাকে পাকমারতে লাগল। চিৎকার করে হরিনাম করতে-করতে দু-একবার পাক মারার সঙ্গে সঙ্গে শকুনগুলো গাছ থেকে উড়ে মানুষগুলোর খুব কাছাকাছি নেমে এসে তাদের গায়ে মাথায় বিষ্ঠা ত্যাগ করে আবার গিয়ে গাছে বসল। শকুনগুলোর এ রকম ব্যবহারে ঘৃণায় রাগে উপস্থিত মানুষ-গুলোর মধ্যে দু-একজন রাস্তা থেকে ইটের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে তালগাছের মাথা লক্ষ্য করে যেই ছুঁড়েছে অমনি চারটে শকুনই একসঙ্গে উড়ে সমবেত মানুষগুলোর বাছ-বিচার না করে উপর্যুপরি ছোঁ মারতে লাগল। দু-চারজনকে ছোঁ মারতেই বাকী সকলে কান বাঁচাবার তাগিদে নিজেদের দু-কান দু-হাতে চেপে ধরে যে যার বাড়ীর দিকে দৌড় দিল। তাদের এই দৌড় মারার ভঙ্গী দেখে অভিরূপ আপন মনে হাসতে-হাসতে অস্ফুটে মন্তব্য করল, 'যত্ত সব ভণ্ডের দল।' আরও কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর সুমিতা বাসন ধুয়ে বাড়ী চলে গেলে তবেই অভিরূপ বাড়ীতে ঢুকল।

অভিরূপ বাড়ীতে ঢুকে পড়ার ঘরে গিয়ে একটা চেয়ারে বসতেই মুরারিবাবু এসে বললেন, 'তুই কাল থেকেই হোস্টেলে চলে যা এবং সেখানে থাকবার বন্দোবস্ত কর, না হ'লে তোর পড়াশোনা হবে না, তাছাড়া শকুনগুলো আর এভাবে তোকে কতদিন বাঁচাবে? দুলোরা পিছনে যা লেগেছে তাতে আমাদেরও হয়ত খুব শীঘ্রই এ-গ্রামের বাস তুলতে হবে।' এ কথায় বাবার মুখ পানে চেয়ে অভিরূপ বলল, 'না, না, এই ক'মাসের জন্য আর হোস্টেলে যেতে হবে না, এখান থেকেই হয়ে যাবে, শুধু-শুধু কেন হোস্টেলের চার্জবাবদ অতগুলো করে টাকা খরচা করব।' ······তার কথা শেষ হতে না হ'তে শ্রীলেখা দেবীও ঘরে ঢুকে বলতে শুরু করলেন, 'সে তোকে ভাবতে হবে না, তোর হোস্টেলে থাকবার পয়সা যা করে হোক আমরা

যোগাব, তুই আমাদের কথা শোন বাবা, কালই সকালে তুই হোস্টেলে চলে যা, না হ'লে ঐ শয়তানগুলো তোকে মেরে ফেলবে।' 'মা, তুমি আমার কথাটাই শুধু ভাবলে? গোটা গ্রামে এত লোক, এত ছেলেমেয়ে রয়েছে তাদের কথা একবারও ভাবলে না; দুলো আর দীনের ভয়ে যদি লোকজন একে একে গ্রাম থেকে পালায় তা হ'লে কি গ্রামটার ইজ্জৎ বাড়বে, না, বাকী মানুষগুলো শান্তিতে থাকতে পারবে?' অভিরূপের এ-কথায় শ্রীলেখা দেবী বেশ স্পষ্ট কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'গ্রামের মানুষের জন্য তোর এত ভাবনা, কই তারা তো কেউ তোর জন্য ভাবে না? দুলো যেদিন মরাই ভাঙ্গতে এল সেদিন কিংবা আজ একটু আগে যখন তীর-ধনুক নিয়ে শকুনগুলোকে মারতে এসেছিল তখন তো কই মুখ ফুটে একটি কথাও কেউ দুলোকে বলল না। সার-সার দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে যে যার নিজের মত করে শুধু মজা দেখে বাড়ী চলে গেল। গ্রামের এই শয়তান কাপুরুষ মানুষগুলোর জন্য তোর এত দরদ?' শ্রীলেখা দেবীর কথা শেষ হতে-না-হতে ঘরে এসে ঢুকল সুমিতা। বাসনগুলো কোন রকমে পৌঁছে দিয়ে সে চলে এসেছে। ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে সুমিতা বলল, 'দরদ নয় জেঠিমা, দরদ নয়, কাপুরুষ নির্বোধ স্বার্থপর মানুষ-গুলোকে বাঁচাবার জন্যই আমাদের গ্রামে থাকা দরকার আর এ কাজ অভিরূপদার মত সৎ-সাহসী তরুণ ভিন্ন আর কারও দ্বারা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু অভিরূপ একা কি করবে? যারা নিজেরা নিজেদের ভাল-মন্দ বোঝে না তাদের জন্য অভিরূপ একা লড়াই করতে গেলে তো যে কোন দিন এ গ্রামের মাটিতে অভিরূপেরই লাশ গড়াগড়ি যাবে আর অতি দরদী কেউ-কেউ তখন খান আষ্টেক ইট দিয়ে রাস্তার ধারে শহীদ-বেদী বানাবে যা কুকুর-বেড়ালেরা মূত্র ত্যাগের সুখপ্রদ স্থান হিসাবে ব্যবহার করবে। গ্রামের কোন লাভ তো হবেই না এতে, বরং আমার কোলটাই খালি হয়ে যাবে,' বলতে বলতে রাগে ও আবেগে শ্রীলেখা দেবী কেঁদে ফেললেন। কান্না দেখে সুমিতা

হাত দুটো ধরে বলল, 'আপনি কাঁদছেন জেঠিমা? কিন্তু ভাবুন তো, ক্ষুদিরাম, বিনয়, বাদল, দীনেশ এমনি হাজার-হাজার ছেলে এই তো মাত্র ক'বছর আগে এদেশের জন্য কিই না করেছে? কেমন করে হাসতে-হাসতে জীবন বিসর্জন দিয়েছে?' সুমিতার কথায় মৃদু ধমকের সুরে কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে শ্রীলেখা বলে উঠলেন, 'কিন্তু সে আত্মোৎসর্গ ছিল বিদেশী তাড়িয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। একটা সৎ উদ্দেশ্য ছিল সেক্ষেত্রে, আর এখন দেশের চারিদিকে যা হচ্ছে এটা কিসের উদ্দেশ্যে বলতে পারিস? একই দেশের এক ধরনের লোককে আর এক ধরনের লোকের পিছনে লেলিয়ে দিয়ে দূরে বসে সামান্য কিছু লোক মজা দেখছে আর গ্রাম-গ্রামান্তরে চাষী-মজুরেরা নিজেদের মধ্যে জমি-জায়গা দখল, চাষ-বাস, মজুরী, চাল, কাজের সময়ের হিসাব, পাওনা-দেনা ইত্যাদি নিয়ে মারামারি, রক্তারক্তি করে মরছে। এতে একবার লাভ হচ্ছে কার বলতে পারিস?' কথাগুলো বলে শ্রীলেখা দেবী সুমিতার দিকে আর একবার অভিরূপের দিকে চাইলেন। সুমিতা বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন জেঠিমা, এটা আমাদের খুবই ভুল হচ্ছে! নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করে নিজেদের শান্তি নষ্ট হচ্ছে এবং শক্তি ক্ষয় হচ্ছে। একের সঙ্গে অন্যের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে! সবাই কেবল ভিতরে-ভিতরে চক্রান্ত করে চলেছে কি করে অন্যকে অপদস্ত করবে, হেনস্তা করবে, আর এগুলো করতে গিয়ে যারা দুলো-দীনেকে মনের দিক থেকে পছন্দ করে না তারাও ওদের সঙ্গে সন্ধি করে ওদের মারফত অন্যকে জব্দ করার মতলব আঁটছে। তাই দিনে দিনে দুলো-দীনেদের মত নির্বোধরাই দলে ভারী হচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে·····,' 'এ অবস্থা চলতে থাকলে শুধু পশ্চিমবাংলাই নয়, গোটা দেশটাই ক্রমে পঙ্গু হয়ে যাবে, পুনরায় হয়ত একদিন স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে বসবে, কারণ তখন আর এদেশের মানুষ এক জোট হয়ে বিদেশীদের বিরুদ্ধে লড়তে পারবে না। বিদেশীদের হাতে একে যখন মার খাবে তখন অপরে মজা দেখবে, কারণ অন্তর্কলহ ও ঘরোয়া বিবাদে তখন সকলেই

বিপর্য্যস্ত, নিজেদের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ,' বলে সুমিতার মুখের কথাটা অভিরূপ কেড়ে নিল এবং মাকে আবার বলল, 'ও-সব নিয়ে তুমি ভেবো না মা, পড়াশুনা ফাঁকি দিয়ে কিছু করব না, যা করব তা পড়াশুনা শেষ করে। এখন শুধু ঘরোয়া বিপদে তোমাদের পাশে থাকছি, না, হলে....' একটু থেমে বলল 'আমি হোস্টেলে চলে গেলে তোমার আর বাবার উপর ওরা যখন-তখন জুলুম করবে, টাকা চাইবে, ধান চাইবে, অন্যায়ভাবে চাঁদা চাইবে, পুকুরে ফলিডল দেবে, গায়ের জোরে জমি-জায়গা দখল করবার চেষ্টা করবে, আরও সহস্র রকমের ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। তোমাদের এখানে ফেলে রেখে হোস্টেলে আমি যেতে পারব না, কিছুতেই না।'

অভিরূপ থামতেই মুরারিবাবু বললেন, 'কিন্তু তুই একা......' তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুমিতা, 'কেন একা-একা করছেন জ্যাঠামশায়! অভিরূপদা একা নন, এ সংগ্রামে আমি অভিরূপদার এক বিশ্বস্ত সৈনিক,' বলে মুরারিবাবুর পায়ের পাতায় হাত দিয়ে শপথ করার ভঙ্গীতে আবার বলল, 'জ্যাঠামশায়, এই আপনার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, সর্ব বিপদে, সমস্ত দুঃখের দিনে আমি অভিরূপদার পাশে-পাশে থাকব, তার কথার বিন্দু-বিসর্গ অবহেলা করব না, তার কথায় নিজের প্রাণ বলি দিতে কুণ্ঠাবোধ করব না।' সুমিতার শপথ-বাক্য শুনে মুরারিবাবু এটুকু বুঝে আশ্বস্ত হলেন যে, অভিরূপের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাঁরা ছাড়া এ গ্রামে আরও একজন আছে। তিনি সস্নেহ আদরে কন্যাবৎ সুমিতার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন এবং অবরুদ্ধ কণ্ঠে স্বগতোক্তির মত করে বলে উঠলেন, 'তোদের আশীর্বাদ করি,—তোদের ইচ্ছার জোরে, তোদের কর্মের গুণে অন্ততঃ এ গ্রামের মানুষগুলো যেন নিজেদের চিনতে পারে। ভেদাভেদ ভুলে যেন আবার এক হ'য়ে উঠতে পারে আবার সেই পুরনো দিনের শান্তশ্রী এ-গ্রামটাকে যেন সুন্দর করে তুলতে পারে।'

দিন গড়িয়ে মাস, মাস গড়িয়ে বছর যায়। ইতিমধ্যে সুমিতা ও অভিরূপের পরীক্ষা হয়ে গেছে এবং তার ফলও প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা গেছে—সাম্মানিক রসায়নে অভিরূপ বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ওদিকে সুমিতাও সাম্মানিক ইংরাজীর দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হয়ে পাশ করেছে। অভিরূপ ও সুমিতার পরীক্ষার ফল ভাল হওয়ায় তাদের স্কুল-জীবনের শিক্ষক ফণী চক্রবর্তী মশায় একদিন গ্রামের বারোয়ারী তলায় সম্বর্ধনাসভা ডাকলেন। সে সভায় অভিরূপ ও সুমিতাকে অন্তর থেকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁরা ব্যতীত গ্রামের বহু লোকই উপস্থিত হ'লনা বরং আশেপাশের গ্রামের অনেক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও মাস্টারমশায়গণ এসে অভিরূপকে ও সুমিতাকে শ্রদ্ধা প্রীতি ও সম্মান জানিয়ে গেলেন। গোটা ব্যাপারটা যতক্ষণ অনুষ্ঠিত হল ঐ বারোয়ারী-তলার মাথার উপর ততক্ষণই চার-চারটে শকুন চক্কর দিয়ে পাহারা দিতে লাগল।

অনুষ্ঠান স্থলে সঙ্গীত, আবৃত্তি, স্বরচিত কবিতা ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে সবাই যখন ব্যস্ত তখন দূরে দাঁড়িয়ে ঢুলো অভিরূপকে খতম করবার মতলবে 'হ্যাখ দীনে আজ বহুৎ ভিন গাঁয়ের লোক এয়েচে, এই শালা ভিড়ের মধ্যে পাইপগান চালিয়ে শালাকে শেষ করে খসে পড়ব। এত ভিড়ে গোলমাল লেগে যাবে কে মেরেছে কেউ বুঝতে পারবে না। যাঃ শ্লা, তোর মালটা নিয়ে আয়······,' বলে ঢুলো দীনেকে পাইপগান আনতে নির্দেশ দিল। ঢু-কানকাটা ঢুলোর কথা শুনে দীনে বলল, 'কি বলচিস রে শ্লা, এই ভিড়ে কেউ যদি একবার দেখে ফেলে তাহ'লে আর রক্ষে নেই, এইখানেই পিটিয়ে শেষ করে দেবে, দেখছিস না ভিন গাঁয়ের কত ছেলে-পিলে এয়েচে, আমাদের গাঁয়ের লোকেরা না হয় আমাদের ভয়ে কিছু বলবে না, কিন্তু ভিন গাঁয়ের ছেলেরা পিটিয়ে মেরে দিলে কি করবি ? না, না, ওসব করতে হবে না, বরং শোন, গান শোন, নেকচার শোন, কত ডবকি-ডবকি ছুঁড়ি এয়েচে হ্যাখ, শ্লা ঐ মেয়েগুলোকে দেখে আমার তো শ্লা সেই বিকেল থেকে জিবে জল পড়ছে।' কথাগুলো বলে দীনে

অদ্ভুত এক ভঙ্গী করে হাসতে লাগল আর আর তুলো চাপা গলায় তাকে ধমকে উঠল, 'ধুস শালা, কেবল মেরে ফেলবে মেরে ফেলবে। আরে শ্লা এতই যদি ভয় তাহ'লে আমার সঙ্গে ঘুরিস কানে, যা শ্লা, ঐ মাগীগুলোর পাশে ঘোমটা দিয়ে বসগা যা, তোকে যেতে হবে না, মালটা কোথায় আছে বল, আমি গিয়ে নিয়ে আসছি,' বলে তুলো দীনেকে টেনে এক পাশে নিয়ে এল। পাইপগান আর কার্তুজ কোথায় আছে জেনে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে এসে ভিড়ে মিশে গেল।

ওদিকে সম্বর্ধনা-সভায় মঞ্চে বসে-বসেই সুমিতা তুলো আর দীনের ঘনিষ্ঠভাবে কথোপকথনের ব্যাপারটা এবং তার পরেই তুলোর ছুটে যাওয়া আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে ভিড়ে মিশে যাওয়া সব কিছুই লক্ষ্য করছিল। তুলো বসে পড়বার পর সে নিজের আসন থেকে উঠে ফণীবাবু এবং অভিরূপকে কানে কানে কিছু বললে অভিরূপ সাবধান ও সচকিত হয়ে গেল। আরও প্রায় আধ ঘণ্টাখানেক সভা চলার পর উপস্থিত সকলকে মিষ্টিমুখ করিয়ে ফণীবাবু সভার সমাপ্তি ঘোষণা করলে সভাস্থল থেকে আশপাশের গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীরা মঞ্চে উঠে এসে অভিরূপ ও সুমিতাকে ঘিরে তাদের ভালোবাসা-প্রীতি প্রকাশ করতে লাগল এবং একসময় অভিরূপের সঙ্গেই সকলে মঞ্চ থেকে নেমে হাঁটতে লাগল।

সভাস্থল এলোমেলো হয়ে যেতেই তুলোও তার বসার জায়গা থেকে উঠে অভিরূপের কাছাকাছি হতে চাইছিল। ভিড়ের মধ্যে মিশে এক সময় সে অভিরূপের খুব কাছে পৌঁছে গেল এবং গায়ের চাদরের তলা থেকে পাইপগানটা বের করে যেই চালাতে যাবে এমন সময় কোথা থেকে বীর এসে তার পাইপগানটায় ছোঁ মেরে সেটা ফেলে দিল আর বেঁটে তার ডান চোখটায় ছোঁ মেরে চোখটা প্রায় উপড়ে দিল। তুলোর হাত থেকে পাইপগানটা পড়ে যেতেই আশেপাশের ছেলেরা সঙ্গে-সঙ্গে তাকে ধরে বেদম প্রহার দিতে শুরু করল। তুলোর প্রহার দেখে ওদিকে তখন দীনে পালাতে শুরু

করলে কিছু ছেলে তার পিছনে ধাওয়া করে তাকেও ধরে এনে মারতে-মারতে কৈফিয়ৎ তলব। করতেই সে অভিরূপকে পাইপগানের গুলি করে হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিল। গাঁ, ভিন-গাঁয়ের ছাত্র ও তরুণদের কাছে ভীষণ ভাবে প্রহৃত হয়ে যখন তুলো আর দীনে প্রায় অর্দ্ধমৃত তখন ফণীবাবুর কথায় ছাত্ররা ওদের দু-জনকে ছেড়ে দিল। অভিরূপ এতক্ষণ স্থির হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে শুধু ভাবছিল শত-শত চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেও শকুন দুটোর চোখকে তুলো ফাঁকি দিতে পারে নি। অদ্ভুত এই শকুনগুলোর ব্যবহার!

ঘটনা ঘটে যাবার পর সুমিতা অভিরূপের পাশে এসে বলল, 'ছাখ অভিরূপদা, কিছু একটা ঘটাতে চলেছে এটা আন্দাজ করতে পারলেও তুলো যে এতটা বাড়াবাড়ি করবে এটা কিন্তু আমি ভাবতে পারি নি। সত্যি অভিরূপদা, এরপর আর তোমার এ গ্রামে থাকা উচিত হবে না। এ গাঁয়ের মানুষের উপকারের জন্য যদি যোগ্যতা অর্জনের প্রয়োজন হয় তাহলে এরপর তোমার বাইরে গিয়েই পড়া-শুনা চালানো উচিত। আর একটি দিনও নয়, আগামীকালই তুমি শহরে গিয়ে হোস্টেল বা মেসের সন্ধান কর এবং সেখান থেকেই পড়াশুনা চালাও। এভাবে বিনা কারণে তোমার জীবন দেওয়া চলবে না। ছিঃ ছিঃ, এই আমাদের প্রতিবেশী! এই গ্রামে জন্মেছি বলে আজ লজ্জায় আমার মাথা নীচু হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সম্মান ও আশীর্বাদ দেবার জন্য গাঁ ভিন্‌গাঁ থেকে কত মানুষ এসেছেন আর আমাদেরই গাঁয়ের একটা কি দুটো ছেলে……ছিঃ! অন্য গ্রামের ছেলেমেয়েরা আমাদের এই কুরচি সম্বন্ধে কি ভাবছে বলতো?'

আবেগে ওউত্তেজনায় কম্পমান কণ্ঠে সুমিতার উচ্চারিত শব্দগুলোর অর্দ্ধেকই অভিরূপের কানে ঢোকে নি। সে তখন ভাবছিল অন্য কথা। বার বার তার ক্ষতি করার পিছনে কি যুক্তি থাকতে পারে সেইটাই সে ঐ আধো-আলোছায়ার মায়া-জড়ানো গ্রাম্য রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে বুঝে উঠবার চেষ্টা করছিল। তা হ'লে কি তুলো দীনে

তার কাছ থেকে প্রতিরোধ পেয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে? না কি, সে লেখাপড়ায় ভাল বলে অন্য কেউ ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পিছন থেকে ত্বলো-দীনেকে দিয়ে বার বার তার জীবনহানি ঘটাবার চেষ্টা করছে?

চিন্তা করতে করতে তুটো সম্ভাবনার কোনটাকেই সে বাতিল করতে পারল না, তাই অনেকক্ষণ পরে কিছুটা অন্যমনস্কভাবেই সুমিতার কথার জবাবে বলল, 'আমি গ্রাম থেকে চলে গেলেই কি আর এ খেলার শেব হবে! কোনদিনই হবে না, আমি গেলে আমার বাবা-মার পিছনে লাগবে, তাঁদের জ্বালিয়ে মারবে কিংবা অন্য কোন পরিবারকে নিয়ে পড়বে। যাক, ওসব কথা এখন ভাল লাগছে না, আমি এখন বাড়ী চললাম,'—বলে অভিরূপ বাড়ীর দিকে পা চালাল।

পর দিন সকালে আটটা নাগাদ বাবার নাম ধরে ডাকাডাকি শুনে বাড়ীর বাইরে এসে অভিরূপ দেখল থানা থেকে একজন সিপাহী এসে বাবাকে ডাকছে। অভিরূপ সিপাহী দেখে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হয়ে তাকে প্রশ্ন করল, 'কি ব্যাপার? বাবাকে ডাকছেন কেন?' সিপাহী কোন উত্তর না দিয়ে তার হাতে একটা খাম ধরিয়ে পিয়ন বুক এগিয়ে দিয়ে চিঠিটার প্রাপ্তি স্বীকার করতে বলল। বাবার নামে চিঠি, তাও আবার থানা থেকে, তাই একটু ভেবে সে নিজেই সই করে দিল এবং চিঠিটা খুলে পড়ে বুঝল বেলা একটার সময় থানার বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করবার ফরমান এটা। চিঠিটা পড়েই অভিরূপ বুঝল এটা হয়ত বে-আইনি নির্দ্দেশ, কারণ বাবার নামে কোন এফ. আই. আর. থাকলে বা রিপোর্ট থাকলে তো অফিসার-ইন-চার্জ তাঁকে য়্যারেষ্ট করে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু এ ভাবে চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠানোর কি অর্থ হয় কে জানে! সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে এক সময় সে মনে-মনে ঠিক করে ফেলল,

ডেকে যখন পাঠিয়েছে তখন একবার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেই হবে এবং দেখতে হবে ব্যাপারটা কি ?

মুরারিবাবু সকালে উঠেই মাঠে বের হয়ে গিয়েছিলেন। অভিরূপ খুঁজে-খুঁজে মাঠ থেকে বাবাকে বাড়ীতে এনে সব বললে মুরারিবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় যাব, আমরা তো কোন অন্যায় করি নি, সুতরাং থানায় যেতে দোষ কি আছে ! চল, দেখাই যাক না বড়বাবু কি বলেন।' কিছুক্ষণের মধ্যেই অভিরূপ ও মুরারিবাবু স্নান-খাওয়া সেরে তৈরী হয়ে থানার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

কুরচি-গ্রাম কাটোয়া থানার অধীন। বাড়ী থেকে বের হয়ে থানায় পৌঁছতে বেলা প্রায় পৌনে একটা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করে ঠিক একটার সময় মুরারিবাবু থানার একজন সিপাহী মারফৎ বড়বাবুর কাছে স্লিপ পাঠাতেই সঙ্গে-সঙ্গে বড়বাবু ডেকে পাঠালেন। ঐ সিপাহী মুরারিবাবুকে ও অভিরূপকে পথ দেখিয়ে বড়বাবুর ঘরে পৌঁছে দিল। ঘরে ঢুকে অভিরূপ দেখল একটা টেবিলে কাঠের উপর সাদারঙ দিয়ে লেখা আছে মিঃএস.সি. মজুমদার ও. সি.। সেই টেবিলের কাছে বড়বাবুর সামনে গিয়ে দু-জনে দাঁড়াতেই তাঁদের দিকে অপাঙ্গে একবার দৃষ্টিপাত করে বড়বাবু কর্কশস্বরে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, 'কি নাম তোমার ? মুরারি ঘোষ ?' বড়বাবুর প্রথম প্রশ্নেই অভিরূপ তো একবারে থ, কারণ মুরারিবাবুর বয়স প্রায় পঞ্চান্ন ছুঁই-ছুঁই আর সামনে চেয়ারে উপবিষ্ট অফিসারের খুব বেশী হলে বছর বত্রিশ, তাই, 'কি নাম তোমার' বলায় সে একটু হতবাক হয়ে গিয়েছিল। সে জানত থানার অফিসার ইনচার্জ হতে গেলে একটা মোটামুটি লেখাপড়া জানা লোক হতে হয়। একটা লেখাপড়া জানা লোক যে প্রায় তার নিজের বয়সের চেয়ে দেড়গুণ বেশী বয়সের ভদ্রলোককে 'তুমি' বলে সম্বোধন করবে এটা সে ভাবতেই পারে নি।

এদেশের থানা ও পুলিশ সম্বন্ধে এতদিন অনেক মানুষের অনেক অভিযোগের কথা অভিরূপ ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছে, কিন্তু

প্রত্যক্ষভাবে থানায় সে এই প্রথম এল। থানায় যে ছোট-বড় লঘুগুরু নামী-অনামী সমস্ত ধরনের লোককেই আসামীর বা অপরাধীর দৃষ্টিতে দেখা হয় ইতিপূর্বে এ ধারণা হবার সুযোগ ঘটে নি। আজ প্রথম সুযোগ ঘটল, তাই 'কি নাম তোমার' শুনে সে একটা ধাক্কা খেল। এরপর ও. সি. বললেন, 'গতকাল সন্ধ্যেবেলায় গ্রামে একটা ছাত্র-জনতাকে উত্তেজিত করে নাকি মারামারি ঘটিয়েছ? বয়স তো অনেক হল, এ-বয়সে আর বাচ্চাগুলোকে উস্কানি দিয়ে মারা-মারি করানো কেন? তিনকাল গিয়ে তো এককালে ঠেকেছে, এই বয়সে কি মামার বাড়ীর দেশে গন্ধ-গৃহে বাস করবার সাধ হয়েছে নাকি?'

বড়বাবুর বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে কথা বলা শেষ হতে-না-হতেই অভিরূপ সামান্য উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, 'ভদ্রভাবে কথা বলুন, পুলিশের চেয়ার আর বাজার বিদূষকের চেয়ার এক নয় এটা জেনে রাখবেন।' অভিরূপের এ-কথায় বড়বাবু একেবারে গরম তেলে জলসমেত কাটা বেগুন পড়ার মত চিড়বিড়িয়ে উঠলেন এবং কটমট করে তাকিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন, 'তুমি কে হে ছোকরা? এখানে ডেঁপোমি করতে এসেছ! পুলিশের রুলের একটি গুঁতো খেলেই চুপসে যাবে। একেবারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক, যাকে জিজ্ঞাসা করছি সে সব-কিছুর জবাব দিক।' অভিরূপকে ধমক দিয়ে মুরারিবাবুর দিকে চেয়ে ও. সি. আবার বললেন, 'কি ঘোষকর্তা বাড়ীতে চারটে গুণ্ডা শকুন পুষেছ? তুকতাক করে শকুন লেলিয়ে দিয়ে গ্রামের লোকের কেবল ক্ষতি করছ শুনছি?' মুরারিবাবু সরল সাদাসিধে মানুষ, ও. সি.-র কথা শুনে তিনি তালগাছ হতে শকুনের পড়ে যাওয়া থেকে শুরু করে গত সন্ধ্যার ঘটনার সমস্ত বিবরণ যথাযথ দিলে ও. সি, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বললেন, 'তা হ'লে ঐ শকুন চারটে তোমার লেঠেল, তাই না? শোন ঘোষের পো, তুমি কিন্তু বেশ রসিক লোক আছ! এই বয়সেও বেশ গ্যাস মারতে পার? তা এই সাতসকালেই একটু পেটে পড়েছে নাকি?

যাক শোন, আমি নিজে কাল সকালে তোমার ঐ শকুনবাহিনী দেখতে যাচ্ছি ; উপর থেকে হুকুম এসেছে যেমন করে হোক ঐ শকুন চারটে শেষ করতে হবে, না হলে ঐ গ্রামের কোন উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে না।

ও. সি.'র কথা শেষ হতে না হতে অভিরূপ বলে উঠল, 'উন্নয়নমূলক কাজ করবে তো মানুষ, তা শকুন চারটে তাতে কি বাধা দিয়েছে ? এতদিন গ্রামে যা উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে ওই শকুন চারটে তো তাতে বাধা দেয় নি ! এত কাজ থাকতে হঠাৎ শকুন চারটের উপর আপনার উপরওয়ালাদের এত নজর কেন ?' 'শকুন চারটের উপর নজর কেন সে কথার কি তোকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে উজবুক কোথাকার ?' বলে ও. সি. চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ঠাস করে সজোরে অভিরূপের ডান গালে একটা চড় কষিয়ে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে অভিরূপের তরুণ নরম গালে বড়বাবুর পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ বসে গেল। বড়বাবু অভিরূপের গালে তাঁর বীর্যবত্তা ফলাবার পর মুরারিবাবুর দিকে ঘুরে বললেন, 'গতকালের সন্ধ্যের ঘটনাটা প্রথম কেস বলে এবারকার মত তোমায় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু এরপর সামান্য কিছু ঘটলেও তোমার জন্য ঐ গন্ধ-গৃহ আর আড়ং-ধোলাই, বুঝলে চাঁদু ?' বলে বড়বাবু তাঁর বসবার ঘরের পাশেই থানার লক-আপ রুমের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করলেন !

ওদিকে অভিরূপের মাথা আর তখন কিছু কাজ করছিল না, বিনা দোষে বড়বাবুর চড়টা খেয়ে সে যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। ঐখানে দাঁড়িয়েই সে ভাবছিল, এই আমাদের দেশের থানা, আর তার ও. সি. ! বাঃ সুন্দর সব ব্যবস্থা ! গত সন্ধ্যায় আমি সহস্র লোকের স্নেহ সম্ভাষণ আদর-ভালবাসা পেয়েছি আর রাত্রি কাটতে না কাটতেই আমি কে, কেন এসেছি, কি বলতে এসেছি সে সমস্ত খোঁজ না নিয়েই বড়বাবু গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিলেন ! এই সময় ফণীবাবুর বলা, 'তোকে আই. এ. এস. কি আই. পি. এস. হতে হবে', কথাটা বিদ্যুতের মত তার মনের কোণে ঝিলিক দিয়ে গেল এবং ঐখানে দাঁড়িয়েই নীরবে শপথ নিল—সে আই. এ. এস.

অফিসারই হবে এবং যেখানে পোষ্টিং পাবে সেইখানেই এই ধরনের ইতর অভদ্র থানা অফিসারদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে।

থানা থেকে বের হয়ে রাস্তায় পা দিয়ে অভিরূপের মাথায় একটা চিন্তা খেলা করতে লাগল যে, গত সন্ধ্যার ঘটনাটা ঠিক উল্টোভাবে কার মারফৎ থানায় এল এবং শকুনগুলোর কথাই বা থানায় কে রিপোর্ট করল? দুলো-দীনে তো গত সন্ধ্যায় মার খাওয়ার পর গ্রাম ছেড়ে কোথাও বের হতে পারে নি, তা হ'লে কি শুধু দুলো-দীনেই নয়, ভিতরে আরও লোক দুলো-দীনের হয়ে আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে কাজ করে যাচ্ছে? যদি কেউ তাই করে থাকে তা হ'লে সমস্ত ঘটনা পুরোপুরি বিকৃত করে থানায় বিবরণ পাঠিয়ে তার বা তাদের নিশ্চয়ই একটা বড় লাভ ঘটছে। সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে বিকেল নাগাদ মুরারিবাবু ও অভিরূপ এসে বাড়ীতে পৌঁছল।

দুপুরে সুমিতা একবার অভিরূপের সন্ধানে এসে ফিরে গিয়েছিল। সন্ধ্যার সময় সুমিতা এসে পড়ার ঘরে ঢুকে মেঝেয় মাদুরের উপর অভিরূপের পাশে বসল। সে পাশে এসে বসাতেও অভিরূপ কিছু বলছে না, তাই তার মুখের দিকে চেয়ে সুমিতা দেখল তার মুখটা থমথম করছে। অভিরূপ দারুণ গম্ভীর হয়ে জানলার দিকে চেয়ে রয়েছে এক বোবা শূন্য দৃষ্টি মেলে! অভিরূপের বড় বড় দুটো চোখের দৃষ্টিতে এত শূন্যতা সুমিতা কোনদিনই দেখে নি, দারুণ কিছু একটা ঘটেছে বুঝে সে আস্তে-আস্তে অভিরূপের ডান হাতটা নিজের দু-হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে তার হাতের তালুর উল্টো পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলোতে লাগল। এভাবে কতক্ষণ কেটেছে তার খেয়াল ছিল না, হঠাৎ অভিরূপের অভিমান ও কান্না-মেশানো কণ্ঠস্বরে সুমিতা চমকে উঠল। অভিরূপ তখন বলে চলেছে, 'নাঃ রে সুমিতা, আমার দ্বারা কিসস্যু হবে না, আমি কিসস্যু পারব না, কোনদিন পারব না……' বলতে-বলতে সে অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। মেঝের মাদুরেই উবু হয়ে গড়িয়ে পড়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। অভিরূপের মত শান্ত, সংযত, ধীর-স্থির নম্রভাষী ছেলেকে অমন করে কাঁদতে দেখে

সুমিতাও অস্থির হয়ে পড়ল। সে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে রান্নাঘর থেকে শ্রীলেখা দেবীকে অভিরূপের ঘরে ধরে নিয়ে এল।

শ্রীলেখা এসে অভিরূপের মাথাটা নিজের কোলে তুলে মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, 'কি হয়েছে খোকা, কাঁদছিস, কেন? ছিঃ বাবা, পুরুষ মানুষের কি কান্না শোভা পায়?' তাঁর এ কথার কোন জবাব না দিয়ে অভিরূপ মায়ের কোলে মুখটা গুঁজে দিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল। তার কান্নার বেগ দেখে শ্রীলেখা ও সুমিতার চোখের কোল বেয়েও জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সুমিতা শ্রীলেখা দেবীর কাছে প্রশ্নাকুল কণ্ঠে জানতে চাইল গত সন্ধ্যার পর থেকে নতুন কিছু ঘটেছে কিনা এবং দুপুরেই বা অভিরূপ কোথায় গিয়েছিল। তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীলেখা দেবী বললেন, 'অন্য কিছু তো ঘটে নি. তবে দুপুরে বাপ-বেটায় কাজ আছে বলে কাটোয়া গিয়েছিল, এর বেশী কিছু জানি না। কাটোয়া থেকে বাড়ী ফেরার পর থেকেই দেখছি দুজনের মুখ গম্ভীর, বিকেলবেলায় জলখাবার পর্যন্ত খায় নি।' জেঠিমার কথাগুলো শুনে কাটোয়া যাওয়ার ব্যাপারটায় সুমিতার মনে সন্দেহের উদ্রেক হ'ল কিন্তু সে কিছু বলল না, কেবল অভিরূপের পায়ের কাছে বসে তার পায়ের পাতা-গুলো নিজের কোলে তুলে ধীরে-ধীরে হাত বুলোতে লাগল। আরও বেশ কিছুক্ষণ কাঁদার পর অভিরূপের কান্নার বেগ কিছুটা কমলে সুমিতা বাইরে গিয়ে এক মগ জল ও একটা গামছা নিয়ে এসে, 'অভিরূপদা, ওঠ. মুখে-চোখে একটু জল দিয়ে এস, নাও জল এনেছি। ওঠ, অভিরূপদা প্লীজ ওঠ', বলতে-বলতে তার হাত দুটো ধরে প্রায় জোর করেই তাকে উঠিয়ে বসাল।

উঠে বসেই সুমিতার দিকে চেয়ে অভিরূপ বলল, 'জানিস সুমিতা, ক'দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ফার্স্ট-বয় বলে সমস্ত কাগজে আমার ছবি বেরিয়েছে, গ্রামে কাল আমার সম্বর্ধনা সভা হয়েছে আর আজ আমায় চোর-জোচ্চোর আসামীদের মত ও. সি-র চড় খেতে হয়েছে!' 'সে কি?' বলে সুমিতা আর্ত্ত-চিৎকার করে উঠতেই

অভিরূপ সমস্ত ঘটনাটা তাকে খুলে বলল। তখন সুমিতা স্বগতোক্তির মত মন্তব্য করল, 'সত্যি, আমাদের দেশের পুলিশী প্রশাসনের মাথায় যারা আছে তারা ভাল-মন্দ, পণ্ডিত-মূর্খ, শ্রদ্ধনীয়, সৎ-অসৎ সকলকে একই মাপকাঠিতে কেন যে দেখে! কেন যে ধৈর্যের সঙ্গে মানুষের কথা শোনে না! অনুসন্ধান করে সত্য-উদ্ঘাটনের চেষ্টা করে না তা বোঝা যায় না, অথচ এরা তো সবাই তোমার-আমার মত কোন না কোন মমতাময়ী জননীর গর্ভেই একদিন জন্মেছে, তোমার-আমার মতই স্নেহময় কোন পিতার আদরে ও যত্নে বড় হয়ে উঠেছে, তোমার-আমার মতই কত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছে! শুধু পুলিশে চাকরী পেয়েছে বলেই কি এদের হয়কে নয়, নয়কে হয় করে যা খুশী করবার, মানুষের মান-সম্মান ধন-প্রাণ নিয়ে নয়-ছয় করবার অধিকার জন্মেছে? ওদের মধ্যে বিচার-বুদ্ধি বলতে কি কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না? চিরকাল কি ওরা অর্থের ও অন্যায়ের বশ্যতা স্বীকার করে, শয়তানের প্রতিভূ হয়েই থানাগুলো আলো করে বসবে আর ক্রমাগত দেশ অন্ধকার করে চলবে? নাঃ অভিরূপদা এ অসহ্য, তোমার মত ইউনিভার্সিটির একজন ফার্স্ট বয়কেও চড় মারল? আমিও এই তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি ফণীবাবুর কথা মত আই. এ. এস. কিংবা আই. পি. এস. আমি হবই, তারপর ঐ রকম ইতর ও. সি.-দের কি করে জব্দ করতে হয় একবার দেখব।'

কথাগুলো বলতে বলতে সুমিতার নরম গালদুটো হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠল, তার চোখদুটো থেকে যেন আগুন বের হতে লাগল। অভিরূপের হাতদুটো ধরে টেনে তুলে তার হাতে জলের মগটা ধরিয়ে দিয়ে সে বলল, 'যাও এখন মুখ-চোখ ধুয়ে এস, কেঁদে-কেঁদে মুখ-চোখ সব ফুলে গেছে, যাও ধুয়ে এস।'

সুমিতা ও অভিরূপের কথোপকথনের মাঝখানেই শ্রীলেখা দেবী ঘর থেকে বের হয়ে দুটো কাঁসার রেকাবীতে সামান্য মুড়ি, নারকেল-কুঁড়ো ও ঘরে তৈরী দুটো করে নারকেল নাড়ু এনে তাদের বললেন,

'নে এগুলো তোরা খেয়ে নে, সেই কোন সাত-সকালে চাট্টি করে ভাত পেটে পড়েছে, নে এগুলো খেযে নে।' 'ভাল লাগছে না মা'; বলে অভিরূপ নিজের রেকাবীটা ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু সুমিতার চাপে পড়ে তাকে শেষ পর্যন্ত রেকাবীটা হাতে তুলে নিয়ে খাওয়া শুরু করতে হ'ল। খেতে-খেতেই সুমিতা কাটোয়া থানায় যাওয়া থেকে শুরু করে ও. সি., মিঃ মজুমদারের দুর্ব্যবহারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শুনল এবং সব শেষে অভিরূপের মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'তা হ'লে তুমি কি ঠিক করলে?' 'আমি দু'একদিনের মধ্যেই কলকাতায় গিয়ে কোন মেসে উঠে আই. এ. এস. দেবার জন্য তৈরী হব, সঙ্গে সঙ্গে পোষ্টগ্রাজুয়েশনটা সেরে নেব; কিন্তু এখানে বাবা-মায়ের উপর অত্যাচারটা বেড়ে যাবে রে সুমি!' বলে চিন্তার্ত-কণ্ঠে অভিরূপ আবার সুমিতার দিকে চেয়ে বলল, 'তুইও তো শুনছি বেহালায় তোর মামার বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করবি, তোর উপর ভরসা করে যে বাবা-মাকে রেখে যাব তারও উপায় রইল না; যাকগে যা হয় হবে, আই. এ. এস. আমাকে হতেই হবে।'

কথা বলতে-বলতে ঘড়িতে দেখল রাত্রি প্রায় ন'টা, উঠে দাঁড়িয়ে সুমিতা বলল, 'এবার আমি যাই, না হলে বাবা আবার খোঁজাখুজি করবেন।' অভিরূপ তার ডান হাতটা খপ করে ধরে টেনে, তাকে পাশে বসিয়ে দিয়ে, 'আর একটু বোস সুমি, আজ তোকে এক্ষুনি ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করছে না রে, প্লীজ আর একটু বোস,' বলে করুণ স্বরে অনুরোধ করল।

তার করুণ কণ্ঠের অনুরোধ শুনে সুমিতার মনে হল কোন শিশু যেমন ভয় পেলে যাকে পায় তাকে জড়িয়ে ধরে আশ্রয় খোঁজে অভিরূপেরও মনের অবস্থা এখন প্রায় সেইরূপ। দ্বিরুক্তি না করে সুমিতা তার পাশে বসে পড়ল।

সে বসতেই অভিরূপ হতাশকণ্ঠে বলল, 'আই. এ. এস., আই. পি. এস. হ'য়েই বা কি হবে? চাকরী করতে গেলে তো উপরওয়ালার হুকুম মেনে চলতে হবে, না হ'লেই কথায় কথায়

বদলি. নয় তো সাস্‌পেন্‌শন্‌ অথবা শো-কজ। অন্যায় হুকুম হ'লেও হুকুম তামিল না করলে ষড়যন্ত্র করে স্থানে-অস্থানে ডিউটি দিয়ে পিছনে গুণ্ডা লেলিয়ে খতমও করিয়ে দিতে পারে উপরওয়ালারা। আসলে কি জানিস ? আসলে আমাদের দেশে এখন চলছে রাজার হাজার ঝুরি ভাজার মত শাসনব্যবস্থা, তাই নানারকম ঘৃতে-পক্ক বিভিন্ন স্বাদের ভাজা খেয়ে প্রজাদের শুধু পেটই খারাপ হচ্ছে, স্বাস্থ্য আর ভাল হচ্ছে না, অথচ যত সুস্বাদুই হোক নামটা কিন্তু সেই ঝুরিই থেকে যাচ্ছে। মাঝেমাঝে কি ভাবি জানিস সুমি ? মাঝেমাঝে ভাবি এ দেশের বুদ্ধিজীবিগুলোও কি কাপুরুষে পরিণত হয়ে গেল ? এত অস্বস্তি, এত অশান্তি, এত রকমের অনাচার, হীনাচার. অসদাচার দেখেও কি তারা চিরকাল আরামের তাকিয়ায় হেলান দিয়েই বসে থাকবে ? সরকারী ছাপা নোটে পকেট ভরাচ্ছে বলে কি দেশের মানুষগুলোর প্রতি কোন কর্ত্তব্যই তাদের নেই ? গণতন্ত্র নামের এই ধ্বজা ধুয়ে মানুষ আর কতদিন খাবে কে জানে ?

একটা ছেলে যেই লেখাপড়া শিখে সামান্য একটা চাকরী-বাকরী পেল, অমনি সে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল, সে ভাবতে শুরু করল, যাক আমারটা তো হয়ে গেছে, অপরে যা করছে করুকগে, মরুকগে,' এভাবে কি দেশ চলে ? গ্রামে শহরে, চারিদিকে তাকিয়ে দেখ, রাস্তা নেই ? তো কোই পরোয়া নেই, অলিগলি দিয়ে চল। রাস্তা খানা-ডোবায় ভরা? তো হয়েছে কি, আছাড় খেতে-খেতে, নিজের হাত-পা ভাঙ্গতে-ভাঙ্গতে চল। রাস্তা বর্ষার জলে ডোবা, তাতেই বা কি ! হাত মাথায় তুলে বুক পর্যন্ত নোংরা জলে শরীর ডুবিয়ে চল, রাস্তা জ্যাম, বাস চলছে না ? কোই পরোয়া নেই, সবাই হুড়মুড় করে নেমে পড়ে নিজেদের মধ্যে গুঁতোগুঁতি করতে-করতে, একে অপরকে দাঁত-খিঁচুনি দিতে-দিতে মাইলের পর মাইল হেঁটে চল। হাসপাতালে চিকিৎসা হয় না ? একে অপরকে দোষারোপ করতে-করতে শতাব্দী কাটিয়ে দাও। সরকারী দুধে ইঁদুর ? হতেই

পারে, এদেশের ইঁদুরগুলোও যে ভীষণ অসভ্য! পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ নেই? তার জন্য কয়লা দায়ী কিংবা বৃষ্টি দায়ী কিংবা লোহার মেশিন দায়ী।

স্বাধীনতার প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পরেও এ সবের জন্য কারা দায়ী একথা যদি কেউ ভুল করে প্রশ্ন করে বসে তা হলে উপরওয়ালাদের কাছ থেকে দ্রুত জবাব আসে, এদেশের মৃতেরা দায়ী অর্থাৎ যে উপরওয়ালারা পনর বছর কি বিশ বছর চাই কি হয়ত একশ বছর আগে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন তাঁরা বা তিনিই দায়ী। তাঁর বা তাঁদের ভুলের জন্যই এরকম হচ্ছে, তখন আমি বা আমরা উপরওয়ালা থাকলে এরকম হত না, এতদিনে সমস্ত রাজপথ রূপোর পাতে মোড়া হয়ে যেত, সমস্ত হাসপাতাল নন্দনকানন হয়ে যেত, সমস্ত······' বলে অভিরূপ আবেগের বশে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ সুমিতা তার কথায় বাধা দিয়ে বলল, 'আজ তোমার কি হয়েছে বলত! মনে হচ্ছে ভিতরে-ভিতরে খুব রেগে আছ তুমি?' 'রাগ নয় রে, রাগ নয়, এ আমার অভিমান, অভিমান রে সুমিতা? এ আমার······'

আবার অভিরূপকে থামিয়ে দিয়ে সুমিতা বলল, 'কিন্তু তোমার রাগে, তোমার দুঃখে বা তোমার অভিমানে কার কি আসে যায় বলতে পার? উপরওয়ালারা কি শুনতে আসছে কুরচির মত গণ্ডগ্রামে মাটির ঘরের এক কোণে হ্যারিকেণের অস্পষ্ট আলোয় গরীব চাষী পরিবারের বিশ বছরের একটা ছেলের অভিমান ভরা ব্যথার কথা, বা, দেখতে আসছে তোমার বুকের গোপন কান্না? শোন অভিরূপদা, বড় তোমাকে হতেই হবে। এসব ভাবাবেগে শুধু শুধু সময় নষ্ট করা চলবে না; তুমি বড্ড ভেঙ্গে পড়ছ, একটু শক্ত হও নিজের মনটাকে শক্ত কর। সমস্ত দেশটাকে না পারি অন্ততঃ এই গ্রামটাকেও যদি সম্পূর্ণ শান্তির মুখ দেখাতে পারি তাহলেও জানব আমাদের জীবন সার্থক। দুলো-দীনের-মতো হীন ইতর মানুষগুলো একদিন না একদিন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবেই। এদেশের

বেশীর ভাগ মানুষই হুজুগে মেতে চলে, যে যখন যা বলে তাতেই হুঁ-হাঁ দিয়ে কাজ চালায়। ন্যায় অন্যায় বিচারশক্তি থাকলেও তারা ব্যক্তিগত স্বার্থের তাগিদে, সামান্য অর্থের লালসায়, অন্যায়কে স্পষ্ট-রূপে অন্যায় বলে রুখে দাঁড়াতে শেখেনি। আমাদের কাজ হবে অন্ততঃ এই গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষকে কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায় তা চিনিয়ে দেওয়া। আমরা দু'জনে মিলে যদি এ গ্রামের শ' পাঁচেক মানুষকে তৈরী করতে পারি তো তারা আবার আরও কয়েক হাজার মানুষ তৈরী করে দিতে পারবে। এইভাবেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মানুষের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে একদিন ঐ উপরওয়ালা আর তাদের হুকুম তামিলকারীদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে আর তখনই হবে জনগণের সত্যিকারের জয়।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে সুমিতা থামল।

অভিরূপ আগ্রহের সঙ্গে সুমিতার কথাগুলো শুনছিল, হঠাৎ সে সুমিতাকে কিছু বলতে পারল না, মিনিট পাঁচেক কেটে গেলে পর স্থিরকণ্ঠে বলল, 'চ্যারিটি বিগিন্‌স য়্যাট হোম,' ক্ষুদ্র ক্ষেত্রেই আমাদের কর্ম শুরু করতে হবে, আমাদের গ্রাম দিয়েই শুরু হবে এবং আজ থেকে ঠিক তিন বছর পর শুরু হবে।' কথা শেষ করে সে সুমিতাকে বলল, 'অনেক রাত হ'ল, চল্ তোকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।' 'না, তোমাকে এত রাত্রে বাড়ীর বাইরে যেতে হবে না, চারিদিকে তোমার শত্রু, আমি একলা ঠিক যেতে পারব, তোমাকে যেতে হবে না।'

সুমিতার কথায় আপনজনের উদ্বেগের ছাপ সুস্পষ্ট, সে অভিরূপকে ভালবাসে, তাই তাকে এত রাত্রে বাইরে বের হতে দিতে চায় না, কিন্তু অভিরূপ তার কথায় হেসে উঠল এবং বলল, 'এখন থেকে এত ভয় পেলে ভবিষ্যতে মানুষ নিয়ে কারবার করব কি করে? মানুষকে তো সারাজীবন মানুষের সঙ্গেই চলতে হয়, না হলে বনে গিয়ে বৃক্ষ-লতা-পাতার সেবা করে দিন কাটাতে হয়, চল তোকে দিয়ে আসি,' বলে সুমিতার একটা হাত নিজের হাতের মুঠোয় শক্ত করে

ধরে তাকে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে সে ফিরে এল এবং খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ল।

পর দিন সকালে উঠে অভিরূপ খানকয়েক চিঠি লিখে কলকাতায় তার বন্ধুবান্ধবদের উদ্দেশ্যে পোষ্ট করবার জন্য বাড়ী থেকে বের হয়ে গেল। গ্রামের একবারে পশ্চিমপ্রান্তে প্রায় পাকারাস্তার কাছাকাছি পোষ্ট অফিসে চিঠিগুলো লেটার বক্সে ফেলে মন্থরগতিতে সে যখন পুনরায় বাড়ির দিকে ফিরছে তখন একটা মোটর গাড়ীর আওয়াজ শুনে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, গাড়ীটা পুলিশের জীপ। দেখতে-দেখতে জীপটা ধূলোয় অভিরূপের শরীর ভরিয়ে দিয়ে হুস করে গ্রামের ভিতরে ঢুকে গেল।

পুলিশের জীপ দেখে অভিরূপের মনে আবার চিন্তার উদয় হ'ল। চলতে-চলতেই সে ভাবতে লাগল গতকাল তো বিনাদোষে চড় খেতে হয়েছে, আজ আবার কপালে কি আছে কে জানে? চিন্তা নিজের মনে আবদ্ধ রেখে অভিরূপ ধীর পায়ে হেঁটে বাড়ীর কাছাকাছি এসে দেখল বড় রাস্তার উপর জীপ রেখে বড়বাবু ও আর একজন সিপাহী তাদের বাড়ীর কাছাকাছি তাল-গাছতলায় গিয়ে পৌঁছেছেন।

পুলিশের জীপ এবং স্থানীয় বড়বাবুকে আসতে দেখে গ্রামের লোকজন কেউ মজা দেখবার জন্য এবং কেউ পুলিশের কাজে সহযোগিতার জন্য ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছে গেছে। বড়বাবু উপস্থিত সকলকে শকুনগুলোর সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন আর তার উত্তরে গ্রামবাসীগণ বিগলিত আবেগে যার যা খুশী তাই অভিযোগের আকারে বড়বাবুর কানে তুলে দিচ্ছে। কথাগুলো এমনভাবে বলছে যে, বড়বাবুর যেন কোন রকমেই বুঝতে অসুবিধা না হয় যে শকুনগুলো পঞ্চাশটা জাঁদরেল গুণ্ডার সমান এবং বিশ্বের লোকের ক্ষতি করে বেড়ানোই যেন শকুনগুলোর কাজ। গ্রামবাসীদের মিথ্যা অভিযোগগুলো শুনে বড়বাবু গরম হয়ে মাটিতে বুট ঠুকে আকাশের

দিকে বন্দুক তাক করে পাশের কনষ্টবেলকে বললেন, 'দাস, তুমি একটা ইটের টুকরো নিয়ে গাছের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে শকুনগুলো উড়িয়ে দাও তো, তারপর দেখছি শালা ঐ অভিরূপ ঘোষের সোদর ভাইগুলো কি করে? আমার নাম শান্তসুন্দর মজুমদার, ট্রেনিং-এর সময় টার্গেট কম্পিটিশনে আমি ফার্ষ্ট হয়ে প্রাইজ পেয়েছি কতবার। শালারা গাছ থেকে উড়লেই এক এক গুলিতে এক-একটাকে ফেলব, ওগুলোকে উড়িয়ে দাও।'

উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে সুমিতাও একপাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল, বড়বাবুর বন্দুক তাক করা দেখে সে সামনে এগিয়ে এসে বন্দুকের নলে হাত রেখে জোড়াহাতে বড়বাবুকে অনুরোধ করল, 'দোহাই আপনার, ওদের মারবেন না, ওরা কারও কোন অনিষ্ট করে না, বরং অনিষ্টকারীকে ওরা শাস্তি দেয়, দোহাই আপনার, ওদের মারবেন না।' বড়বাবু বন্দুকটা একবার ঝাঁকিয়ে উপস্থিত সকলের সামনে সুমিতার দিকে চেয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'আরে এ বজ্জাৎ মাগীটা আবার কোত্থেকে জ্ঞান দিতে এল. সরে যা হারামজাদী, না হলে এক চড়ে নরম গাল দিয়ে কচি-বেলার দুধ বের করে দেব!'

অভিরূপ একপাশে দাঁড়িয়ে চুপচাপ এতক্ষণ সব শুনছিল। সে আর থাকতে না পেরে একেবারে বড়বাবুর সামনে এসে দাঁড়িয়ে তীব্র চোখে বড়বাবুর দিকে চেয়ে চিৎকার করে উঠল, 'লেখাপড়া শিখে থানাদারের চাকরী নিয়ে ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েদের খারাপ ভাষায় গালমন্দ করাটাই তাহ'লে এখনকার দিনের পুলিশ অফিসারদের কাজ? আর চোর-গুণ্ডা বদমাসদের থানায় ডেকে নিয়ে গিয়ে চা-বিস্কুট-বিড়ি খাইয়ে, যুক্তি দিয়ে যত রকমের বে-আইনী কাজে মত জুগিয়ে, প্রশ্রয় দিয়ে, তাদের বিরুদ্ধগামী কেসগুলোকে নিজেদের মনের মত করে ঘুরিয়ে ডাইরী লিখে অর্থের বিনিময়ে তাদের বেকসুর খালাসের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যই বোধহয় জনসাধারণের ট্যাক্সের টাকায় আপনাদের বেতন গোনা হয়, তাই না!'

একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে তীব্র ভ

কথাগুলো অভিরূপকে বলতে শুনে ও. সি. প্রথমটায় একটু থমকে তার দিকে বন্দুকের কুঁদোটা উঁচিয়ে তেড়ে যান এবং 'এতক্ষণ তা'হলে শুধু হিরোইন ছিল এবার দেখছি হিরোও এসে গেছে, তার মানে এবার তা'হলে থিয়েটার আরম্ভ হবে। নাও হে দাস, এবার তা'হলে কাজ ফেলে থিয়েটার দেখ··· ,' বলে দাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে একটা কুৎসিত ইঙ্গিত করলেন। বড়বাবুর এই কদর্য ভাষার ইঙ্গিত বুঝে অভিরূপ পুনরায় তাঁকে বলল, আপনাকে আবার আমি সাবধান করে দিচ্ছি, ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে যা তা বলবেন না। ভুলে যাবেন না যে, আপনিও আমাদেরই মত একটা ভদ্রলোকের সংসারে জন্ম নিয়েই আজ পুলিশ অফিসারের ইউনিফর্ম চাপিয়ে এ গ্রামে আসবার অধিকার পেয়েছেন, ভুলে যাবেন না যে, সাধারণ মানুষকে হেনস্তা আর অপমান করাটাই আপনার একমাত্র কাজ নয়, তাদের অভিযোগ-অনুযোগ শোনা, তদন্ত করা, তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা নেওয়াটাও আপনার কাজ······' 'কাজ · ডিউটি ? শালা শূয়োরের বাচ্চাটা আমায় ডিউটি শেখাতে এসেছে ? দাস, দাও তো তোমার বেল্টে গোঁজা বেতের রুলটা একবার আমাকে, শালা শূয়োরটাকে ডিউটি কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিই '

কথাগুলো বলে পাশের কনষ্টেবল্ দাসের কাছ থেকে রুলটা নিয়ে বেপরোয়া পিটতে লাগল। অভিরূপকে যখন বেপরোয়া পিটে চলেছে ঐ সময় সুমিতা এসে তাকে আঁকড়ে ধরে আড়াল করবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু বড়বাবু তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দু'জনকেই পিটতে লাগলেন।

বড়বাবু যে মুহূর্তে অভিরূপের উপর রুল চালাতে শুরু করেছেন সেই মুহূর্তেই কিন্তু নিঃশব্দে বীর আর বেঁটে গাছের মাথা থেকে উড়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করেছিল। হঠাৎ বীর বড়বাবুর বাম গালে সজোরে একটা ছোঁ মারতে দাস বন্দুক তুলে তাক করতে না করতেই বেঁটে সজোরে আর একটা ছোঁ মেরে দাসের বাম কানটা ছিঁড়ে নিয়ে দূর আকাশের দিকে চলে গেল।

উপস্থিত জনসাধারণ দেখল বড়বাবুর বাম গালের প্রায় দু' ইঞ্চি জায়গার আধ ইঞ্চি মত মাংস কেটে নিয়ে বীর উড়ে গেছে আর কনষ্টেবল দাসের বাম কানটার তুলোর কানের মত অবস্থা। একজনের গাল আর একজনের কান থেকে দরদর করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। আচম্বিত এই ঘটনায় ও সি. সাহেব ও দাসবাবু যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে রাগে ক্ষোভে বন্দুক ধরে উড়ন্ত শকুনগুলোর পিছু ধাওয়া করতেই তাদের পিছনে বীর-বোঁটের বুড়ো বাবা-মাও ও. সি. সাহেব ও দাসবাবুর পিছু ধাওয়া করতে লাগল। ছুটতে-ছুটতে জীপের কাছাকাছি পৌঁছে জীপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দুজনে দুদিক থেকে যখন পাখীগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখছেন ঠিক সেই সময় দুজনের উপর প্রায় একই সঙ্গে ধেড়ে শকুনগুলো ছোঁ মারতে শুরু করল। এবার দুটো পাখীর দুটো ছোঁয়ে বড়বাবুর ডানকান ও দাসবাবুর বামচোখ গেল। সঙ্গে সঙ্গে দুজনের হাতের ট্রিগারে চাপ পড়ল এবং তার ফলে দূরে দণ্ডায়মান দুজন গ্রামবাসীর শরীর মাটিতে গড়িয়ে পড়ল. একজনের মাথার ভিতর দিয়ে বুলেট এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে গেল, আর একজনের তলপেটের ভিতরে বুলেট ঢুকে গেল।

গ্রামবাসী দুজন ধরাশায়ী হতেই গোটা গ্রামের লোক ক্ষুব্ধ আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে শয়ে শয়ে তেড়ে জীপের দিকে ছুটতে শুরু করল। ব্যাপার বেগতিক দেখে আহত অবস্থায় কোন রকমে ও. সি. সাহেব এবং দাসবাবু জীপে উঠতেই ড্রাইভার জীপের গতি বাড়িয়ে গ্রাম ছেড়ে বের হয়ে গেল, কিন্তু পিছনে রেখে গেল দুটি নিরীহ গ্রামবাসীর নিশ্চল শরীর। সমস্ত ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে. অভিরূপ ও সুমিতা কিছু করে ওঠার আগেই দুটি দেহ নিষ্প্রাণ হয়ে গেল। যাদের বাড়ীর লোক মারা গেল তারা ঐ রাস্তার উপরেই শোকে-বিলাপে ভেঙ্গে পড়ল।

উপস্থিত গ্রামবাসীগণের মধ্যে কেউ-কেউ অভিরূপের দিকে আঙ্গুল তুলে বলল. 'ঐ শালার জন্যই যত অনাছিষ্টি কাণ্ড ঘটছে। গাঁয়ে কোত্থেকে দুটো শকুন ধরে এনে পুষেছে, শালা শকুনে গোটা

গাঁটাকে একেবারে জ্বালিয়ে দিলে।' কেউ বললে,—'মার শালাকে, দূর করে দাও গাঁ থেকে।' দু-একজন অতি সাহসী এগিয়ে এল অভিরূপকে মারবে বলে, সঙ্গে-সঙ্গে সুমিতা ছুটে এসে অভিরূপকে আড়াল করে, উচ্চস্বরে তাদের উদ্দেশে বলে উঠল, 'য়্যাই, ভীমসেনের বাচ্চারা, এতক্ষণ কোথায় ছিলি? ঘরের মেয়েকে যখন পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপমান করছিল, রুলের ঘায়ে শরীরে দাগ করে দিচ্ছিল তখন তোদের সাহস কোথায় ছিল? দু-দুটো গ্রামের মানুষকে যখন বিনা দোষে পুলিশ খুন করে গেল তখন সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে কেন পুলিশের বন্দুক মুচড়ে ধরতে পারলি না? লজ্জাহীন ইতর কোথাকার সব! এখন অভিরূপ ঘোষের উপর বীরত্ব দেখানো হচ্ছে! আগে অভিরূপ ঘোষের পায়ের বুড়ো আঙুলের এককণা নখের যোগ্য হ তারপর তার উপর বীরত্ব দেখাবি, নোংরা কাপুরুষের দল কোথাকার।'

সুমিতার কথায় যে ছেলেগুলি অভিরূপকে মারবে বলে এগিয়ে এসেছিল তারা তখন ভয়ে পিছিয়ে গেল, কারণ তারা ভাবল হয়ত সুমিতাই একা নয়, অভিরূপের দলে ভিতরে-ভিতরে হয়ত আরও কেউ-কেউ আছে, তার উপর আবার শকুনের ছোঁয়ের ভয়। শকুনের কথা মনে হতেই ছেলেগুলো আরও পিছিয়ে গেল।

অবস্থা কিছুটা শান্ত হতেই অভিরূপ বলল, 'এখনই এই ডেড-বডি নিয়ে আমি কাটোয়ায় এস. ডি. ও. অফিসে এবং বর্দ্ধমান ডি. এম. অফিসে ডাইরী করতে যেতে চাই, কে কে আমার সঙ্গে যাবেন বলুন।' অভিরূপের এ কথায় উপস্থিত সকলে চুপ হয়ে যায়, কারও মুখ দিয়ে বাক্য সরে না, দু-এক মিনিট নীরব থেকে এবার অভিরূপ যে ছেলেগুলি তাকে একটু আগে মারতে এসেছিল তাদের সামনে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কি তোমরা যাবে না? তোমরা তো অন্য সবার থেকে বেশী সাহসী, অন্ততঃ তোমরা আমার সঙ্গে চল। ডি. এম. অফিসে গিয়ে আমি ডাইরী লেখাব আর তোমরা সাক্ষ্য দেবে, চোখের সামনে যা দেখেছ শুধু সেইটুকুই বলবে, কি যাবে না?'

বলে প্রখর দৃষ্টিতে অভিরূপ তাদের দিকে তাকাল। সেকেণ্ড কয়েকের মধ্যেই অভিরূপ দেখতে পেল তার চোখের সামনেটা ফাঁকা হয়ে গেল। নানা কাজের মিথ্যা অজুহাতে যে যার বাড়ীর দিকে কেটে পড়ল। অভিরূপ তীব্র ধিক্কারের সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, 'এই তোমাদের সাহস ? এই সাহস নিয়ে তোমরা নিজেদের বাঁচাবে ? নিজেদের মা-বোনেদের ইজ্জৎ রক্ষা করবে ? ইতর পশুর দল কোথাকার।' অভিরূপ যখন তীব্র চিৎকার করছে তখন ভীড় ঠেলে হন্তদন্ত হয়ে ফণীবাবু তার কাছে এসে বলে উঠলেন, 'আমি দেব সাক্ষী, চল তুমি ডি. এম. অফিস, আমার আটষট্টি বছর বছর বয়স হয়েছে, প্রাণের মায়া আর নেই, পুলিশের জুলুমকেও ভয় করি না, আমি জানি ম্যান ইজ মর্ট্যাল. 'জন্মিলে মরিতে হবে', সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য পুলিশ যদি ষড়যন্ত্র করে আমাকে মেরেও ফেলে তবু আমি দেব সাক্ষ্য, চল অভিরূপ কোথায় যেতে হবে চল বাবা।'

আজ সকাল থেকে অভিরূপ মাস্টারমশায়কে ঘটনাস্থলে দেখতে পায় নি, তাই হঠাৎ তাঁকে অকুস্থলে হাজির হতে দেখে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল. 'মাস্টারমশায়, আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ?' সামান্য এই কয়েকটা শব্দের মধ্যেই অভিরূপের কণ্ঠে কান্নার ছোঁয়া স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। মাস্টারমশায় বললেন, 'আগামী পরশু আমার নাতনীর অন্নপ্রাশন, কাটোয়া গিয়েছিলাম বাজার করতে, এইমাত্র বাড়ীতে ফিরেই সকাল থেকে ঘটে-যাওয়া গ্রামের ঘটনাগুলো শুনে দৌড়তে-দৌড়তে এখানে এসেছি। হায়, হায় অভিরূপ, কি ঘটতে কি ঘটে গেল, অকারণে ধনা আর কচের জীবন গেল। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। দুটো অন্যায়কারী দুলো আর দীনেকে বাঁচাতেই উপরওয়ালাদের হুকুমে ও. সি. সাহেব এসেছিলেন শকুন মারবার জন্য --এই সামান্য কথাটা গ্রামের এত লোকের মধ্যে কেউ বুঝল না ?'

মাস্টারমশায়ের এই কথায় অভিরূপ সুমিতা এবং পাশ থেকে আর একটি বার-তের বছরের ছেলে একই সঙ্গে বলে উঠল, 'আমরা বুঝেছি মাস্টারমশায়।' তিনজনের মধ্যে একটি বাচ্চা ছেলের কণ্ঠস্বর

শুনে সকলে খুঁজতে লাগল : এই তৃতীয় কণ্ঠ কার ? ইতিমধ্যে সেই ছোট ছেলে অনুরূপ এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, সে তখন মাস্টার-মশায়েয় দিকে একটা আনন্দবাজার কাগজ তুলে তাতে দিন কয়েক পূর্বে প্রকাশিত অভিরূপের ছবিটাব দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলতে লাগল, 'অভিরূপদাকে পুলিশ যখন মারছে আমি তখন এক দৌড়ে বাড়ী থেকে কাগজটা নিয়ে এসে পুলিশকে দেখিয়ে বলতে চাইলাম অভিরূপদাকে মারবেন না. উনি আমাদের ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট বয়, আমাদের গাঁয়ের মুখ উজ্জ্বল করা ছেলে, কিন্তু আমার হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিয়ে মন্নুদা আমার কান মলে দিয়ে, 'এই বজ্জাত ছেলে, অভিরূপের দালাল, পুলিশে ধবলে তোকে অভিরূপদার বাপ বাঁচাবে ? যা বদমায়েস বাড়ী যা,' বলে আমার গালে ঠাস করে একটা চড় মেরে ঠেলে আমাকে ওখান থেকে সবিয়ে দিল।'

অনুরূপ সরকার, সুমিতার কাকার ছেলে। ঐটুকু বাচ্চা ছেলে অনুরূপের সৎসাহস দেখে অভিরূপ. মাষ্টারমশায় ও সুমিতার চোখে জল এসে গেল। সুমিতা দৌড়ে গিয়ে তাকে বুকে টেনে নিয়ে তাব দু-গালে চুমু খেয়ে বলল, 'ভাই. তুই-ই-ই……' 'হ্যাঁ দিদি, আমি, আমি সব বুঝি দিদি·· গাঁয়ের মানুষগুলোর ভাল কববার চেষ্টা কবছ বলে গাঁয়ের লোকগুলো তোমাদের পিছনে লেগেছে।'

অনুরূপের একথায় বৃদ্ধ মাষ্টারমশায় পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে যান। তিনি ভাবতে থাকেন একটা বারবছরেব শিশুও যা বোঝে এ গাঁয়ের এই ধেড়ে ধেড়ে লোকগুলো তা বোঝে না ? আসলে এরা সব বুঝেও না বোঝার ভান করে চোখ কান বন্ধ করে থাকে। এ যেন কুকুরের ভয়ে খরগোশের কান চাপা দেবার মত ঘটনা। মানুষ যে দিন দিন এ রকম হয়ে যাচ্ছে কেন তা বোঝা যায় না। কথাগুলো চিন্তা করতে-করতে ফণীবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তিনি অভিরূপের দিকে 'চল, এবার তৈরী হয়ে নাও, এক্ষুনি আমাদের বর্দ্ধমান ডি, এম, অফিসে যেতে হবে', বলে তিনি অনুরূপকে বড় রাস্তার থেকে একটা ভাড়ার জীপ গাড়ী ডেকে আনতে নির্দেশ দিলেন।

মিনিট কয়েকের মধ্যে জীপ গাড়ী এসে দাঁড়াতেই অভিরূপ যেই লাশ তুলতে গেল অমনি ধনা ও কচের বাড়ীর লোক বাধা দিয়ে বলল, 'আমাদের তো যা হবার হয়েইছে, ফালতু আর পুলিশে ডাইরী করে হাঙ্গামা বাড়িয়ে লাভ নেই।' মাষ্টারমশায়কে ধনার বাবা বলল, 'জানেন তো, 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা ; পুলিশের সঙ্গে কে লড়বে মশায়! আমাদের ছেলের লাশ আমাদেরই বুঝতে দিন আপনাদের আর মাতব্বরী করতে হবে না।' বাধা পেয়ে ফণীবাবু ও অভিরূপ মূহূর্তে বুঝে নিল, গোটা গ্রামটা দুষ্ট চক্রের শিকার। ছেলে মারা গেলেও বাবা পুলিশে ডাইরী করতে ভরসা পায় না, অদ্ভুত! অদ্ভুত মানসিকতা আজকের মানুষের! এমন ক্লীব মানুষ ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মাবে এবং তিল-তিল করে বর্দ্ধিত হবে, আবার তারাই পুলিশের বেতনের জন্য বছরের পর বছর ট্যাক্স গুণে যাবে? তারাই পুলিশের চাকরী-দাতা উপরওয়ালাদের উপশমের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে দেশটা ধ্বংস করে দেবার জন্য তাদের দিকে চক্রাকার নিয়মে তাকিয়া এগিয়ে দেবে! বাঃ-বাঃ সুন্দর ব্যবস্থা! চমৎকার মানসিকতা!

ঐখানে দাঁড়িয়েই অভিরূপ চিন্তার সাগরে নিমগ্ন হচ্ছিল কিন্তু ফণীবাবু এসে তার হাতখানা ধরে তাকে টেনে জীপের দিকে এগিয়ে দিতেই, 'মাষ্টারমশায় আমিও যাব' বলে সুমিতা এগিয়ে এল। 'ওঠ তুইও ওঠ', বলে ফণীবাবু এবার ধনার বাবা আর কচের দাদার কাছে এগিয়ে গিয়ে, 'ডেড বডি তোমরা···· জীপে তুলতে দিলে না ঠিক আছে কিন্তু বর্দ্ধমান থেকে পুলিশ আসবার আগে কোন রকমেই যেন মৃতদেহ দুটো এখান থেকে সরানো না হয়। আমরা খোদ ডি, এম, সাহেবের কাছে ডাইরী লিখিয়ে বর্দ্ধমান থেকে পুলিশ এনে বডি তাদের হাতে তুলে দিতে চাই একথা যেন মনে থাকে।' বলে জীপে উঠতেই হুশ করে জীপ ছেড়ে দিল।

জীপ বের হ'য়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনার বাবা ও কচের দাদাকে গ্রামের কিছু লোক যুক্তি দিল যে, পুলিশের হাতে পড়লে ভিটে মাটি

উচ্ছন্নে যাবে, সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বডি এখান থেকে সরিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং তারাও গ্রামের লোকের যুক্তি অনুযায়ী তাড়াতাড়ি দুটো ছেঁড়া মাদুরে মৃতদেহ দুটোকে মুড়ে গ্রামের থেকে মাইলখানেক দূরে খড়ি নদীর তীরে পোড়াবার জন্য যেই লাশ কাঁধে তুলতে যাবে অমনি বীর আর বেঁটে গ্রামের লোকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু' একজনের গালের মুখের পাশ দিয়ে সাঁ সাঁ করে উড়ে যেতেই ভয়ে সকলে ছুটে সেখান থেকে পালাল আর মৃতদেহ দুটো যথাস্থানে পড়ে রইল। বীর আর বেঁটে উড়ে উড়ে মৃতদেহগুলো পাহারা দিতে লাগল।

ঘণ্টাদুয়েক পরে পর-পর খান তিনেক জীপ এবং পুলিশের একটা বড় ভ্যান গ্রামে ঢুকে সোজা একেবারে মৃতদেহ দুটোর কাছে চলে এল। একখানা জীপ থেকে ফণীবাবু, অভিরূপ ও সুমিতা, একটা জীপ থেকে ডি, এম, সাহেব, একটা জীপ থেকে এস, পি, সাহেব পর-পর নেমে পড়লেন এবং মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে নিজেদের কর্তব্য সম্পাদনে তৎপর হলেন। তাঁদের কথায় সাহস পেয়ে গ্রামের অনেকেই ঘটনার সত্য বিবরণ পেশ করে সাক্ষ্য দিল এবং পুলিশকে মৃতদেহ নিয়ে যেতে দিল। পুলিশের ভ্যান এবং অফিসারদের জীপ গ্রাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর শকুন দুটো গিয়ে গাছে বসল।

ওদিকে দিন কয়েকের মধ্যেই কাটোয়া হাসপাতালের কেবিনে শুয়ে ও, সি, মিঃ মজুমদার এবং সিপাহী মিঃ দাস, এস, পি, সাহেবের সাসপেনশন্ অর্ডার পেল এবং অর্ডারের বয়ান পড়ে বুঝল কুরচি গ্রামের ধনা ও কচে হত্যার আসামী হিসাবে কোর্টের রায় না বের হওয়া পর্যন্ত তাদের বেতনও বন্ধ থাকবে। বিছানায় পড়ে পড়ে ও, সি, সাহেব কুরচি গ্রামের শকুনগুলোর উপর রাগে ফুঁসতে লাগলেন, কারণ শকুনগুলোর জন্যই আজ তাঁর এই অবস্থা। পুলিশ জীবনে এর আগেও বহু ন্যক্কারজনক অপরাধ তিনি করেছেন, কোন মানুষে

তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারে নি, আর দুটো পাখীতে আজ তাঁর এই অবস্থা করল। আরও দিন দু'য়েক পরে বেডে শুয়ে শুয়েই মজুমদার সাহেব ও দাসবাবু কোর্টের পরোয়ানা পেলেন এবং পরোয়ানা হাতে দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এস, পি, সাহেব নিজে এসে ওদের দু'জনকে হত্যার অপরাধে য়্যারেষ্ট করে বেডের সামনে পুলিশ পোষ্টিং করে গেলেন

মিষ্টার মজুমদার বিছানায় শুয়ে-শুয়েই হিসাব করে দেখলেন কোর্টে হাজিরার এখন দিন সাতেক দেরী আছে। এ কেস থেকে পরিত্রাণ পেতে গেলে এরই মধ্যে সুস্থ হয়ে উপরওয়ালাদের কাছে তদ্বির করা একান্ত প্রয়োজন। তাই দরজার পাহারাদার নিম্নপদের পুলিশ দু'জনকে উৎকোচ দিয়ে তিনি উপরওয়ালাদের সঙ্গে চিঠিপত্র চালাচালি করতে শুরু করে দিলেন। কিন্তু সাতদিনের মধ্যে এমন কিছু ব্যবস্থা করে উঠতে পারলেন না যাতে তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায় উঠতে না হয়। বাধ্য হয়ে তাঁকে ও দাসকে নির্দ্ধারিত দিনে আসামীর কাঠগড়ায় উঠতে হল এবং প্রথম দিনেই অভিরূপ, সুমিতা, ফণীবাবু এবং অনুরূপের সাক্ষ্য থেকে তাদের অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে জজ সাহেব ওদের দু'জনকে জেল হাজতে পাঠাবার নির্দেশ দিলেন।

মাস ছয়েক মামলা চলবার পর জজসাহেব যেদিন রায় দেবেন ঠিক সেই দিন সকালে তাঁর বাংলোয় একজন উপরওয়ালার টেলিফোন এল। ফোন তুলে হ্যালো করতেই জজ মিঃ গুহ শুনলেন ও-প্রান্তের কণ্ঠ বলছে, 'আমি উপরওয়ালা মি. সান্যালের পি এ বলছি, কাটোয়া থানার ও সি. মিঃ মজুমদারের বিরুদ্ধে রায় দেবার সময় রায়টা একটু ভেবেচিন্তে দেবেন, না হ'লে বুঝতেই পারছেন আপনার অবস্থাও হয়তো······যাক গে কোথাকার কে দুটো গরু ভেড়া মারা গেল, তার জন্য কে কোথাকার কে একটা মার্ডার কেস করে দিল আর অমনি মিঃ মজুমদারের দশ বছর জেল হয়ে গেল, দেখবেন এরকমটা যেন না হয়······'

মিঃ গুহ এতক্ষণ চুপচাপ শুনেই যাচ্ছিলেন কোন উত্তর করছিলেন না। তিনি চুপচাপ রয়েছেন বুঝে ও-প্রান্তের মানুষটি আবার বলল, 'কি মি. গুহ, ব্যাপারটা আপনার মাথায় ঢুকেছে তো ?' বলে মিঃ গুহর উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে টেলিফোন কানেকশন্ কেটে দিল। এ প্রান্তে নীরব টেলিফোনটা হাতে নিয়ে দায়রা জজ মিঃ গুহ হতভম্বের মত সোফায় বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলেন তারপর নিজের মনে শক্তি সঞ্চয় করে উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের মত ও আইনের ধারা অনুযায়ী যথারীতি কি রায় দেবেন মনে মনে ঠিক করে নিলেন, তারপর পাশে রাখা একটা ছোট টেবিলের উপর টাইপমেসিনে বসে একটা কাগজে সামান্য কিছু টাইপ করে সেটা পকেটস্থ করে কোর্টে যাবার জন্য তৈরী হলেন।

সাতাশে মার্চ বেলা ঠিক এগারটায় কোর্ট বসলে আসামীপক্ষ ও ফরিয়াদী পক্ষের ডাক হ'ল। সকলে এজলাসে হাজির হতেই জজ মিঃ গুহ তাঁর রায় দিলেন : তাঁর রায়ে অভিরূপ ও সুমিতার মত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্রকে অকারণে মারধোর করার জন্য মিঃ মজুমদারকে ছ'মাস জেল এবং ধনা ও কচের মার্ডারের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করে ও. সি, মিঃ মজুমদারকে ও সিপাহী দাসকে যথাক্রমে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। রায় পাঠ শেষে তিনি কোর্ট মুলতুবী করে চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে চিফ্-জজের নিকট পরের দিন আঠাশে মার্চ থেকে তাঁর চাকরীতে ইস্তফার নিবেদন পত্রখানি জমা দিয়ে ধীরে-ধীরে কোর্ট প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করলেন। জজের এই রায় দান থেকে অভিরূপ, সুমিতা ও ফণীবাবু কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। তাঁদের মনে সামান্য আশার আলো দেখা দিল, এইজন্য যে, এখনও মিঃ গুহর মত বিচারশক্তিসম্পন্ন ও সৎসাহসী কিছু মানুষ এদেশে আছেন, যাঁরা চাকরী বা জীবনের পরোয়া না করে ন্যায়কে, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে উৎসুক হয়ে থাকেন। ফণীবাবু ও অভিরূপ মনে মনে ভেবে নিল যে, এই রকম মানুষ বিচারালয়ের প্রত্যেকটি চেয়ারে আজ বড় প্রয়োজন। এঁরা মনে মনে জজ মিঃ গুহকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হলেন।

গ্রামের লোক যখন শুনল থানার ও. সি.-র সাজা হয়ে গেছে তখন তারা অবাক হয়ে গেল। পূর্বের সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদ ভুলে বিভিন্ন বিপদে-আপদে ফণীবাবু, অভিরূপ ও সুমিতার নিকট যুক্তি পরামর্শ করতে আসতে লাগল এবং নিজেদের মধ্যেকার বিবাদগুলো মিটিয়ে ফেলতে লাগল। মাস কয়েকের মধ্যেই গ্রামে আবার পুরোন দিনের শান্তির আবহাওয়া ফিরে এল। সমস্ত ব্যাপারটা দেখে কিছুটা স্বস্তিবোধ করে এবার অভিরূপ ও সুমিতা পড়াশুনায় মন দেবার জন্য যে-যার নির্দিষ্ট স্থানে চলে গেল। অভিরূপ গেল কলকাতার সূর্যসেন ষ্ট্রীটের একটা মেসে আর সুমিতা গেল মামার বাড়ী বেহালায়। যথারীতি মনোযোগ সহকারে দুজনেই পড়াশুনা চালিয়ে যেতে লাগল। অভিরূপ সায়েন্স কলেজে য়্যাপ্লায়েড-কেমিষ্ট্রী এবং সুমিতা কলেজ ষ্ট্রীট ক্যাম্পাসে ইংরাজীতে এম. এ. পড়ছে। অভিরূপ কোন কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন অফিসে এলে কালেভদ্রে সুমিতার সঙ্গে দেখা হয় এবং সামান্য কথাবার্তা হয়, অন্য সময় যে-যার পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

এমনি করে প্রায় মাস দুয়েক কেটে যেতেই অভিরূপ মেসে বসে একদিন বাবার চিঠি পেল। তিনি লিখেছেন কিছুদিন হ'লো দুলো আর দীনে গ্রামে ফিরে এসে তাঁর ফণীবাবুর এবং সুমিতার বাবার উপর নানারকম অত্যাচার আরম্ভ করে দিয়েছে। তাঁদের তিনটে পরিবারেরই জমিতে গ্রামের বাউরীদের কিছু লোককে জে. এল আর. ও অফিসে নিয়ে গিয়ে বর্গা লিখিয়েছে এবং জোর করে চাষ করিয়েছে। পড়াশুনায় ব্যাঘাত হবে বলে বাবা এতদিন এ সমস্ত কথা লেখেন নি, কিন্তু অত্যাচারের মাত্রাটা দিনদিন বেড়েই চলেছে দেখে নিরুপায় হয়ে তিনি পত্র লিখেছেন। বাবার চিঠিখানা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়ে অভিরূপ বুঝল যে, উপরওয়ালাদের পেটোয়া ও. সি. মি. মজুমদারের শাস্তি হয়ে যাওয়াতে উপরওয়ালাদের নির্দেশেই কানকাটা দুলো ও দীনে এই সব নষ্টামী আবার নতুন করে শুরু করেছে। বাবার চিঠিতে অভিরূপ এও বুঝল যে গ্রামের তিনটি

পরিবারের লোকগুলি ভিন্ন অন্যেরা তুলো আর দীনের ভয়ে আবার সেই ভীতু মুষিকের রূপ ধারণ করেছে। চিঠিখানা রেখে মেসের ঘরের জানালার কাছে গিয়ে বাইরে আকাশের দিকে চাইতেই আকাশে তুটো বক উড়ে যেতে দেখে অভিরূপের মনটা বীর আর বেঁটের জন্য খারাপ হয়ে গেল। বাবা অবশ্য চিঠিতে লিখিছেন বীর আর বেঁটে ভালই আছে কিন্তু তবু অভিরূপের মনটা এক্ষুণি বীর আর বেঁটেকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে হয়ে উঠল। সে টেবিল থেকে বাবার চিঠিটা আর একবার তুলে নিয়ে বীর আর বেঁটের সম্বন্ধে লেখা কথাগুলো বার বার পড়ল এবং চিঠিটা আবার রেখে দিল। মাসখানেক পরে পূজার ছুটি। তখন বাড়ী গিয়ে বেঁটে আর বীরকে দেখতে পাবে এই সান্ত্বনা মনে রেখে অভিরূপ যথানিয়মে ক্লাস করে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে লাগল। পূজার আর আট-দশ দিন মাত্র বাকী, সায়েন্স কলেজ থেকে বেলা তুটো নাগাদ ক্লাশ শেষ করে বের হ'য়ে অভিরূপ সোজা ইউনির্ভাসিটির ইংরাজী বিভাগে এসে সুমিতার সঙ্গে দেখা করে তুজনে কলেজ স্কোয়ারে একটা বেঞ্চে বাদাম চিবোতে-চিবোতে গ্রামের বাড়ীতে যাবার দিনক্ষণ ঠিক করল ও ঘণ্টাখানেক কথাবার্তার পর নিজের মেসে ফিরে এল।

পূর্ব-নির্দ্ধারিত সময় অনুযায়ী অভিরূপ পঞ্চমীর দিন সকাল প্রায় সাড়ে ছ'টার সময় হাওড়া স্টেশনের বড় ঘড়ির সামনে এসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই সুমিতাও এসে সেখানে হাজির হল। অভিরূপ আগেই তুটো টিকিট কেটে রেখেছিল, সুমিতা আসার সঙ্গে সঙ্গে তুজনে হাতের ব্যাগগুলো নিয়ে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে সাতটা পাঁচের ২০৯ নম্বর আপ হাওড়া বর্দ্ধমান লোকালে চেপে বসল। ট্রেনে সারা রাস্তা নিজেদের পড়াশুনার কথা, ক্লাশের নানা মজার ঘটনার কথা, অধ্যাপকদের পড়ানোর দক্ষতার কথা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করতে করতে প্রায় সাড়ে নটা নাগাদ বর্দ্ধমান স্টেশনে এসে নামল। ষ্টেশন এলাকা থেকে বের হয়ে সামনে 'অন্নপূর্ণা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে ঢুকে তুজনে তুখানা করে সিঙ্গাড়া ও তুটো করে রসগোল্লা

খেয়ে বাসস্ট্যাণ্ডে গিয়ে লাইনে দাঁড়ানো প্রথম বাসটায় দারুণ ভীড় দেখে পরের বাসে যাবার জন্য পিছনের বাসে গিয়ে নিজেদের সুবিধা মত স্থানে বসল। বাস ছাড়তে তখনও বেশ খানিকটা দেরী, তাই দুজনে দুখানা বই নিয়ে পড়তে শুরু করল। বাসে সুমিতা ছিল লেডিস সীটে আর অভিরূপ কয়েকটা সীট পিছনে। ইতিমধ্যে বাস চলতে শুরু করেছে, একসময় সুমিতার ডাক শুনে অভিরূপ বুঝল যে, সুমিতা তাকে টিকিট কাটতে নিষেধ করছে, কারণ সুমিতাই তাদের দুজনের দুখানা টিকিট কেটেছে। অভিরূপ এই রকমই, পড়তে বসলে কানের কাছে ঢাক বাজলেও তার অসুবিধা হয় না, তাই বাসের শত যাত্রীর সহস্র অসুবিধা বা কণ্ডাক্টরের শত চিৎকার সত্ত্বেও তার পড়ার কোন অসুবিধা হল না। অবশেষে ঘণ্টাখানেক বাদে সুমিতার ডাকে তার খেয়াল হল যে তাদের গ্রামের স্টপেজ এসে গেছে, এবার নামতে হবে। হাতের বইটা চট করে ব্যাগে ভরে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল এবং ভীড় ঠেলে কোন রকমে বাইরে এসে রাস্তায় পড়ল। রাস্তায় নেমে সুমিতার হাতের ব্যাগটাও অভিরূপ নিল এবং দুজনে ধীর পদক্ষেপে গ্রামের রাস্তা ধরে এগোতে লাগল। রাস্তায় চলতে-চলতে অভিরূপ একবার আকাশের দিকে চাইতেই দেখতে পেল বেঁটে-বীর আর তাদের মা-বাবা ঠিক মাথার কাছে উড়তে-উড়তে এগিয়ে চলেছে। অনেক দিন পর বেঁটে ও বীরকে দেখে অভিরূপ ও সুমিতার মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল। তারা দুজনে খুশীতে উচ্ছল হয়ে একবার হাততালি দিল। গ্রামের মেঠোপথে আলের ধারে প্রস্ফুটিত কাশের দিকে চেয়ে উৎফুল্লচিত্তে সুমিতা বলে উঠল, 'ছাখ ছাখ, অভিরূপদা ছাখ, কত কাশ ফুটেছে? কি সুন্দর লাগছে না?' প্রায় আটমাস পরে শহরের ঘিঞ্জি আবহাওয়া থেকে মুক্তির স্বাদ পেয়ে অভিরূপেরও এই মুহূর্তে খুবই ভাল লাগছিল। অনেক দিনের পরিচিত জন্মস্থান এই কুরচি গ্রামকে দু-হাতে বেড় দিয়ে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছিল ওদের। কিন্তু স্বভাবতঃ শান্ত অভিরূপ সুমিতার মত উচ্ছল না হয়েই আনন্দঘন কণ্ঠে জবাব দিল, 'সত্যিই সুন্দর রে

সুমি, সত্যি অপূর্ব, কিন্তু আমার মায়ের এই রূপ তোর-আমার মত করে ক'জন আর দেখছে বল? মায়ের এই মোহময়ী রূপের উপর সন্তানেরা এখন রক্ত ছেটাতেই ব্যস্ত, চন্দন নয়, রক্ত। জুতোর দাগ ছাড়া আজ মায়ের বুকে স্বস্তিকা চিহ্নের দাগ আর পড়ে না, বড় দুঃখ হয় রে সুমি, বড় দুঃখ হয়। সামান্য ক'জন শয়তান নিজেদের স্বার্থের তাগিদে মাকে এখন শ্যামলিমাহীন করে তুলেছে, মায়ের হৃদয় থেকে নিঙড়ে নিয়েছে স্নেহপ্রীতির নির্যাস, বদলে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে রক্ত আর আগুনের বেত আর বুলেটের উল্লাস, মায়ের বুকের পরতে-পরতে এখন বাসা বেঁধেছে বিচ্ছিন্নতাব বিষাক্ত কীট, তবু আমার মায়ের দেহ থেকে পদ্মের সব পাঁপড়ি, কাশের সব কুঁড়ি ঝরে পড়ে নি, এখনও পুরোপুরি মিলিয়ে যায় নি চন্দনের সুরভি, এখনও মুছে যায় নি, কিছু-কিছু সুখস্বপ্ন, কিছু-কিছু আনন্দের আভাস, তাই মায়ের বুকের সামনে সন্তানের ছুরি দেখলে বড় দুঃখ হয়, বড় দুঃখ হয়।'

অভিরূপের আবেগপূর্ণ কথা শুনে ঘুরে দাঁড়িয়ে সুমিতা সোজাসুজি তার চোখে চেয়ে বলল, 'অভিরূপদা, তুমি এত ভালবাস এই গ্রামকে, এই মাটিকে? অভিরূপ আমাকেও আশীর্বাদ কর আমিও যেন তোমার মতই এই মাটিকে এই গ্রামকে ভালবাসতে পারি অভিরূপ।' হঠাৎ অভিরূপদা থেকে অভিরূপ বলে সম্বোধিত হওয়ায় অভিরূপের অন্তরে বিস্ময়ের সঙ্গে তীব্র অননুভূতপূর্ব এক আনন্দের মধুরিমা বয়ে গেল বিদ্যুৎগতিতে। সে সুমিতার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে, 'কি বলে ডাকলে সুমি; প্লীজ আর একবার ডাক, প্লীজ', বলায় সুমিতা লজ্জা পেয়ে গেল, কারণ ক্ষণপূর্বে আবেগের আতিশয্যে অভিরূপদাকে অভিরূপ বলে সম্বোধন করার মধ্য দিয়ে অন্তরের যে সত্যটাকে সে প্রকাশ করে ফেলেছে এবং সেই সত্য প্রকাশিত হওয়ার ফলে অভিরূপের মনে তাৎক্ষণিক যে অনুরনণ ঘটেছে সেজন্যই নারীর স্বাভাবিক লজ্জা এখন সুমিতাকে চেপে ধরল, তাই অভিরূপ বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সে তক্ষুনি আর 'অভিরূপ' বলে সম্বোধন

করতে পারল না, বরং লজ্জানত মুখ ঘুরিয়ে সে ধীরে-ধীরে গ্রামের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। তার এই লজ্জাটুকু দেখে অভিরূপ মনে-মনে নিঃশব্দে হেসে নিল।

কয়েক পা যেতেই, 'দিদি, দিদি, দিদি' ডাকে চমকে তাকিয়ে কয়েক গজ দূরেই অনুরূপকে দেখতে পেল। আলপথ ধরে তীব্র বেগে তাকে ছুটে আসতে দেখে সুমিতা বলল, 'অনু, ছুটিস না, আস্তে আয়, পড়ে যাবি আস্তে আয়।' কিন্তু কে শোনে কার কথা. তিন লাফে এগিয়ে এসে দিদিকে প্রণাম করে অভিরূপকে প্রণাম করল এবং দিদির ডান হাতের আঙ্গুল ধরে বলল, 'ওঃ দিদি, তুমি আর অভিরূপদা কত দিন পরে এলে, তোমাদের জন্য আমার ভীষণ মন খারাপ করে, গ্রামের কোন ছেলে আমার সঙ্গে মিশতেই চায় না, বলে তোর সঙ্গে মিশলে একঘরে করে দেবে, সারাদিন পড়ি অঙ্ক কষি, স্কুলে যাই আর বিকেলে বাড়ীর উঠোনে একাই খেলি। জানো মাঝখানে কিছুদিন আমাদের তিন বাড়ীর ধোপা-নাপিত ঝি-চাকর সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তারপর হুলো-দীনেকে চাঁদা দিয়ে ধান দিয়ে তবে সব মিটমাট হয়েছে।' ছোট্ট অনুরূপের কথা শুনে সুমিতা ও অভিরূপ বুঝতে পারে এতদিন কলকাতায় বসে খবরের কাগজে পড়ে তারা যা জানতে পারছিল অর্থাৎ উপরওয়ালাদের বে-আইনী অহিতকর কর্মে বাধাদান-কারী সরল সাহসী মানুষগুলোকে শায়েস্তা করবার জন্য জেলায় জেলায় এখন বয়কট ব্যবস্থা চলছে তার মানে আবার পুরাতন জমিদারী ব্যবস্থাই ঘুরে ফিরে এল। আগেকার দিনের জমিদারদের আমলেও অবাধ্য প্রজা শাসন করবার জন্য এই রকমই হুকুমনামা জারী হত আর গুলি বন্দুকের চেয়েও শক্তিশালী এই বয়কট-বোমার প্যাঁচে পড়ে কত নির্দোষ প্রজা ঘাড় নীচু করে দোষ স্বীকার করে জমিদারবাবুকে জরিমানা দিয়ে তবে পার পেত। গ্রামে বেশীর ভাগ লোকের বাড়ীতে টিউবওয়েল নেই, সকলের পুকুরও নেই সুতরাং কেউ যদি ফরমান জারী করে যে 'ওমুক' সরকারী টিউবওয়েল বা গ্রামের কোন পুকুর থেকে জল নিতে পারবে না তো

মানুষ জল পান না করে কতক্ষণ টিকবে ! কেউ যদি ফরমান জারী করে ওমুকের বাড়ীর কারও অসুখ করলে কেউ ডাক্তারখানায় যেতে পারবে না বা গেলেও যে ডাক্তার তার চিকিৎসা করবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে তাহলে সে বাড়ীর লোক বশ্যতা স্বীকার না করে কতক্ষণ টিকে থাকবে !

অনুরূপের কথা শুনে সুমিতা ও অভিরূপ একেবারে হতবাক হয়ে যায়, তাদের তুজনেরই মনে হতে থাকে যেন শরীরের ভিতরের হৃদপিণ্ডটা এক্ষুনি নিস্তব্ধ হয়ে পড়বে। সুমিতা একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে অভিরূপকে বলল, 'চল অভিরূপদা আমরা কলকাতায় ফিরে যাই, এ অবস্থায় আমরা গ্রামে ঢুকলে যদি আবার নতুন করে কিছু উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, যদি নতুন করে গ্রামের লোকের আবার কোন ক্ষতি হয় ! তার থেকে চল আমরা ফিরে যাই, আরও তু'বছর পরে পড়াশুনা শেষ করে আমরা গ্রামে ঢুকব।' 'সে কি রে? বাড়ীর কাছে এসে বয়কটের ভয়ে কলকাতা ফিরে যাব? চল আগে গ্রামে ঢুকি, লোকের মুখে শুনি আজকাল কি কি নতুন জিনিস ঘটছে, নতুন পলিসি খাটছে, তার উপর বুড়ো বাবা-মায়েরা আছেন, তাঁদের দেখে না গেলে মন খারাপ করবে না? চল চল কত দেশের কত বড় বড় আন্দোলন কোথায় তলিয়ে গেল আর সামান্য এই বয়কট আন্দোলনের জন্য গ্রামে এসে আমরা পালিয়ে যাব? কেন, আমরা চুরি করেছি, না, ডাকাতি করেছি যে, আমাদের বয়কট করবে লোকে? য়্যাঁ?' অভিরূপ থামতে না থামতে সুমিতা উদ্বেগ ব্যাকুল কণ্ঠে তাকে বলল, 'অভিরূপদা, তুমি বুঝতে পারছ না, এই বয়কট আন্দোলন সামান্য নয়, এ এক বিরাট অস্ত্র, আণবিক বোমার চেয়েও ভয়ঙ্কর অস্ত্র, সাধারণ দীনদরিদ্র· মধ্যবিত্ত, এমন কি, উচ্চবিত্ত মানুষও এর সাঁড়াশি চাপে পড়ে দলে দলে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হবে, এ কি নিদারুণ অভিশাপ আমাদের গ্রাম্যজীবনে চাপিয়ে দেওয়া হ'ল? ছিঃ ছিঃ অভিরূপদা, এই সমাজে বাস করে উপরওয়ালারা সেই সমাজেরই একটা অংশের উপর এমন অস্ত্র প্রয়োগ করবার আগে একবার ভাবল না,...ছিঃছিঃ।'

'কেন ভাববে বল, এ দেশের উপরওয়ালারা বেশীর ভাগই শহরবাসী, গ্রামবাসীদের দুঃখকষ্টের কথা তাদের মাথায় আসবে কি করে? বিশেষ করে পলিসি যারা তৈরী করছে তাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব তো আর কেউ কুরচির মত নগণ্য গ্রামে বাস করে না। সুতরাং এদেশের এক শ্রেণীর পেটোয়া লোক দিয়ে আর এক শ্রেণীর লোক ধ্বংস করার সুবিন্যস্ত পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ তো বরাবরই ঘটে চলেছে। আসলে দিকে-দিকে জনতার মাঝখানে আগুন লাগিয়ে উপরওয়ালারা বিষ-দাঁত বের করে হেসে কুটী কুটী হচ্ছে, আর মাঝখান থেকে ভিন্‌দেশী ও বাইরের লোক এসে দুধের সরটুকু খেয়ে মুখ চাটতে-চাটতে বেরিয়ে যাচ্ছে।'

অভিরূপের কথা শেষ হতে না হতে সুমিতা বলে উঠল, 'অভিরূপদা, আমার কিন্তু একটুও ভাল লাগছে না, কলকাতায় গত কয়েক মাস বাসকালে তুমি খেয়াল করেছ, পশ্চিমবাংলার রাজধানী কলকাতায় বাঙালীর যেন কোন সম্মানই নেই, সবাই যেন কেমন কোণঠাসা। একজন বাঙালী যখন বাসে-ট্রামে অসাবধানতায় অপর বাঙালীর পা মাড়িয়ে ফেলে তখন তীব্র ভাষায় এক বাঙালী অপর বাঙালীকে অপমান করে, জামার কলার ধরে, কিন্তু অন্যেরা যদি কোন বাঙালীর পা মাড়িয়ে দেয় তো বাঙালীর ছেলেগুলো কি রকম ভয়ে নিশ্চুপ হয়ে থাকে, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করে না। দু-বেলা অফিস-টাইমে শহরতলী থেকে কিছু বাঙালী কলকাতায় ঢোকে বলে শহরটাকে পশ্চিমবাংলার কোন শহর বলে মনে হয়, না হলে তো······'

'আরে চুপ চুপ, কি বলছিস্ তুই, ধানখেতের ধানগাছেরা তোর কথা শুনে ফেলবে, আলের ধারের কাশফুলেরা তোর কথা শুনে ফেলবে আর তোর জেল হয়ে যাবে', বলে অভিরূপ নিজের ডান হাতের তর্জ্জনীটা দু-ঠোঁটের মাঝখানে চেপে ধরে সুমিতাকে চুপ করতে নির্দেশ দিলে সুমিতা ফুঁসে উঠল, বলল, 'কেন চুপ করব শুনি? পশ্চিমবাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে আমি বাঙালী' এই কথাটা জোর গলায় বলতে যদি ভয় পেতে হয়, আর বললে যদি তোমাদের

সেকুলারিজমের তাসের ঘর ধূলিসাৎ হয় তো হোক, তবু আমি যে বাঙালী এ কথাটা পৃথিবীর যেখানেই থাকি আজীবন জোর গলাতেই বলব। আসলে সবাই বলতে সাহস পাচ্ছে না, বিশেষ করে উপরওয়ালারা, তার কারণ তাঁরা সবাই আজ অন্যদের কাছে মাথা বিকিয়ে বসে আছেন, আর মাথা বিকিয়ে বসে আছেন বলেই স্বদেশিকতার কথা আওড়াতে ভয় পান, না হলে দেখ না বাঙালীর ছেলেরা পূজার সময় অন্যদের দোকানে লাইন দিয়ে প্যান্ট-শার্টের ছিট কিনছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, অতুলপ্রসাদ, ডি. এল. রায় ও অন্যান্য আধুনিক বাঙালী কবিদের লেখা গানের রেকর্ড ছেড়ে অন্য গানের রেকর্ড কিনতে ব্যস্ত। বাঙালীর দোকান থেকে জিনিস কেনা যে প্রাদেশিকতা নয় স্বদেশিকতা বা বাংলা ভাষার গানের রেকর্ড কেনার প্রবণতাটা যে স্বদেশিকতা এ-কথাটা যেন কোন বাঙালীর ছেলের আর মনেই নেই। অথচ দেখ বাঙালী ছাড়া অন্যেরা কি রবীন্দ্রসংগীতের নজরুলগীতির রেকর্ড কেনে? বাংলা আধুনিক গানের রেকর্ড কেনে? ক'জন বাঙালীর ছেলে বাংলা সিনেমা দেখে বলতে পার, আর তার তুলনায় তারা অন্য সিনেমা কত বেশী সংখ্যায় দেখে হিসাব করে দেখ তো? আমি বলছি না যে অন্ধ বাঙালীত্ব সকলকে গ্রাস করুক, অন্যদের ভাল জিনিসটুকু নিতে নিষেধও করছি না, কিন্তু সব কিছুর মধ্যেই একটা স্বদেশিকতাবোধ না থাকলে জাতিটার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে একথা কি কেউ ভাবে? একটা কারখানায় বিভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন কতিপয় কর্মচারী ইউনিয়ন গড়ে একজোট হয়ে মালিকের নিকট দাবী আদায় করবার জন্য আন্দোলন করতে পারে, কিন্তু বাঙালীর ছেলেদের নিজেদেরই তৈরী ভিন্ন-ভিন্ন দলগুলো একজোট হয়ে, যূথবদ্ধ হয়ে বাংলার মাটিতে শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে অন্যদের কেন বলে দিতে পারে না যে, বাংলার কলকারখানায় আমাদের চাকরী দিতে হবে, বাঙালীর দোকান থেকে জিনিস কিনতে হবে, বাঙালী মা-বোনেদের ইজ্জৎ দিতে হবে? আমরাই, এই বাঙালীর ছেলেমেয়েরাই

যদি কলকারখানায় দশ-বার জনকে নিয়ে ইউনিয়ন করে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারি তবে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে চার লক্ষ জনকে বা চার কোটী মানুষকে কেন একজোট করতে পারি না? এই না পারাটাই উপরওয়ালাদের দুর্বলতা, দেশের স্বার্থের পরিপন্থী, মানুষের উপকার করবার মানসিকতার পরিপন্থী। তার ফলে বাঙালীদের নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন দলীয় মারামারির সুযোগগুলি অন্যেরা পুরোপুরি গ্রহণ করছে এবং খোঁজ করলে দেখা যাবে যে, এই মারা-মারি এবং ভাগাভাগি লাগিয়ে রাখার জন্য অন্যরা কিছু-কিছু বাঙালী ছেলেদের মাসোহারাও দিচ্ছে।

সুমিতা উত্তেজনা ও আবেগের বশে এতগুলো কথা বলে একটু দম নেবার জন্য থামতেই অভিরূপ বলল, 'আজ তুই দেখছি খুব ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েছিস? কি ব্যাপার বলতো? তুই তো এভাবে একপেশে কথাবার্তা কোনদিনই বলিস না? আজ তোর হল কি? হঠাৎ বাঙালী-বাঙালী করছিস কেন বলতো?'

মনের দুঃখে অভিরূপদা, মনের দুঃখে। কলকাতায় দেখ না ট্রামে বাসে রাস্তায় ঘাটে বাঙালীর ছেলেরাও মাতৃভাষাটা অন্যদের মত কি রকম টেনে টেনে উচ্চারণ করছে আজকাল? এমনভাবে উচ্চারণ করে মনে হয় যেন তারা সব লণ্ডন, নিউইয়র্ক বা প্যারিস থেকে এসে সবেমাত্র এদেশে নেমেছে আর বাংলাভাষাটা যেন তাদের কাছে কোন বিদেশী ভাষা। উত্তর ও মধ্য কলকাতার যে কোন দোকানে ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী দোকানদাররাও অন্য ভাষায় ভিতরে ঢুকতে আহ্বান জানায়, বসতে বলে। কি রকম অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটে চলেছে সবার সামনে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে। বাঙালী বাড়ির মালিক বাঙালী ভাড়াটের কাছে পুরোন দিনের ভাড়া বাড়াবার আবেদন করলে ভাড়াটেরা ভাড়া না বাড়িয়ে নানা রকম ঝামেলা পাকিয়ে বাড়িওয়ালাকে বিপর্য্যস্ত করে তুলছে যার ফলে বাড়ির মালিকগণ 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' করে শয়ে-শয়ে বাড়িগুলি অন্যদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। অন্যরা বাড়ির মালিক হয়েই থানাদারদের এবং পাড়ার গুণ্ডাশ্রেণী কিছু

বাঙালী ছেলেদেরই হাত করে বাঙালী ভাড়াটেদের হটিয়ে নিজেদের লোকজন এনে ভরছে এবং কলকাতায় দিনে-দিনে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে। ইদানিং আবার শহরের পার্কও বিক্রী হয়ে যাচ্ছে! আমাদের উপরওয়ালারা সব দেখেও দেখছে না, সব বুঝেও বুঝছে না। উপশমের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে সবাই বেশ আরামেই রয়েছে।' কথাগুলো বলতে-বলতে সুমিতা হঠাৎ তার ব্যাগ খুলে 'এই নাও, পড়ে দেখ, বলে একটা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের বিশেষ একটা স্থান দেখিয়ে দিল। তার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে অভিরূপ 'কলকাতা তথা পশ্চিমবাংলা কাদের?' হেডিংটি দেখে আগ্রহান্বিত হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েই পড়তে শুরু করল……

'কলিকাতা মহানগরীর পত্তন ও বিকাশ সাধন হয়েছিল প্রধানতঃ ইংরাজ বণিককুল, কিছু সাধারণ বাঙালী ও কিছু অভিজাত বাঙালীর শতাব্দীব্যাপী প্রচেষ্টায়। তৎকালীন ইংরাজদের বিতাড়িত করতে এ দেশের মানুষের পূর্ণ ছুটি শতাব্দী লেগে গেলেও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মাত্র তিনটি দশকেই বাঙলার রাজধানী কলকাতা থেকে বাঙালী আজ প্রায় সম্পূর্ণ নির্বাসিত। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতার যে কোন প্রান্তে দৃষ্টিপাত করলে আজকে বাঙালী চোখে প্রায় পড়েই না। শুধু দিনের বেলায় শহরতলী থেকে আসা কিছু বাঙালী কেরানীকুলের পদার্পণে এই শহরকে পশ্চিমবাংলার ও বাঙালীর শহর বলে মনে হয়। রাজ্যের উন্নয়ণমূলক কাজকর্মের জন্য বরাদ্দ অর্থের সিংহভাগই ব্যয়িত হয় কলকাতা মহানগরীর উন্নতির জন্য। সি. এম. ডি. এ প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এই শহরকে আরও উন্নত করার প্রয়াসে মগ্ন। মেট্রোরেল, চক্ররেল ইত্যাদি কলকাতার কণ্ঠে এখন স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক স্বরূপ। কলকাতা দিনে-দিনে যত বাসযোগ্য হচ্ছে বা এর আশে পাশে যত বাসযোগ্য এলাকা বাড়ছে, দিনে দিনে সুলভ আয়ের তাগিদে ততই ভিনদেশীয় মানুষের আগমন অকল্পনীয় ভাবে বেড়ে চলেছে।

কলকাতার রাস্তাঘাট, অলিগলি সবই এখন অর্থলোলুপ

অবাঙালীর কব্জায়। অন্যান্য শহরগুলিতে যেখানে বাসভূমির আঠার থেকে পঁচিশ শতাংশ রাস্তা এই শহরে বাসযোগ্য স্থানের সাত শতাংশ মাত্র রাস্তা। এই যৎসামান্য রাস্তার প্রায় আশী থেকে পঁচাশী শতাংশ এখন পুলিশ ও কর্পোরেশনের বাবুদের কল্যাণে অলিখিত ভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভোগ করছে অবাঙালী হকার, ব্যবসায়ী ও গাড়ীর মালিকগণ। ফলে কলকাতায় এখন যানবাহনের জটিল জট নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। সামান্য বিশ পঁচিশ মিনিটের রাস্তা এখন পাঁচ ছয় ঘণ্টাতেও পৌঁছান যায় না। এ শহরে ব্যাপক সবুজের মেলা কোনদিন না থাকলেও ছিল গড়ের মাঠ, ছিল কার্জন পার্ক, দেশবন্ধু পার্ক, দেশপ্রিয় পার্ক, পার্ক সার্কাস ময়দান, ইডেন উদ্যান সংলগ্ন গঙ্গার তীর ইত্যাদি মনোরম স্থান, সেগুলিকে কলকাতার ফুসফুস বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিছু কিছু প্রয়োজনের তাগিদে এবং জনসংখ্যার প্রবল চাপে এগুলির সবই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, যেটুকুও অবশিষ্ট আছে সেটুকুও সমাজবিরোধীদের আড্ডা ও আখড়ায় পরিণত। এগুলির সুদৃশ্য রেলিং, চেয়ার, গাছপালা আর নজরে পড়ে না। এসব বিষয়ে পুরসভা বা পুলিশের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও অকর্ম্মণ্যতার রামায়ণ না গাইলেও চলবে। অবাঙালী ব্যবসায়ীকুল, পুলিশ ও পুরকর্ম্মীদের সহায়তায় এই সমস্ত লোহা লক্কড় কাঠ-পাটা বিক্রীবাটা পূর্ব্বক অর্থের অংশ যথাযথ গুণে নিয়েই ক্ষান্ত। বাঙালী ও পশ্চিমবঙ্গের প্রতি তাঁদের যে কোন দায়িত্ব আছে একথা কি কারো মনে হয়?

কলকাতায় বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত ও ঐতিহাসিক ইমারত আজ আর্থিক কৌলিন্যের দৌলতে অবাঙালী ধান্দাবাজদের কবলে। এই সমস্ত ইমারতগুলি আজ অনেক অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ তথা বাঙালীদের বিরুদ্ধগামী কার্য্যাবলীর ক্রীড়াক্ষেত্রে পর্য্যবসিত। ঝুপড়িতে ঝুপড়িতে সারা শহর ছেয়ে দিয়েও এদের শান্তি নেই, এখন খোদ রাইটার্সের দালানগুলিতে এবং আশপাশের জায়গাগুলিতে এরা চুটিয়ে বাণিজ্য করছে। রাইটার্স পর্য্যন্ত হস্ত প্রসারিত করতে

পেরেছে বলে এরা এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলি যথা বড়বাজার, জোড়াসাঁকো ইত্যাদি এলাকার বাঙালী ব্যবসায়ীদের উপর বিভিন্ন ধরণের অত্যাচার করে তাদের হঠিয়ে ব্যবসাস্থলগুলিকে নিজেদের কব্জায় আনার চেষ্টায় মগ্ন। এদের ক্রিয়াকলাপের কথা থানায় বলতে গেলে বা ডাইরী করাতে গেলে ফল হয় বিপরীত, কারণ অবাঙালী কনেস্টবল বাবুরা ও স্পেশাল বাবুরা ডায়েরি দাতার নামটি সর্বাগ্রে ঐ সমস্ত গুণ্ডা শ্রেণীর লোকের কাছে পাঠিয়ে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করেন। ফলে বাঙালীদের প্রাণ যাবার আশঙ্কা থেকে যায়। এ বিষয়ে বাঙালী এস. আই., সার্জেন্ট, বা ও. সি. বাবুরা ঠুঁটো জগন্নাথ, কারণ তাঁদের উপরি রোজগারের অনেকটাই আসে ঐ সমস্ত নিম্নতন অবাঙালী কনেস্টবলদের মাধ্যমে।

কলকাতা পুর এলাকায় এখন প্রায় দশ হাজার বেআইনী বাড়ি তৈরিতেও এই সম্প্রদায় মত্ত রয়েছে, কারণ পুরসভার বাবুদের ও থানাদারদের যথাযথ পুজা দিয়ে কোনও রকমে একটা ছয়তলা কি সাততলা তুলে দিতে পারলেই সেলামিতে কোটিপতি। এছাড়াও এদের আছে শহর অপরিষ্কার করার প্রবণতা। লক্ষ লক্ষ অবাঙালী ফুটপাথবাসী যত্রতত্র মল-মূত্র ত্যাগপূর্ব্বক এই শহরকে অস্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত করে তুলেছে। চারিদিকে সবকিছু দেখে শুনে মনে হয় তাহলে কলকাতা শহর তথা পশ্চিমবঙ্গটা কি বাঙালীদের নয়? বাঙালী ছাড়া আর সবার?

বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী এই কটি শহরের প্রত্যেকটিতে যে পরিমাণ বাঙালী বাস করে এ শহরে কি সেই পরিমাণ অবাঙালী আছে, না, তারও কয়েক হাজার গুণ বেশী? ওই সব শহরের, অর্থাৎ পাটনা, রাঁচী ইত্যাদি শহরের বাঙালীরা যা খুশী করতে পারে? তারা যা খুশী করতে চাইলে ঐ সব শহরের পুলিশ বা পুর প্রশাসন কি তাদের যা খুশী করতে দেয়? তা যদি করতে না পায় তবে ওরাই বা এখানে এরকম অসভ্যতা করবে কেন? আর প্রশাসনই বা এদের এই অসভ্যতাকে প্রশ্রয় দিয়ে এদের হাত পা লম্বা করবে কেন?

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি এতদিন ধরে বাঙালী শ্রমবিমুখ এই কথা রটনা করে আখেরে লাভ করেছে কারা? বাঙালী ব্যবসা করতে জানে না এ কথাই বা কাদের রটনা? শতকরা নব্বই ভাগ ব্যবসা দু-নম্বরে (বিক্রয় কর বহির্ভূত) করাই কি ব্যবসা? এই দু-নম্বর ব্যবসা করতে বাঙালী ঝুঁকি নিতে চায় না আত্মসম্মান বা পারিবারিক মর্য্যাদার ভয়ে আর তাই বলে রটিয়ে দিতে হবে বাঙালী ব্যবসা করতে জানে না এবং সেই সুযোগে সব ব্যবসা করায়ত্ত করতে হবে, আর সেই করায়ত্ত করণে দশকের পর দশক সহায়তা করবে কিছু বাঙালী কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার ও ইন্সপেক্টর? সুন্দর ব্যবস্থা, চমৎকার উপায়। মাতৃভূমির প্রতি, নিজের জাতির প্রতি, যাদের নাড়ির টান নেই তারা কলকাতা থেকে দূরে হঠবে না তো কারা হঠবে? আর সেইজন্যই বাঙালী আজ ক্রমাগতভাবে গৃহছাড়া, বাস্তুহারা।

এইভাবে চতুর্দ্দিকের অসম্মানে নিষ্পিষ্ট হয়ে বেঁচে থাকার নাম মনুষ্যত্ব নয়, বাঙালীত্বও নয়। বিভিন্ন দলের পতাকা হাতে নিয়ে জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করাটাও মনুষ্যত্ব নয়, বাঙালীত্ব নয়। মনে হয় ঝগড়া ছেড়ে, ক্ষুদ্র দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী বিসর্জন দিয়ে, আজকে সমগ্র যুবসমাজ এবং তাদের পরিচালক নেতৃসমাজ চিন্তা করলে ভাল হয় যে কলকাতা কি পশ্চিমবাংলারই কোন শহর? না, কি অন্য প্রদেশের শহর?

আমার মনে হয় নেতৃকুল যদি এদিকে দৃষ্টি দেন, শুধুমাত্র কলকাতা শহরই পারে ত্রিশ লক্ষ বেকার বাঙালী যুবকের কর্ম্মসংস্থান করতে। সুতরাং আত্মসন্তুষ্টিতে ভরপুর নেতৃকুল, পুলিশ প্রশাসন, পুর অফিসারগণ ইচ্ছামৃত্যু বরণ করে না নিয়ে অনুগ্রহ করে এদিকে দৃষ্টি দিন এবং আমার মত আপনাদের প্রতি হতশ্রদ্ধ, বিক্ষুব্ধ প্রতিটি শান্তিপ্রিয় সাধারণ বাঙালীকে বুঝতে দিন যে, কলকাতা আমাদের অর্থাৎ বাঙালীদের। সাধারণ মানুষের অন্তরের বিক্ষোভ জমে জমে হয়তো একদিন প্রাদেশিকতার ভূত মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। সুতরাং

সতর্ক হওয়াই ভাল বলে মনে হয়। নেতৃকুল, পুলিশ ও পুর প্রশাসন কি বলেন ?

কলকাতা শহর পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙালীর প্রাণকেন্দ্র বলে এতক্ষণ কলকাতা সম্বন্ধে বললাম কিন্তু আমার এতক্ষণকার বক্তব্য পশ্চিম-বঙ্গের অন্যান্য ছোটখাট শহর—যথা, বর্দ্ধমান, রানীগঞ্জ, আসানসোল, দুর্গাপুর প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেকটি শহরের পক্ষেই প্রযোজ্য। কারণ চোখের সম্মুখে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন শহরের পরিবেশই সুস্থ পরিবেশ নয়, রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন নয়, কোন রাস্তা দিয়েই মানুষ সিধে হয়ে সচ্ছন্দ ভঙ্গীতে হাঁটতে পারে না। মহিলারা যত্রতত্র কটূক্তির শিকার, অসভ্যতার ও ইতরামির শিকার। অথচ কয়েকটা বছর আগেও ঠিক এই পরিবেশ ছিল না। কোন শহরের নর্দ্দমা যথাযথভাবে পরিষ্কার হয় না। বিদ্যুৎ সরবরাহ অবিচ্ছিন্নভাবে চলে না। হাসপাতাল, হেল্থ সেণ্টারগুলিতে মানুষ প্রয়োজনীয় সহায়তা পায় না। খোলামেলা জায়গার অভাবে শিশুরা খেলতে পায় না অথচ বিভিন্ন ময়দানগুলি দখল করে সামান্য কিছু স্থানীয় ব্যক্তির অর্থগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য বৎসরের প্রায় অধিকাংশ সময় নানারকম বাণিজ্যমেলা অনুষ্ঠিত হয় যেগুলি না হলেও সাধারণ মানুষের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না।

স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে, গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র শুধু রাজনীতির লড়াই, মারপ্যাঁচের লড়াই, একদল আর একদলকে জব্দ করতে তৎপর, সব দলই একে অপরকে পেশী প্রদর্শন করে চলেছে কিন্তু কেউই ঠাণ্ডা মাথায় একবারও চিন্তা করছেন না যে অন্য দলের মানুষগুলিও এই দেশেরই, লণ্ডন বা নিউইয়র্ক থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা মনুষ্য-সমষ্টি নয়। এই অসম রাজনীতির লড়াই এবং মারামারির তথা আত্মঘাতী সর্ব্বনাশের সুযোগগুলির পুরোমাত্রায় সদ্ব্যবহার করে চলেছে বহিঃর্দেশীয় এবং বহিঃপ্রর্দেশীয় অনুপ্রবেশকারী সুযোগ সন্ধানীর দল, যাদের মধ্যে মানবিকতাবোধ, সততা এবং সুস্থ রুচিজ্ঞানের পরিচয় অদ্যাবধি প্রায় অমিল। পশ্চিমবাংলার ছেলে

পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে পড়তে গেলে ঐ প্রদেশে বসবাসকারী না হলে কোন স্কুল কলেজে ঠাঁই পায় না। চাকরীর জন্য ইণ্টারভিউ দিতে গেলে গলাগলি না করে গালাগালি দিতে দিতে ইণ্টারভিউ কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয়, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী ঠিকাদার সংস্থা বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে কোন কাজ ধরতে গেলে তাদের ছোরার ডগায় কিংবা রিভলবার দেখিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, অথচ এখানে ? আমরা সব প্রদেশের লোককে গুরুঠাকুর করে মাথার উপর রেখেছি এবং তাদের হাতে ক্রমাগতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য, জমি-জায়গা, বাড়ী-ঘর একের পর এক তুলে দিচ্ছি। অথচ ইচ্ছা করলেই সরকার জমি-জায়গা বাড়িঘর ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত আইনের সামান্য পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন ঘটিয়ে বহু অবাঞ্ছিত হস্তান্তর রোধ করতে পারেন।

দার্জিলিং নেপালী-অধ্যুষিত এলাকা বলে নেপালীরা 'গোর্খাল্যাণ্ড চাই' বলছে, কলকাতা আসানসোল রানীগঞ্জ প্রভৃতি শহরগুলিতে বাঙালীর চেয়ে অবাঙালী জনসংখ্যা বেশী বলে আগামী কোনও দিন যদি কেউ দাবী তোলে যে 'বিহারীস্থান' চাই তো অবাক হব না কারণ আমার মত সাধারণ একজন নাগরিক শুধু ভেবেই আকুল হতে পারে, নেতৃত্বের অভাবে বা সংগঠনের অভাবে এসবের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে প্রতিকারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না। প্রশাসন যাঁদের হাতে তাঁরা সচেতন না হলে বড় মুস্কিল, ভবিষ্যৎ ঘনঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। পশ্চিমবঙ্গে এখন সবাই 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' নীতিতে চলছে। ভাল ব্লেডে দাড়ি কামিয়ে ঘাড়ে গলায় একটু পাউডার দিয়ে চকচকে পোষাক পরিচ্ছদে অঙ্গ ঢেকে 'যেন তেন প্রকারেণ' কিছু পয়সা রোজগার করে সব রকমের অপমান, সর্বপ্রকার অবমাননা বা হেনস্থার সঙ্গে আপোষ করে ক্লীবের মত কোন রকমে চলমান সময়টা কাটিয়ে দিতে পারলেই খুশী। কি নারী কি পুরুষ সকলের ভাবখানা এই, 'আমার জীবনটা কেটে গেলেই হল, কি দরকার ফালতু ঝঞ্ঝাটে যাওয়ার ?' কিন্তু একটিবারও কেউ নিজেদের সন্তানসন্ততিদের কথা

অর্থাৎ ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা ভাবছে না। ভাবছে না যে বড় হয়ে এরা কোথায় পা রাখবে, কি করে স্কুল-কলেজে ভর্ত্তি হবে, কিভাবে ট্রেনে বাসে যাতায়াত করবে, কি উপায়ে সুচিকিৎসার সুযোগ পাবে। তাহলে এটাই কি ধরে নিতে হবে যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কিছু ভাল জিনিষ রেখে যাওয়ার, কিছু সুষ্ঠু ব্যবস্থার মুখোমুখি তাদের দাঁড় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই? শুধুমাত্র জৈবিক লালসায় মত্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ শিশুর জন্ম দেওয়াই কি পুরুষের ধর্ম্ম? তাদের প্রতি কর্ত্তব্য বলতে কি কিছুই নাই? যে ভাবে চলছে, ঠিক এইভাবে চললে অনিবার্য্য ধ্বংসের হাতে সমর্পিত হয়ে ভবিষ্যৎ বাঙালী প্রজন্মকে আর একবার উদ্বাস্তু হতে হবে এবং তার আর খুব বেশী দেরী নাই, বড় জোর বিশ কি ত্রিশ বছর।

স্পর্দ্ধাহীন এ স্বজাতি চাইনি কখনো
শব্দহীন কণ্ঠ, বোধহীন মানুষের মত শরীর
সব, কলের পুতুলের মত ঘোরে ফেরে
খায় দায় ও আরও কিছু অপোগণ্ড
উপহার দিয়ে সরে পড়ে। এ-হেন ঘোর
কালবেলা চলেনি এ সমাজে কখনো;
দিবারাত্র শুধু গলি ঘুঁজি খোঁজে স্বপ্নের
সার্থকতার জন্য সামাজিক সভ্যগণ সব।
অন্য দিকে কুটিল ষড়যন্ত্রীর দল করাল
কঠিন দাঁতে ছিঁড়ে খায় সব শস্য, সব ফলমূল।
জনতার মাঝখানে লাগিয়ে আগুন, তারা
নিজেদের মুখ দেখে হেসে কুটি-কুটি হয়;
গ্লানিহীন মন নিয়ে নিরাপদে রয় শত
স্নিগ্ধ-সুখ-সনে, বঞ্চনা শব্দের অর্থ যাদের অজানা।
নিজেদের সুখ শান্তি পশুরাও বোঝে,
জঙ্গলেতে উচ্ছিষ্টকে ঘৃণাভরে ফেলে যায়
হরিণ-শাবক, আর তোরা? সেই উচ্ছিষ্টের

জন্য হাত পেতে পেতে সারা, হায় রে স্বজাতি
স্বধর্ম্ম মুখোশে ঢাকা নির্লজ্জ সমাজ !'

পড়া শেষ করে কাগজটা সুমিতার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে অভিরূপ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'এতে যা লেখা আছে তার প্রত্যেকটি বর্ণই সত্যি,······দ্যাখ কেউ যদি আত্মহত্যা করবই বলে মনে মনে শপথ নেয় তো রাত্রে দিনে, আলোয়-অন্ধকারে, ভীড়ে-নির্জনে যখন যেখানে হোক, ট্যাবলেট খেয়েই হোক, গলায় দড়ি দিয়েই হোক, পুকুরের জলে ডুবেই হোক অথবা রেলে মাথা দিয়েই হোক সে মরবেই, যতই চোখে চোখে রাখা হোক, পাহারা দিয়ে রাখা হোক, তাকে কেউ আটকাতে পারবে না। আমাদের এই বাঙালী জাতটার এখন সেই অবস্থা। গোটা বাঙালী জাতটা গলায় সিসাল-রোপ জড়িয়ে ঘুরছে। যত এদিক ওদিক করছে এই রোপের বাঁধন তাদের গলায় তত শক্ত হচ্ছে এবং দম আটকে আসছে; এই দম আটকাতে আটকাতে একদিন শেষ হয়ে যাবে এবং সেদিন আর খুব বেশী দূরে নেই।' কথাগুলো বলে অভিরূপ মিনিটখানেক থেমে আবার বলল, 'আর একটিও কথা নয় আমরা গ্রামে ঢুকে গেছি।' আরও দু-চার মিনিট হেঁটে সুমিতার বাড়ির কাছে তার ব্যাগটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে অভিরূপ এসে নিজের বাড়িতে ঢুকল।

অনেকদিন পরে ছেলে আসাতে মুরারিবাবু ও শ্রীলেখা দেবীর মুখ আনন্দে চকচক করে উঠল। অভিরূপ কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে মাকে প্রণাম করবার জন্য যেই নীচু হয়েছে অমনি উঠোনের দু-পাশে ঝপাং ঝপাং করে দুটো শব্দ হতেই প্রণাম সেরে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, বীর আর বেঁটে এসে বেড়ার উপর বসেছে। তাড়াতাড়ি বাবাকে প্রণাম করে অভিরূপ বেড়ার কাছে গিয়ে দু-হাতে বেঁটে আর বীরকে কাছে টেনে নিয়ে তাদের মাথায় পিঠে হাত বুলোতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ আদর পেয়ে পাখী দুটো উড়ে গিয়ে আবার তালগাছে বসল।

তাদের এই ব্যবহার দেখে অভিরূপ ভাবল আজকাল মানুষের থেকে শকুনের ব্যবহারই বোধ হয় ভাল হয়ে উঠেছে। গোটা গ্রামটায় হেঁটে আসতে-আসতে চেনাজানা অনেক লোকের মুখোমুখি হ'ল কিন্তু কেউ একবার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অভিরূপ ও সুমিতাকে কোন কুশল প্রশ্নই করল না ; তারা নিজেরা গায়ে পড়ে কথা বলতে দু-একজন অনান্তরিকভাবে যা হোক একটা জবাব দিয়ে এড়িয়ে গেল। অনেকদিনের পুরোন স্কুল জীবনের বন্ধু রাখালদাসকে, 'কেমন আছ ?' জিজ্ঞাসা করতে সে তো বলেই ফেলল, 'আমরা আর কেমন থাকব বল, আমরা কি আর কলকেতার সায়েব হয়ে গেছি, যে, আনন্দে থাকব ? আমরা তো যে চাষা সেই চাষাই রয়ে গেলাম।' এ রকম জবাবের অর্থ অভিরূপকে কিছুটা খোঁচা দেওয়া অথচ অভিরূপ এখনও ধুতি শার্টই পরে এবং নিতান্ত সাধারণ পোশাকেই গ্রামে ঢুকেছিল। শকুনগুলো তালগাছে গিয়ে বসবার পরেও অভিরূপ গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ওদের ব্যবহার, অর্থাৎ বাড়িতে আসার সঙ্গে-সঙ্গে আকাশ থেকে নেমে এসে অভিরূপকে দেখা দেওয়া এবং তার আদর পেতে চাওয়ার মূক আবেদনের ব্যাপারটা থেকে বুঝে ফেলে আজকাল মানুষের থেকে বন্যপ্রাণীরা সম্ভবতঃ মানুষের প্রতি বেশী কৃতজ্ঞ, বেশী প্রত্যয়ী। অভিরূপ মনে মনে বেঁটে ও বীরের উদ্দেশে বলে, সাবাস ! এ জন্মে যদি নাও পারি, পর জন্মে যেন তোদের মত হাজার-হাজার শকুন বন্ধু নিয়ে এই পোড়া গ্রাম্যসমাজের কিছুটা পরিবর্তন করে দিয়ে যেতে পারি।

অভিরূপ এসেছে শুনে মাস্টারমশাই বিকেলবেলায় মুরারিবাবুর বাড়ি এসে দাওয়ায় পাতা মাদুরে বসতে না বসতে সুমিতার বাবা ভৈরববাবুও এসে সেখানে হাজির হলেন। অভিরূপ তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে মাকে চার কাপ চা করতে বলল। অভিরূপ চায়ের কাপগুলো এনে যখন হাতে-হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে এমন সময় সুমিতা ও অনুরূপ এসে বাড়ির দরজায় দাঁড়াতেই মুরারিবাবু ও ফণীবাবু দু'জনে

প্রায় একই সঙ্গে তাদের ডেকে উঠলেন। সকলের সহর্ষ অনুমতি পেয়ে সুমিতা সেখানে গিয়ে বসল আর অনুরূপ অভিরূপের পড়ার ঘরে গিয়ে তার বইগুলো নিয়ে রসায়ণের যন্ত্রপাতির ছবি দেখতে-দেখতে, বইয়ের পাতাগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে আপন মনে মন্তব্য করতে লাগল, 'বাব্বাঃ, কত মোটা-মোটা বই, সব আবার ইংরাজীতে লেখা, অভিরূপদা কি করে পড়ে কে জানে।'

অনুরূপ যখন বই নাড়াচাড়া করছে তখন এদিকে বাইরে দাওয়ায় ফণীবাবু ভৈরববাবু, মুরারিবাবু, অভিরূপ, সুমিতা সকলে খোশগল্পে মেতেছেন। প্রথমদিকে কলকাতার পথঘাট, মানুষের চলাফেরা, আদব-কায়দা, বিদ্যুৎবিভ্রাট, হাসপাতাল, ওষুধ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করতে-করতে প্রসঙ্গ পরিবর্তিত হয়ে যখন গ্রামের ব্যাপারগুলোয় আসতে লাগল তখন তিন পরিণত-প্রাণ মানুষের মুখ থেকে গত কয়েক মাস ধরে যাবতীয় অত্যাচারের এবং সব শেষে বয়কটের কাহিনী শুনে অভিরূপ ও সুমিতা উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং মুরারিবাবু, ভৈরববাবু ও মাস্টারমশায়কে বলল, 'কই এ সমস্ত কথা তো আপনারা এতদিন চিঠিতে আমাদের জানান নি!' মাস্টারমশায় শান্তকণ্ঠে বললেন. 'জানালে কি লাভ হত বাবা? তোদের পড়াশুনাটা মাটি হত; এখানে আমাদের তো যা হবার হচ্ছেই, ওদিকে তোদের পড়াশুনাটা মাটি হলে যে, আমাদের সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি হবে অভিরূপ! তাই তোদের কিছু জানাতে আমিই নিষেধ করেছিলাম মুরারিবাবু আর ভৈরববাবুকে।' 'বয়কট করলে যে সমস্ত সংসারগুলো নষ্ট হয়ে যাবে মাস্টারমশায়। ওদের সঙ্গে কালই আমি বোঝাপড়া করব, দরকার হলে লাঠি ধরব, টাঙ্গী বের করব, ওরা ভেবেছেটা কি? এ কি মগের মুলুক নাকি?' অভিরূপের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে মাস্টারমশায় ও ভৈরববাবু মৃদু-মৃদু হেসে ওঠেন এবং মাস্টারমশায় বলতে থাকেন, 'তোমার বীর আর বেঁটের জ্বালায় ওদের এই তিন বাড়িকে বয়কট করবার চেষ্টা বানচাল হয়ে গেছে। একদিন অনুরূপকে স্কুলে যেতে বাধা দিয়ে তার হাত থেকে বইখাতা কেড়ে ফেলে দিয়েছিল মধু, সঙ্গে

সঙ্গে তোমার বেঁটে এসে মধুর ডান কানটা ছোঁ মেরে ছিঁড়ে নিয়ে গিয়ে ওদের পাণ্ডা, দুলোর বাড়ির উঠোনে ফেলে দিয়ে এসেছে। তারপর থেকে আর আমাদের এই তিন বাড়ির কাউকে কোন কাজে কেউ বাধা দেয় নি বরং আমাদের দেখলেই দূর দিয়ে সব সরে যাচ্ছে, কিচ্ছুটি বলছে না। জমিজায়গাগুলো জোর করে চষে দিয়েছে, কিছু কিছু জমি বাউরীদের দিয়ে বর্গা লিখিয়েছে, কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি দেখিস ধান আমরাই কাটব, ধান যদি ওরা তুলতে না পারে তবে ওদের লোকসান হবে আর পরের বছর চাষ করতে সাহস করবে না।'

তাদের তিন বাড়ির ক্ষেত্রে 'বয়কট' জুলুমটা ফলপ্রসূ হয় নি জেনে অভিরূপ কিছুটা আশ্বস্ত হলেও উদ্বেগের সঙ্গে বলল, 'পৌষ মাসে ধান কাটার সময় আগে থেকে আমায় খবর দেবেন, আমি এসে দাঁড়িয়ে থেকে ধান কাটাবো, দেখব অন্য কে আমাদের জমির ধান কাটতে আসে।' অভিরূপের উদ্বেগের কথায় মাস্টারমশায় ও মুরারিবাবু বললেন—'আমরা আগে থেকেই সব ঘটনা ডি. এম. সাহেবকে জানিয়ে রেখেছি, তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ধান কাটার সময় শান্তি রক্ষা করবেন বলে আমাদের কথা দিয়েছেন।' 'কিন্তু ততদিন পর্যন্ত এই ডি. এম. এই ডিস্ট্রিক্টে থাকতে পাবেন তো? তার আগেই ওঁর বদলীর হুকুম না হয়। বার বার উপরওয়ালারা ওদের পরিকল্পনা নিশ্চয়ই ভেস্তে যেতে দেবে না। এর আগে কাটোয়ার ও. সি. মিস্টার মজুমদারকে খুনের মামলা হতে খালাস করিয়ে দেবার পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই ভেস্তে গেছে, তাই এবার মনে হয় ওরা আট-ঘাট বেঁধেই লাগবে।'

অভিরূপের এই মন্তব্যে মাস্টারমশায়, ভৈরববাবু এবং মুরারিবাবু নিজেদের মধ্যে একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। সুমিতা তার এতক্ষণকার নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, 'অভিরূপদা ঠিক বলেছে, এবার নিজেদের জিদ বজায় রাখার জন্য উপরওয়ালারা আগে থাকতেই এই ডি. এম.-কে সরিয়ে দেবেন, কারণ এবার যদি ওদের

চাষ করা ফসল আমরা ঘরে তুলতে সফল হই তাহলে ওদের উদ্দীপনায় আঘাত লাগবে, তাতে ওদের উপর লোকের আস্থা কমে যাবে, তাই ফসল ওরা কিছুতেই আমাদের কাটতে দেবে না।'

সুমিতার কথাতেও অভিরূপেরই কথার সুর ধ্বনিত হচ্ছে শুনে কিঞ্চিৎ নীরব থেকে ফণীবাবু বললেন, 'তাহলে উপায়?' 'উপায় যা হোক একটা কিছু হয়ে যাবে, সেজন্য আপনারা চিন্তা করবেন না, আপনারা শুধু সময় থাকতে আমাদের খবরটা দেবেন,' বলে সুমিতা পুনরায় শুরু করল, 'জানেন মাস্টারমশায়, এই ক'মাস কলকাতায় থেকে আশপাশের লোকের মুখে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপার স্যাপার দেখে আমার একটা স্পষ্ট ধারণা হয়েছে যে, বাঙালীর ছেলেরা এখন যা কিছু করছে সবই সাময়িক জিদের বশে, আর এই জিদ বজায় রাখতে গিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহু অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হচ্ছে ; জনসাধারণের অধিকাংশের কি হ'ল না হ'ল বা দেশটার কি হল না হল এসব পূর্বাপর চিন্তা করবার মত তাদের সময় নেই বা ধৈর্যও নেই।'

সুমিতার কথা শেষ হওয়ার পর ফণীবাবু ও মুরারিবাবু প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ মা, সমস্ত প্রশাসন ব্যবস্থাটাই যেন দিন-দিন প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। ছোট থেকে বড় পর্যন্ত কেউ কাউকে পরোয়া করছে না, কি গ্রামে, কি শহরে, একেবারে 'ডোণ্ট্ কেয়ার' ভাব। তার উপর আবার এসেছে সর্বনাশা নেশার বাড়াবাড়ি, যত্রতত্র নেশার বস্তু পাওয়া যাচ্ছে হাতের কাছে। একাধারে যার-তার যা খুশী তাই করার অধিকার, তার উপর নেশা, সুতরাং এ সময়টা যেন যুব সমাজের নিকট স্বর্গসুখের সময়। তারা ভুলেও ভাবছে না যে, আইন সঙ্গতভাবে ন্যায়তঃ প্রাপ্য তাদের কর্মের অধিকার হাতে তুলে দিতে পারছে না বলেই উপরওয়ালারা ভুলপথে পরিচালিত করে তাদের ক্রমে নরকের দিকেই ঠেলে দিচ্ছে।' মাস্টারমশায়ের কথায় ভৈরববাবু বলে উঠলেন, 'এদের কাছে আবার স্বর্গ-নরক!'

'না, না, সে স্বর্গ-নরকের কথা মাস্টারমশায় বলেন নি বাবা, উনি বলছেন একদল মানুষের চোখে ঘৃণ্য হয়ে থাকাটাও তো নরকেরই সামিল, এই যে দুলো-দীনে, মধু এই রকম কত ছেলে নষ্ট হতে-হতে আজ সকলকার কাছে ঘৃণ্য ও পরিত্যজ্য হয়ে উঠছে এবং সুস্থভাবে সমাজে তোমার-আমার কাছে 'কাকাবাবু' কি 'দিদি' বলে সামনে এসে দাঁড়াতে পারছে না, এটাই তো ওদের কাছে নরক যন্ত্রণার সমান, এর জন্য কি ভাবছ ওরা দুঃখ পাচ্ছে না! নিশ্চয় দুঃখ পাচ্ছে, নিশ্চয়ই মাঝে-মাঝে ওদের অনুতাপ হচ্ছে, তবু ওরা ফিরতে পারছে না, তার কারণ ঐ যে, আগেই বলেছি জিদ! নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তারের জিদ বজায় রাখতে গিয়েই ওরা গভীর থেকে গভীরতম খাদে নিমজ্জিত হচ্ছে।' সুমিতার মুখের কথা কেড়ে নিয়েই অভিরূপ ভৈরববাবুর উদ্দেশে বলতে শুরু করল 'হ্যাঁ কাকাবাবু, ওরা ভুলেও বুঝতে পারছে না যে, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই উপরওয়ালারা ওদের আর চিনতে পারবে না অর্থাৎ ইচ্ছা করেই চিনবে না।' মিনিট খানেক নীরব থেকে অভিরূপ কম্প্রকণ্ঠে বলতে থাকে, 'অথচ ছোটবেলায় দেখেছি ওরা তো কেউই এ রকম ছিল না, একসঙ্গে কত হা-ডু-ডু খেলেছি, ফুটবল খেলেছি, পূজোয় ঠাকুর এনেছি, আবার বিসর্জন দিয়ে এসেছি আর আজ……, নাঃ আর ভাবতে পারছি না।'

'সব হবে ওরে সব হবে, অন্ততঃ আমাদের এই গ্রাম কুরচিকে আমরা আবার সেই শান্তির আবাস করে তুলব, আগে তোরা দু'জনে লেখাপড়াটা শেষ করে আয় দেখি, হ্যাঁ আই. এ. এস. আই. পি. এস. বলে ফণীবাবু অভিরূপের পিঠে হাতটা রাখলেন। আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার শেষে সকলে বিদায় নিলেন।

পরদিন ষষ্ঠী। বইপত্র নিয়েই ঘরের মধ্যে দিন কেটে গেল অভিরূপের। সন্ধ্যেবেলায় একবার বাড়ি থেকে বের হয়ে সে

বারোয়ারীতলায় গিয়ে মায়ের বোধন দেখে এল। ফেরার সময় সুমিতাদের বাড়ির দরজা থেকে সুমিতা জোর করে হাত ধরে তাকে বাড়ির মধ্যে টেনে নিয়ে গেল এবং তার বাবার ঘরে একটা কাঠের টুলের উপর একটি হাতে কাজ-করা আসন পেতে বসতে দিল। অভিরূপকে বসিয়েই সে বাইরে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে চট্‌পট চা তৈরী করে প্লেটে ছু-খানা করে বিস্কুট নিয়ে ছু-পেয়ালা চা সমেত পুনরায় ঘরে ঢুকল। এত তাড়াতাড়ি চা নিয়ে তাকে ঢুকতে দেখে হাসতে-হাসতে অভিরূপ বলল, 'এত তাড়াতাড়ি চা তৈরি করল কে? তুই, না, কাকিমা?' জবাব না দিয়ে সুমিতা চা-টা অভিরূপের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'আগে তো খাও, তারপর বল কার তৈরি হতে পারে। দেখি তোমার আন্দাজটা কি রকম!' অভিরূপ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলল, 'হুঁ, কলকাতা-কলকাতা, বেহালা-বেহালা গন্ধ চায়ে……।' 'যাঃ ছুষ্টু কোথাকার,' বলে সুমিতা প্রশ্ন করল, 'সত্যি বল না, চা-টা ভাল হয়েছে?' উত্তরে অভিরূপ বলল, 'চা ভালই হয়েছে কিন্তু আজ একটা নতুন জিনিস দেখছি, তুই হঠাৎ চা ধরলি কবে থেকে? গতকাল সন্ধ্যায় চা খাস না বলে আমি তো তোকে চা দিই নি, কিন্তু আজ বুঝছি সেটা আমার অভদ্রতা হয়ে গেছে।' 'বাঃ রে তোমার কি দোষ? আমি তো সত্যিই চা খেতাম না, কিন্তু মামীমা বেহালার বাসায় রোজ সকালে চা দিয়ে-দিয়ে আমার নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন, এখন দিনে অন্ততঃ ছু-তিন কাপ না হলে চলে না।' সুমিতা থামতেই অভিরূপ, 'তাই নাকি? তবে তো তুই পুরোপুরি চা খোর হয়ে উঠেছিস!' বলে চোখ বড়-বড় করে এমনভাবে সুমিতার দিকে তাকাল যে, সুমিতা নাতি-উচ্চ কণ্ঠে ঝিরঝির করে হেসে ফেলল। অভিরূপও তার হাসিতে যোগ দিল।

ঘরের মধ্যে অভিরূপের গলার আওয়াজ পেয়ে কাকিমা বেলাদেবী ততক্ষণে, 'কে বাবা? অভিরূপ? কখন এলে বাবা?' বলতে-বলতে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। এইমাত্র তিনি বোধন দেখে ফিরলেন। অভিরূপ উঠে এসে কাকিমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই বেলাদেবী

বললেন, 'একটু বস বাবা, আমি এই পাটের শাড়ীটা বদলে আসি, আহা সোনা আমার, গাঁ আলো করা ছেলে,' বলতে-বলতে সুমিতার মা শাড়ী বদলাবার জন্য পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। দরজা বন্ধ করার আওয়াজ কানে যেতেই সুমিতা অভিরূপের সামনে এসে মুখের কাছে মুখটা নিয়ে দু-ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সরু করে জিভটা বের করে তাকে ভ্যাঙ্গাতে শুরু করল, 'আহা সোনা আমার, আহা গাঁ আলো করা ছেলেটি আমার, আহা রূপো আমার, দেশ আলো করা মোমবাতি আমার……' তার এই ভ্যাঙ্গানো দেখে অভিরূপ সঙ্গে-সঙ্গে, 'কাকিমা কাকিমা' বলে ডাক শুরু করতেই ভয়ে বিবর্ণ হয়ে কানদুটো ধরে সুমিতা একেবারে অভিরূপের পায়ের কাছে পড়ল, 'দোহাই অভিরূপদা, আর কক্ষনো বলব না, দোহাই তোমার, মাকে যেন বলো না প্লীজ, তোমার দুটি পায়ে পড়ি', বলে অভিরূপের পা দুটো জড়িয়ে ধরল।

তার এই ভয় দেখে অভিরূপ অবাক হয়ে গেল, একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া মেয়ে তার মাকে এখনও এত ভয় করে দেখে তার ভালই লাগল, কারণ সুমিতা তারই মনের দোসর, তারই কল্পনার পারিজাত। সুমিতার দু'বাহু ধরে তাকে পায়ের তলা থেকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে দু-চোখ ভরে একবার দেখে নিল এবং বলল, 'হ্যাঁরে পাগলী, কাকিমা কাকিমা বলে ডাক দেওয়াতেই এত ভয়, আর বলে দিলে কি করতিস?' সুমিতার উচ্ছ্বাসটা ভয়ে ততক্ষণে অনেকখানি থিতিয়ে এসেছিল। শান্তকণ্ঠে সে জবাব দিল, 'বলে দেবার আগে মুখ চেপে ধরতাম, বলতেই দিতাম না।' 'মুখ চেপে ধরতিস কি দিয়ে?' বলে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে অভিরূপ সুমিতার চোখের দিকে চেয়ে থাকে। অভিরূপ এ কথার মাধ্যমে কি বলতে চায় বুঝে সুমিতা মৃদু ধমকের সঙ্গে, 'যাও তুমি ভারী দুষ্টু হয়েছ', বলে অভিরূপের চোখের থেকে চোখ নামিয়ে নিল।

ওদিকে পাশের ঘরের দরজা খুলে কাকিমা বের হয়ে এসে

অভিরূপকে জিজ্ঞাসা করলেন 'তুমি ডাকছিলে বাবা?' মুহূর্তে অভিরূপ বুঝল কাকিমার কানে তার ডাক পৌঁছে গেছে, সুতরাং ব্যাপারটা ঘোরাবার জন্য বলল 'হ্যাঁ কাকিমা, দেখুন না কখন থেকে সুমিতাকে বলছি চাট্টিখানি মুড়ি দিতে কিন্তু ও দিচ্ছে না।' 'আমি দিচ্ছি বাবা, তুমি একটু বোস, আমি এক্ষুনি মুড়ি এনে দিচ্ছি? বলতে বলতে তিনি রান্নাঘরের পাশের ভাঁড়ার ঘরের দিকে চলে গেলেন। গমন পথের দিকে তাকিয়ে তিনি একটু দূরে যেতেই সুমিতা চকিত হাসিতে মুখ ভরিয়ে অভিরূপকে বলে উঠল, 'অভিরূপদা, তুমি কি পাজী, আমাকে বাঁচাবার জন্য দারুণ ম্যানেজ দিলে তো?' 'এই তো শুরু, এখনও কত ম্যানেজ যে দিতে হবে জীবনে কে জানে? ম্যানেজ দিতে দিতে শেষে আবার ম্যানেজার না হয়ে পড়ি, সেই ভয়', বলে অভিরূপ থামতেই সুমিতা উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বলল, 'বাঃ কলকাতায় গিয়ে এই ক'মাসে বেশ উন্নতি হয়েছে, কথাবার্তার ভোলই পাল্টে গেছে দেখছি, ও মশায় কি ব্যাপার? আহা রে, কোথায় গেল আমাদের পাড়ার সেই ক্লাশের ফার্স্ট বয়, অভিরূপ ঘোষ! সাত চড়ে যার মুখ থেকে রা বেরুত না, সত্য বই যে মিথ্যা বলত না।' 'আবার ফাজলামী হচ্ছে? এবার কিন্তু সত্যিই কাকিমাকে বলে দেব, বলে অভিরূপ আবার সুমিতাকে ভয় দেখাতেই সে ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, 'দাও গে বলে, আমার বয়েই গেছে।' 'ওঃ ভারী সাহস হয়েছে দেখছি। এইমাত্র না ভয়ে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছিলি!' অভিরূপের কথা শেষ হতেই সুমিতা বলল, 'কেন পড়েছিলাম সেটা বোঝবার ক্ষমতা থাকলে কি হাত ধরে টেনে উঠিয়ে দূরে ঠেলে দিতে?' সুমিতার এ কথায় অভিরূপের তরুণ হৃদয়ে বিদ্যুৎ চমকের মত একটা ভাবনা ধরা দিল। সুমিতা যে কোন মুহূর্তে ধরা দিতে ইচ্ছুক বুঝেও অভিরূপ এ কথার উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে নীরব থেকে সুমিতার গভীর ভালবাসার উত্তাপ সানন্দে উপভোগ করল। ইতিমধ্যে কাকিমা ছোট ছুটো কাঁসিতে করে ঘি ও চিনি মাখিয়ে মুড়ি এবং নারকেল

কুঁরো ও ছুটো সিঁড়ির নাড়ু এনে দু-জনের হাতে ধরিয়ে দিলেন।

দু-জনে যেই খাওয়া শুরু করতে যাবে এমন সময় অনুরূপ ছুটতে-ছুটতে এসে ঘরে ঢুকে দিদিকে প্রশ্ন করল, 'অভিরূপদা এসেছেন?' পিছনের দিকে বসে থাকা অভিরূপকে সে দেখতে পায় নি। সুমিতা হেসে বলল, 'কেন, তুই এতক্ষণ খবর পাস নি?' 'বাঃ রে আমি খেলতে গিয়েছিলাম স্কুলের মাঠে! বল না অভিরূপদা কোথায়?' বলে অনুরূপ দিদির কোলের কাছে এগিয়ে গেল। 'কি জানি কোথায়!' বলে হাসতে-হাসতে অভিরূপের দিকে চাইতেই তার দৃষ্টি অনুসরণ করে অনুরূপ অভিরূপকে দেখে হোঃ-হোঃ করে হেসে উঠল। এবার অভিরূপ হাসতে-হাসতে বলল, 'যা অনুরূপ, আর একটা কাঁসি নিয়ে আয়, মুড়িটা তিনজনে ভাগ করে খাই।' 'না অভিরূপদা, তোমরা খাও, আমি জেঠীমার কাছে মুড়ি নিয়ে আসছি,' বলে সে ভাঁড়ারের দিকে দৌড় দিল। মিনিট দুয়েকের মধ্যে আর এক কাঁসি মুড়ি নিয়ে অনুরূপ ফিরে এলে সবাই মিলে গল্প করতে-করতে মুড়ি খাওয়া শুরু হল। গল্পের মধ্যে অনুরূপের স্কুল প্রসঙ্গ, পড়াশুনা প্রসঙ্গ ও স্কুল টিমে তার খেলতে চান্স পাওয়ার প্রসঙ্গ ইত্যাদি বেশী স্থান পেল। গল্প শেষ করে অভিরূপ যখন বাড়ি যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল তখন ঘরের কোণে তেপায়া টেবিলের উপর রক্ষিত একটা এলার্মটাইমপীসের ছোট কাঁটা আটটার ঘর ছুঁই ছুঁই করছে। এখুনি অভিরূপকে ছেড়ে দিতে সুমিতার ইচ্ছা ছিল না, তাই অভিরূপ উঠতেই তার হাতটা ধরে বসিয়ে দিতে চেয়ে বলল, 'আর একটু বস।' সুমিতার অন্তর কি চাইছে বুঝেও অভিরূপকে চলে যেতে হল। যাবার সময় অনুরূপ তার ডান হাতের দুটো আঙ্গুল ধরে অভিরূপদের বাড়ির দরজার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল।

পূজার ক'দিন বেশ আনন্দেই কাটল, গোলমাল হল বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় ঠাকুর বিসর্জনের সময়। প্রতিমা বাঁধাবাঁধি হচ্ছে

এমন সময় মণ্টু কোথা থেকে নেশা করে এসে বারোয়ারীতলায় সবার সামনে নিজের বুকে হাত চাপড়ে তালি বাজাতে-বাজাতে এবং ডান হাত দিয়ে নিজের বাম বাহুর বাইসেপে চাপড় মেরে চিৎকার করতে লাগল, 'এ্যাই শালা, কানকাটা ডুলো, বেরিয়ে আয় শালা, শালা মা দুগ্‌গার টাকা ঝেড়ে শালা সাইকেল কিনেছিস, শালা বারোয়ারীর তেড়পল নিয়ে গিয়ে ধান শুকোচ্ছিস, এ্যাই শালা বেরিয়ে আয়, শালা তোর হাতে কুষ্ঠ ব্যাধি হবে। শালা, কোথায় তোর সাগরেদ একচোখো দীনে ? আয় শালারা বেরিয়ে আয়,...... আজ শালা এই বারোয়ারীতলায় দাঁড়িয়ে সবার সামনে তোদের সব কু-কীর্তি ফাঁস করে দেব। এই শালারা চাষীদের ঘরে-ঘরে ধান আদায় করে মোটর চেপে দীঘা বেড়াতে গিয়েছিলি ; শালা, গরীব বাগ্দী-মুচিদের নাম করে চাঁদা তুলে নিজের বোনের ধুমধাম করে বিয়ে দিলি, বেরিয়ে আয় শালা।'

মিনিট কয়েক এ রকম করার পর গ্রামের ছেলেরা মিলে মণ্টুকে ধরাধরি করে সেখান থেকে সরিয়ে দিতে চাইলে মণ্টু হাত ঝাড়া দিয়ে আবার শুরু করল, 'ছেড়ে দাও আমাকে, বাপ-ধনেরা ছেড়ে দাও, তোমরা কিছু জান না, ঐ শালা দুটো কেন্নোর ভয়ে তোমরা ল্যাজ তুলে পালাও, আমি কিন্তু পালাব না। আমি শালাদের নাড়ী-নক্ষত্র জানি, আজ শালাদের সব ফাঁস করে দেব। তাতে মরতে হয় মরব, মরবার আগে গাঁয়ের লোককে সব জানিয়ে দিয়ে যাব।' মণ্টুর সঙ্গে ডুলো-দীনের কিছুদিন থেকেই একটা মনোমালিন্য চলছিল, আজকে আবার হয়ত নতুন করে কিছু একটা ঘটেছে তাই মণ্টু এসে ওরকম করছে। ডুলো-দীনে এসে পড়লে একটা দাঙ্গা বেধে যাবে ; তাতে ঠাকুর বিসর্জনে বিশেষ অসুবিধা হয়ে যেতে পারে ভেবে গ্রামের প্রবীণ কিছু লোক মণ্টুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করতে থাকেন, কিন্তু মণ্টুর সেই এক কথা, ডুলো-দীনে না আসা পর্যন্ত সে এক পাও নড়বে না। সে সমানে আবোল-তাবোল বকে যেতে লাগল। আপাততঃ আবোল-

ভাবোল মনে হলেও তার প্রত্যেকটি কথা নির্ভেজাল সত্য এবং তুলো-দীনে এতদিন যা-যা অপকর্ম করেছে সে সব একে-একে প্রকাশ করতে থাকল। গণ্ডগোলটা শুরু হতেই অভিরূপ বাড়ী থেকে ছুটতে-ছুটতে বারোয়ারীতলায় এসে হাজির হয়েছিল। সে যখন আসে তার হাতে মেসের রুমমেণ্ট দীপকের টেপরেকর্ডারটা ছিল। বারোয়ারীতলায় এসে মণ্টুর কথাগুলো সে সমস্তটাই রেকর্ড করে রাখতে শুরু করল। মণ্টু তখনও বলে চলেছে, 'ভুবন মোড়লকে দিনদুপুরে কেটে খড়ির জলে কে ভাসিয়ে দিয়েছিল? এই শালা দীনে; সন্ধ্যেবেলায় পুকুরঘাট থেকে আসার সময় সতীশ মাস্টারের মেয়ে নূপুরকে ধানক্ষেতে টেনে নিয়ে গিয়ে কে তার ইজ্জৎ নষ্ট করেছিল? ঐ শালা তুলো আর দীনে। শালাদের পাপের শেষ নেই, আমি শ্লা ছোটলোক মুচির ছেলে, কিন্তু তোদের সঙ্গে মিশেছি, তোরা যেখানে বলেছিস গিয়েছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শ্লা ভদ্দনোকের মেয়ের গায়ে হাত দিই নাই, কোন ভদ্দনোকের ছেলেকে একলা পেয়ে টাঙ্গী দিয়ে কুপিয়ে-কুপিয়ে মারি নাই, ওরে পাপে সব মরে যাবি, শালা। শকুনিতে দু'কান কেটেছে, চোখ উপড়ে দিয়েছে, তবু শ্লাদের শিক্ষা হয় নাই।'

অভিরূপ এক পাশে দাঁড়িয়ে টেপরেকর্ডার নিয়ে সমস্ত কিছু টেপ করে চলেছে। হঠাৎ সে দেখতে পেল তুলো আর দীনে কোথা থেকে ছুটতে-ছুটতে এসে মণ্টুকে জাপটে ধরে, 'বেশ করেছি ভুবন মোড়লকে খুন করেছি, বেশ করেছি সতে-মাস্টারের মেয়ের ইজ্জৎ নষ্ট করেছি, এ্যাই শালা, হারামী, তাতে তোর বাপের কি? শালা বেইমান কোথাকার'; বলে তার গলা টিপে ধরল। মণ্টুর গলা টিপে ধরতেই সে দম বন্ধ হয়ে কোঁ কোঁ করছে দেখে সেখানে উপস্থিত মুচিদের অনেক ছেলে সঙ্গে-সঙ্গে এসে জোর করে তার গলা থেকে তুলো আর দীনের হাত ছাড়িয়ে দিয়ে তাদের দু'জনকে বেদম পিটুনি দিল। পিটুনী খেতে-খেতে যখন তুলো-দীনে ভয়ে হাতে পায়ে ধরাধরি করতে লাগল তখন তাদের ছেড়ে দিল। এ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার চিৎকার

চ্যাঁচামেচির সব শব্দ অভিরূপ অতি সযত্নে টেপ করল এবং অকুস্থল থেকে তাড়াতাড়ি বাড়িতে গিয়ে টেপরেকর্ডারটা থেকে ঐ ক্যাসেটটা খুলে অন্য একটা ক্যাসেট লাগিয়ে রেখে দিল।

ঠাকুর বিজয়া হয়ে যাওয়ার দিন দুই পরেই অভিরূপ সুমিতা আবার গ্রাম থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল এবং যথাসময়ে যথানির্দিষ্ট স্থানে এসে পৌছল। বাড়ি থেকে ফেরার পর এবার অভিরূপ পড়াশুনায় দারুণ মনঃসংযোগ করল এবং নভেম্বরের শেষে পঞ্চমবর্ষের পরীক্ষায় বসল। পরীক্ষা শেষ হলে অভিরূপ একদিন ইউনিভারসিটিতে গিয়ে সুমিতার সঙ্গে দেখা করে বাড়ি যাবার ব্যাপারে কথা বলল। তার বাড়ি যাবার আগ্রহ দেখে সুমিতা প্রশ্ন করে জানল যে, মুরারিবাবু কোন চিঠি দেন নি। সুমিতার বাবা ভৈরববাবুও কোন চিঠি দেন নি শুনে অভিরূপ বলল, 'তা হ'লে সম্ভবতঃ কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে।' সুতরাং পরদিনই সকালে তারা কুরচি যাওয়া স্থির করল এবং বেলা প্রায় এগারটা নাগাদ কুরচিতে পৌছল।

বাড়ি এসে তারা শুনল, ইতিমধ্যেই দুলো আর দীনের লোকেরা এসে শাসিয়ে গেছে ধানের জমির ধারে কেউ যেন না যায়, ধান এবার তারাই কাটবে। মুরারিবাবু, ফণীবাবু এবং ভৈরববাবুর মুখে সব শুনে অভিরূপ ও সুমিতা স্নান-খাওয়া সেরে পুনরায় বর্দ্ধমানে ডি. এম. অফিসে দেখা করতে গেল এবং তাঁর অফিসের সামনে বোর্ডটা দেখে হতাশ হয়ে পড়ল, দেখল আগের ডি. এম.-এর পরিবর্ত্তে মিঃ এস. আর হাজরা নামে অন্য একজন বর্দ্ধমানের ডি. এম. হয়ে এসেছেন। প্রথম বিহ্বলতাটা কাটিয়ে অভিরূপ স্লিপ দিতেই ভিতর থেকে একজন বেয়ারা এসে তাদের অপেক্ষা করতে বলল। মিনিট কুড়ি অপেক্ষা করার পর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাদের ডেকে পাঠালেন।

অভিরূপ ও সুমিতা ভিতরে গিয়ে একটা লিখিত অভিযোগ তাঁর হাতে দিলে তিনি চোখ বুলিয়ে 'প্রোটেকশন তো দেবে লোকাল থানা, আপনি লোকাল থানায় যান, আমি বরং এই চিঠিটার উপর একটা নোট দিচ্ছি; বলে তিনি অভিযোগ পত্রটার উপরের দিকে খসখস করে কিছু লিখে সেটা অভিরূপের হাতে দিয়ে বললেন, 'যান গিয়ে এটা কাটোয়া থানায় দিন, তাহলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' অভিরূপ ডি এম.-এর নোটটার শেষে দেখল ইংরাজী ফুলস্টপ চিহ্নের পরিবর্তে ইংরাজীতে ছোট্ট 'ও'-এর মত একটা শূন্য বসানো আছে। তার অর্থ এই অভিযোগ পত্রের অভিযোগ অনুযায়ী পুলিশ এ্যাকশন শূন্য হবে, এটাই কাটোয়া থানার ও, সি.-কে ডি. এম.-এর নির্দেশ। অভিরূপ বুঝল এই ডি. এম.-কে উপরওয়ালারা পূর্ব থেকেই সতর্ক করে দিয়েছে বলে পুলিশ কোন এ্যাকশন নিতে নারাজ।

আজকাল উপরওয়ালাদের নির্দেশ অনুযায়ী জনসাধারণকে না চটিয়ে অফিসিয়াল কাগজপত্রে এই রকম কোড্-এর মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া শুরু হয়েছে এবং এই ভাবেই জনসাধারণ দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর তাদের স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্য বহুরকমের নাগরিক অধিকার, এমন কি, জীবনধারণের জন্য আইনানুযায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটাই পূর্ব পরিকল্পিত বুঝতে পেরে অভিরূপ সুমিতাকে সঙ্গে নিয়ে কাটোয়া দৌড়ল এবং ও. সি.-কে দেবার আগে ডি. এম.-এর নোট সহ চিঠিটার দুটো জেরক্স কপি করিয়ে রাখল। ও. সি. মি. ধর চিঠিটা পড়ে অভিরূপকে বললেন, 'ঠিক আছে, যেদিন ধান কাটতে লাগবেন তার আগের দিনই আমার কাছে খবর পাঠিয়ে দেবেন, আমি ফোর্স পাঠিয়ে দেব যাতে আপনাদের ধান কাটায় কেউ বাধা না দিতে পারে। তাঁর কথায় অভিরূপ বুঝল চাকরী বাঁচাতে গেলে আজকাল ডিষ্ট্রিক্ট্-ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও থানার ও. সি. দেরও ভাল অভিনয় শিখে রাখতে হয়। সমস্ত বুঝেও মুখে কিছু না বলে সে ও. সি.-কে ধন্যবাদ জানিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে গেল।

সন্ধ্যার দিকে গ্রামে এসে অভিরূপ জন কুড়ি কিষাণ ঠিক করল একদিন পরে ধান কাটবে বলে, কিন্তু যাদের ঠিক করল তারা পরদিন দুপুরে এসে জবাব দিয়ে গেল, কারন, মুরারি ঘোষ ফণী চক্কোবত্তি আর ভৈরব সরকারের ধান কেটে দিলে তাদের গাঁয়ে বাস উঠবে বলে দুলো আর দীনে ভয় দেখিয়েছে, তাই তারা ধান কাটতে পারবে না। তাদের কথায় অভিরূপ বুঝল জলে বাস করে তারা কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করতে মোটেই রাজী নয়, তাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ-কথা শোনার পর মুহূর্তমাত্র কালক্ষেপ না করে অভিরূপ কাটোয়া গিয়ে জন তিরিশেক সাঁওতাল নিয়ে রাত্রি ন'টা নাগাদ গ্রামে ঢুকে তাদের একদিনের সিধে অগ্রিম দিয়ে দিল যাতে পরদিন সকালে কাজে যাবার আগে তারা জলখাবার এবং দুপুরের খাবারটা তৈরী করে সঙ্গে নিতে পারে। সিধে নেওয়া হলে সাঁওতালদের জন্য খামার বাড়ীতে নির্দিষ্ট জায়গা দেখিয়ে রাত্রি প্রায় এগারটার সময় এসে বাড়ি ঢুকল কিন্তু আধঘণ্টা যেতে না যেতে একটা চিৎকার চেঁচামেচি শুনে বাড়ির দরজা খুলতেই অভিরূপ বুঝতে পারল আওয়াজটা তাদের খামার বাড়ির দিক থেকেই আসছে। ছুটে খামারবাড়ি গিয়ে দেখল 'মার শালাদের, শালারা বড়লোকের ধান কেটে দিতে এয়েচে, মার শালাদের' বলতে বলতে কে যেন একটা বাঁশের লাঠি দিয়ে সাঁওতালদের হাঁড়িকুড়ি ভেঙ্গে দিচ্ছে, তাদের মেয়েদের চুল ধরে টানাটানি করছে। অভিরূপ খামার বাড়িতে ঢুকে টর্চের আলো ফেলতেই দুটো লোক পাঁচিল টপকে পালিয়ে গেল, তাদের চেহারা এবং কাটা কান দেখে অভিরূপের বুঝতে অসুবিধা হল না এরা কারা। অভিরূপকে দেখেই সাঁওতালরা বলতে শুরু করল, 'মনিব তুর এখানে বহুৎ গুণ্ডগোল আছে, আমরা ধান কাটতে লাড়ব, আমরা এক্ষুনি ফিরৎ চলে যাব', বলতে বলতেই তারা অভিরূপকে হতভম্ব করে দিয়ে দলবল সমেত বের হয়ে গেল। সাঁওতালরা চলে যাবার পর অভিরূপ সেখানে কিছুক্ষণ হতবাক

হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ধীরে-ধীরে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হল।

পরদিন সকাল হতেই অভিরূপ ভৈরববাবু, মুরারিবাবু এবং ফণীবাবুর বাড়ির লোকজনদের জড় করে নিজেরাই নিজেদের ধান কাটবে বলে মাঠের আলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল, কথা অনুযায়ী প্রথমে মাস্টার মশায়ের জমির ধান কাটা হবে বলে ফণীবাবুর জমিতে গিয়ে সকলে নামল। মাষ্টারমশায় নিজে, অভিরূপ, সুমিতা, মুরারিবাবু, ভৈরববাবু, অনুরূপ. ভৈরববাবুর ভাই সৌরভবাবু প্রভৃতি জনা আষ্টেক জমিতে ধান কাটা শুরু করল। বেলা আটটা পর্য্যন্ত নির্বিঘ্নে দু-পাই ধান কাটার পর দেখা গেল শত খানেক লোক লাঠি-সোঁটা-টাঙ্গী-বল্লম নিয়ে বিভিন্ন ধরণের আওয়াজ করতে-করতে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। মুরারিবাবু ও মাস্টারমশায় ঘাবড়ে গিয়ে অভিরূপকে বললেন, 'ধানকাটা থাক, ওদের সঙ্গে মারামারি করে আমরা পারব না, ছেড়ে দাও বাবা অভিরূপ, ওদের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, এক্ষুনি রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে।' অভিরূপ জমি থেকে মুখ তুলে গম্ভীর ও শান্তকণ্ঠে বলল, 'মাষ্টারমশায়, আজ যদি ভয়ে জমি থেকে উঠে যেতে হয় তাহলে কাল বাড়ি থেকেও হয়ত চলে যেতে হতে পারে, পরশু দেশ থেকেই হয়ত চলে যেতে হবে। আপনারা সবাই চলে গেলেও আমি আর সুমিতা জমি থেকে উঠব না। যাক আজ, আপনার জমির মাটি আমাদের রক্তে ধুয়ে যাক ; আমাদের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে জীবন যদি যায় তো যাক। আমাদের মৃত্যু দিয়ে এ গ্রামের সমস্ত লোককে শিখিয়ে দিতে চাই যে, বাপ ঠাকুর্দার অনেক রক্ত ঘাম অশ্রুতে তৈরী নিজের পায়ের তলার মাটি রাখতে গেলে জীবন গেলেও পরোয়া নেই ; এ মাটি রক্ষার জন্য জীবন দিতে আমরা প্রস্তুত।

অভিরূপ ও সুমিতা যেন আজ মরণদোলায় চেপেছে, কারও কোন কথা মানছে না, মাথা নীচু করে ধান কেটেই চলেছে। ওদিকে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শত মানুষের মিছিল উগ্রমূর্তিতে ক্রমাগত

কাছে এগিয়ে আসছে। মিছিল যত নিকটবর্তী হচ্ছে তত মিছিলকারীদের মুখের অকথ্য খিস্তির ভাষাগুলো অভিরূপ ও সুমিতার কানে পৌঁছুচ্ছে। ভিতরে-ভিতরে তাদের তরুণ শরীরের উষ্ণ শোণিত টগবগ করে ফুটছে কিন্তু বাইরে তারা শান্ত ও ধীরভাবে নিজেদের কাজ করে যাচ্ছে। এমন সময় ভৈরববাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ও কি? ওরা আবার কারা?' তাঁর কথায় সন্ত্রস্ত সকলে বিস্ময়ান্বিত দৃষ্টি তুলে দেখল গ্রামের দিক থেকে সেই কুড়িটা কিষাণকে সঙ্গে নিয়ে মণ্টু আগে-আগে আসছে; মণ্টুর হাতে বিশাল একটা টাঙ্গী আর অন্য কুড়িটা লোকের হাতে কুড়িটা চকচকে বর্শা। ক্রমে দু-পক্ষই সামনাসামনি এসে এক জায়গায় থেমে গেল। প্রথম মিছিল থেকে দুলো বের হয়ে সামনে এসে আল থেকে হাঁক দিয়ে বলল, 'য়্যাই সায়েনসিস্টের বাচ্চা, ভোরো সরকারের জামাই, বন্ধ কর ধান কাটা, না হ'লে দেখেছিস, এ্যাই দেখ একশ' লেঠেল আজ এই জমিতে নেমে তোকে পুঁতে ফেলবে,' বলে আবার চিৎকার করে উঠল, 'আরে এ্যাই শালা শুনতে পাচ্ছিস না নাকি?' প্রথমে সায়েনসিস্টের বাচ্চা, ভোরো সরকারের জামাই বলাতেও অভিরূপ কিছু বলে নি। দ্বিতীয়বার 'শালা' বলে খিস্তি করতেই অভিরূপ মুখটা তুলে সোজা-সুজি তার দিকে তাকিয়ে 'খুব সাবধান, আর একটি খিস্তিও যেন না শুনি, ধান আমরা কাটবই, দেখি কে আটকায়।' বলে আবার ঘাড় হেঁট করে অভিরূপ ধান কাটতে শুরু করল। তার এই জিদ এবং সাহস দেখে দুলো, 'তবে রে' বলে যেই আল থেকে জমিতে পা দিয়েছে অমনি ওদিক থেকে মণ্টু, 'খবরদার, আমি বেঁচে থাকতে অভিরূপদার গায়ে কেউ যদি হাত দেয় তো তার মুণ্ডুটা আজ এইখানে গড়াগড়ি যাবে বলে দিচ্ছি,' বলে জমিতে নেমে একেবারে অভিরূপের সামনে এসে তাকে আড়াল করে দাঁড়াল। তার ডান হাতটা দু'হাতে ঝাঁকারি মেরে সরিয়ে দিয়ে দুলো 'দেখি তুই কি করে আটকাস,' বলে তাকে পাশ কাটিয়ে ছুটে গিয়ে অভিরূপের চুলের মুঠিটা ধরল। যে মুহূর্তে দুলো অভিরূপের চুলের মুঠিতে হাত দিয়েছে

অমনি বেঁটে এসে এক ছোঁয়ে তার ডান চোখটা উপড়ে নিয়ে তার দলের লোকদের পায়ের তলায় ফেলে দিল। দুলোর চোখটা উপরে নিয়ে যেতেই উপরের দিকে চেয়ে দেখে সকলের চক্ষু স্থির। উপস্থিত সকলে অবাক হয়ে দেখতে পেল আজ শুধু বেঁটে বীরই নয় তখন মাথার উপর সাঁই-সাঁই করে চক্কর দিচ্ছে কয়েক শ' শকুন। অভিরূপ একবার তাকিয়েই বুঝতে পারল তাহলে এতক্ষণ গোলমাল দেখে বেঁটে আর বীরই তাদের স্ব-দলীয় পক্ষীকুলকে অকুস্থলে ডেকে নিয়ে এসেছে।

ওদিকে দুলোর চোখটা উপড়ে দলের লোকের মাঝখানে ফেলে দিতেই তার দলের লোকগুলো গেল ক্ষেপে, তারা হই-হই করে নেমে পড়ল মাঠে আর ওদিক থেকে মণ্টুর দলও নেমে পড়ল মাটিতে, শুরু হল মারামারি। মারামারি শুরু হতেই বেঁটে আর বীর ও তাদের কয়েক শত শকুন বন্ধুর দল সবেগে নেমে এসে দাঙ্গাকারীদের উপর উপর্যুপরি ছোঁ মারতে লাগল, ফলে, কারও কান গেল, কারও নাক গেল, কারও বাহুর খানিকটা অংশ গেল, কারও মাথার খানিকটা চামড়া গেল। নিজেদের মধ্যে মারামারি ভুলে দাঙ্গাকারীরা তখন পাখী-গুলোকে লক্ষ্য করে উপর দিকে বর্শা ও লাঠি নিক্ষেপ করতে লাগল এবং সেই লাঠি ও বর্শা উপর থেকে ঘুরে এসে তাদের নিজেদেরকেই আহত করতে লাগল। অবশেষে দেখা গেল দুলো ও মণ্টুর দলের কারোরই হাতে কোন অস্ত্র নেই এবং সবাই শকুন-দলের তাড়া খেয়ে প্রাণভয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। এ অবস্থা দেখে অভিরূপ, সুমিতা, ফণীবাবু, মুরারিবাবু, ভৈরববাবু, অনুরূপ ও সৌরভ-বাবু সকলে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল শকুনগুলো যেন দেবদূত। দুলো-দীনের দল চলে গেলে পর মণ্টু ও তার দলের কিছু লোক শকুনের ছোঁ খেয়েও ঐখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা অভিরূপকে বলল, 'আপনি অনুমতি দিলে আমরা আপনার ধান কেটে ঘরে পৌঁছে দেব, ভয় নেই আমরা কিন্তু বেইমানী করব না।' অভিরূপ খুশী মনে মণ্টুর পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, 'সত্যি মণ্টু, তুই আমাকে এত

ভালবাসিস ? সেই যে গত বছরের আগের বছর মহালয়ার দিন ধান নেওয়া নিয়ে বাবার সঙ্গে গণ্ডগোল পাকালি তারপর আজ এই প্রথম দেখলাম তুই আবার আগের মণ্টু হয়ে উঠেছিস। নে তোরা ধান কাট, আমি তোদের জলখাবারের ব্যবস্থা করি।' অভিরূপের কথা শুনে মণ্টু বলল, 'অভিরূপদা, আমরা ছোট জাতের ছেলে, নেকাপড়া শিকি নাই বলে কি স্নেয়-অন্যেয়টা বুঝব না, এতদিন ভুল যা করেচি তা বাবু আর তুমি মাফ করে দিও, তাহ'লেই আমার পাপ ধুয়ে যাবে। আমি আর কখনও বেইমানী করব না।' কথা শেষ করে ধান কাটাতে লেগে গেল।

কিছুক্ষণ ধান কাটার পর মাঠের মাঝখানে একটা জীপ গাড়ীর আওয়াজ শুনে দৃষ্টি ঘোরাতেই দেখা গেল একটা জীপ গরুর গাড়ির নিক্ বেয়ে ঐ জমির দিকেই দ্রুত এগিয়ে আসছে। ধানকাটা থামিয়ে মণ্টুর দলও সেদিকে দেখছিল, তারা অভিরূপকে বলল, 'বাবু মনে হচ্ছে পুলিশের জীপ, বাবু আমাদের ধরবে না তো ?' 'না তোদের কোন ভয় নেই, তোরা ধান কাট আমি দেখছি', বলে অভিরূপ জীপটার দিকে এগোতে লাগল। ইতিমধ্যে জীপটাও জমিটার প্রায় গায়েই এসে দাঁড়িয়েছে। জীপটা দাঁড়াতেই তার মধ্য থেকে কাটোয়ার ও. সি. মিস্টার ধর নামলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে পিছন থেকে জনা ছয়েক রাইফেলধারী সিপাহী নেমে একেবারে এ্যাটেনশন্ নিয়ে দাঁড়াল।

অভিরূপকে সামনে দেখেই মিঃ ধর প্রশ্ন করলেন, 'ঢুলাল, আই মিন্, ঢুলাল মণ্ডল কোথায় ? 'অভিরূপ নিজের ডান হাতের তর্জনীটা নিজেরই বুকে ঠেকিয়ে মিঃ ধরকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন স্যার ?' 'না-না, আপনি কেন ?' বলতে-বলতে তিনি গটগট করে যারা ধান কাটছিল তাদের পাশে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এ্যাই তোমাদের ঢুলাল কোথায় ?' ও. সি. মিঃ ধরের কথায় মণ্টুর লোকেরা সকলে এক সঙ্গে হেসে উঠতেই ও. সি. সাহেব বিরক্তির সঙ্গে পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'এ্যাই তোমরা হাসছ কেন ?

আমি কাটোয়া থানার বড়বাবু মিঃ ধর, বুঝতে পারছ না? তোমাদের দুলাল মণ্ডল কোথায়?' 'তার আমরা কি করে জানব? আমরা কি কানকাটা দুলোর মাইনে করা টিকটিকি নাকি হুজুর, যে, তার সুলুক সন্ধান রেখে বেড়াব? আমাদের কি প্যাট লাই?' মিঃ ধর তাদের এই বাঁকা কথা হজম করতে পারলেন না, তিনি উত্তেজিত হয়ে আবার প্রশ্ন করলেন, 'এ্যাই তোমরা কাদের লোক? দুলালের নও?' এবার মণ্টু সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ও. সি. মিঃ ধরের চোখের দিকে চেয়ে বলল, 'হুজুর আমরা এই বাবু অভিরূপ ঘোষের লোক, তার জমির ধান কাটছি, আর কিছু বলবেন হুজুর?' এবার ওদের ছেড়ে দিয়ে ও. সি. সাহেব আলে দণ্ডায়মান অভিরূপ ও অন্যান্যদের কাছে এসে উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'কার হুকুমে আপনি ধান কাটছেন? আপনাকে যে সেদিন বলেছিলাম আগে খবর দিয়ে তবে জমিতে নামবেন।' 'হ্যাঁ তা'হলে দুলাল মোড়ল ও তার সাকরেদদের প্রটেক্শন্ দিতে আরও সকাল-সকাল এখানে এসে উপস্থিত থাকতেন, এই তো?' বলে অভিরূপ ও. সি.-কে বিদ্রূপ করে উঠল। 'খবরদার, আজে-বাজে বকবেন না, আপনি থানার নির্দেশ অমান্য করেছেন, ডেট না জানিয়ে জমিতে নেমেছেন, এটা বিরাট বে-আইনী কাজ······জানেন······এরজন্য ···' ও. সি.-র মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অভিরূপ বলল, 'এর জন্য আমাকে য়্যারেস্ট করতে পারেন, এই তো? কিন্তু নিজের জমিতে নামতে কাউকে বাধা দেওয়াটা কোন্ আইনে পড়ে? বাঃ ও. সি. সাহেব! চিঠি না পড়ে বাকচাতুর্য করে লোককে ধমকানো এবং হয়রানি করাটা কোন আইনের ব্যবস্থা? মশায়, কি বলতে পারেন? অভিরূপের বিদ্রূপাত্মক কথাবার্তায় ও. সি. মিঃ ধর প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং বললেন, 'কি? আমি চিঠি পড়ি না······!' অভিরূপও ও. সি.-র গলার স্বরের উপর গলা চড়িয়ে বলে উঠল, 'না, আপনি চিঠি পড়েন না, পড়লে বলতে পারতেন না আপনাকে ডেট না জানিয়ে আমি ধান কাটতে নেমেছি! এই দেখুন, বলে জামার বুক পকেট

থেকে ও. সি.-কে দেওয়া চিঠির জেরক্স কপিটা বের করে তারিখটা দেখিয়ে দিতেই ও. সি. আরও ক্ষেপে, 'তবে রে, আমার মুখের উপর কথা ?' বলে এগিয়ে অভিরূপের জামার কলারটা চেপে ধরতে যান, এমন সময় অভিরূপ সামান্য দু-পা পিছিয়ে গিয়ে আকাশের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলে উঠল, 'উঁ-হুঁ খুব সাবধান, আমাকে ছোঁবেন না, ছুঁলেই ঐ দেখুন·······' বলে দুলাল মোড়লের পড়ে থাকা চোখটার দিকে এবং মাঠের চতুর্দিকে ছড়ানো লাঠি ও বর্শার দিকে দেখিয়ে দিল।

ও. সি. মিঃ ধর দেখলেন মাথার উপর কতকগুলো পাখী উড়ছে। তিনি আরও উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আমাকে বক দেখানো হচ্ছে ? মজা হচ্ছে ? আমার সঙ্গে মজা ?' 'না-না বক নয়, বক নয় ওগুলো শকুন। ঐ যে জীপের কাছে এ্যাটেনশন্ নিয়ে যে দু-জন দাঁড়িয়ে আছে ওরা যেমন আপনার সৈনিক, ঐ উপরের ওরাও আমার সৈনিক ; শকুন সৈনিক। আপনার ঐ দুলাল বন্ধু আমার গায়ে হাত দিতে এসেছিল বলে তার চোখ আর তার শত খানেক সৈনিকের ঐ লাঠি সোটা বর্শাগুলো মাঠে গড়াগড়ি যাচ্ছে ·····আপনি আমার গায়ে হাত দিলেই ওরা দুলোর মত আপনারও ব্যবস্থা করে ফেলবে ?' বলে অভিরূপ থামতেই 'কি এত বড় কথা ? শকুনিতে আমার ব্যবস্থা করবে ? ইডিয়ট, নচ্ছার ছেলে কোথাকার ? তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা ?' বলে মিঃ ধর এগিয়ে এসে অভিরূপের চুলের মুঠিটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিতেই বীর উড়ে এসে ও. সি. মিঃ ধরের ডান কানটায় ছোঁ মেরে কানটা আধখানা ছিঁড়ে নিয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে মিঃ ধরের কান বেয়ে গল-গল করে রক্ত বের হতে আরম্ভ হ'ল, তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে অভিরূপকে ছেড়ে উড়ন্ত পাখীগুলোর পানে আকাশের দিকে চেয়ে সিপাহীদের নির্দ্দেশ দিলেন 'ফায়ার', সঙ্গে-সঙ্গে দু-খানা রাইফেল আকাশে উড়ন্ত পাখীগুলোকে তাক করে ঝলসে উঠল কিন্তু পাখীগুলোর কিছুই হল না, কারণ তারা তখন রাইফেলের রেঞ্জের অনেক বাইরে।

পাখীগুলোর কিছুই হল না দেখে ও. সি. সাহেব আরও ক্ষেপে গেলেন, তিনি পাখীগুলোকে প্ররোচিত করবার জন্য আবার অভিরূপের চুলের মুঠি ধরে টানা-হেঁচড়া করতেই সাঁ করে বেঁটে ও আরও গোটা দশেক পাখী একসঙ্গে নীচে নেমে ও. সি,-র গালে ও অন্যান্য সিপাহীদের কারও চোখে কারও মুখে ছোঁ মারতে লাগল। ও. সি. সাহেব সঙ্গে-সঙ্গে অভিরূপকে ছেড়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর সার্ভিস রিভলবার থেকে পাখীগুলোকে লক্ষ্য করে পর পর ছ'টা গুলি চালালেন এবং অবাক হয়ে দেখলেন একটা পাখীরও কিছু হয় নি বরং তাঁর নিজের সিপাহীদের মধ্যে দু-জন মাঠের মধ্যে পড়ে কাতরাচ্ছে অর্থাৎ গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে তাঁর নিজের লোকেরই গায়ে লেগেছে। সিপাহীদের গায়ে গুলি লাগায় অন্য চারজন সিপাহী প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে ও. সি. মিঃ ধরকে ঐ মাঠের মধ্যেই বেদম মারধর করল তারপর আহত সিপাহীদের দেহ ও মিস্টার ধরের প্রহৃত প্রায় অবশ শরীরটা জীপে তুলে নিয়ে জীপ, ছেড়ে দিল।

এরপর আর ঐ তিন গৃহস্থের ধান কাটায় কেউ বাধা দিতে সাহস করল না। দিন পাঁচেকের মধ্যে নির্বিঘ্নে ধান কাটা ও ঝাড়া হয়ে গেলে অভিরূপ ও সুমিতা কলকাতা রওনা হ'ল। তারা যাবার সময় মণ্টু ও তার সঙ্গী-সাথীরা বাস-স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে দিল।

বাসে ওঠবার আগে অভিরূপ মণ্টুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'দ্যাখ মণ্টু এই গ্রামটার মালিক শুধু-দুলো বা দীনে নয়, গ্রামটা আমাদের সবার, সুতরাং সমস্ত অন্যায়ের প্রতিরোধ করা আমাদের উচিত। তোর উপর আমার অনেক ভরসা। তোরা আমাদের বিপদে যেভাবে এগিয়ে এলি ঠিক এমনি করেই গ্রামের অন্য লোকের বিপদেও এগিয়ে আসবি, তাহ'লে দেখবি সবারই ভয় ভেঙ্গে যাবে, সবাই আবার এক-জোট হয়ে গ্রামের ভাল করার জন্য উঠে পড়ে লাগবে, সবাই তোদের ভালবাসবে। জেনে রাখ মাটি হচ্ছে মা; মায়ের শরীর খারাপ হ'লে ছেলেদের যেমন দুধ দিতে পারে না এও তেমনি, জমিজায়গা এ

সমস্ত নিয়ে যদি তুলো-দীনের মত কু-চক্রীরা সব সময় অশান্তি লাগিয়ে রাখে তা'হলে চাষবাস চলবে কি করে? আর চাষবাস না হ'লে আমরা সকলে কোথা থেকে ধান-চাল পাব? কি খেয়ে বাঁচব?'

অভিরূপের কথায় মন্টু ঘাড়টা কাত করে বলল, 'হ্যাঁ বাবু, আমরা সেটা এতদিনে বুঝতে পারচি। গতবার পূজোর দিন কয়েক আগে গাঁয়ের সমস্ত বাড়ি ঘুরেছেলাম এক বস্তা ধানের জন্যে, কেউ দেয় নি, সবাই বলেচে, কেন তুলোর কাছে নেগা, দীনের কাছে নেগা যা, কেউ দেয় নি বাবু। ছোট ছেলেমেয়েগুলোর একটা করে জামা কিনে দিতে পারি নাই। এবার পূজোর সময় তুলোর কাছে গ্যালাম ধানের জন্যে, তুলো ফিরিয়ে দিলে; দীনের কাছে গ্যালাম, দীনে অপমান করলে, বললে, অন্য কারও কাছে নেগা। মুখটি চুণ করে খালি বস্তা নিয়ে বাড়ি ফিরে এ্যালাম। কেউ ধান দেয়নি শুনে আমার বউ মাগীটা বললে, 'কেন, তুলো-দীনের লেজুর ধরে ঘোর গে আর হই-হই করে এ চাষীকে গাল সে চাষীকে থাপ্পর লাগাগে যা, তাহলে অনেক ধান মিলবেক, কই আজকে তোর তুলো-দীনে বাঁশবুকোরা কোতায় গেল? জামাকাপড় তো দূরের থাকুক; পূজোর সময় ছেলেমেয়ে দুটো খাবেক কি ভেবে দেখেছিস?' তারপর বৌটা গিয়ে তোমার বাবার কাছে এক বস্তা ধান নিয়ে এল। বাবু বউটা বের হয়ে যাবার পর কতাটা আমার বুকে বড় বাজল, মনে ভেবে দ্যাখলাম বউটা তো সত্যি বলেচে। বাবুদের সঙ্গে যতদিন খারাপ ব্যাভার করি নাই ততদিন তো বাবুরা যখন যা চেয়েচি সবই দিয়েচে। তোমাদের বাড়িতে যতদিন কাজ করেচি আমার কোন কিছুরই অভাব ছিল না, কিন্তু সেই যে মহালয়ার দিন তুলোর পাল্লায় পড়ে তোমার বাবার কাছে জোর করে ধান আদায় করতে গ্যালাম তারপর থেকেই আমার অবস্থা ক্রেমশঃ খারাপ হয়ে গেল। তোমাদের সঙ্গে ঝ্যামেলা পাকিয়েচি বলে গাঁয়ে অন্য চাষীরা বিশ্বাস করে আর কাজ দিতে চাইল না, পেথম পেথম তুলো-দীনে নিজেদের জমিতে কিছু কিছু কাজ দিত, তারপর পয়সা কম দিয়ে খাটাতে চাইত, অন্য নোকের

কাচে কাজ করলে দু-কেজি চাল সাত-আট টাকা মজুরী, আর নিজেরা দিত এক কেজি চাল পাঁচ টাকা মজুরী। কম চাল ও মজুরী দেওয়ার জন্যে আমি একদিন আপত্তি করলে আমাকে বললে, 'সারা বছর অন্য লোকের কাচে তোদের পাইয়ে তো দিচ্চি। বেশী পাইয়ে দিলে আমার তো একটা কমিশন হয় সেই কমিশনের টাকাটাই চাল আর মজুরী কম দিয়ে পুষিয়ে নিচ্চি।'

বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অভিরূপ এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে মণ্টুর সব কথা শুনছিল, মনে-মনে সে বুঝল গ্রামে-গ্রামে চাষীদের কাছ থেকে জবরদস্তি আদায় চলেছে কিন্তু তার সবটা এই দীন দরিদ্র মজুররা পাচ্ছে না, এই গরীবদের মজুরী ও চাল থেকে একটা অংশ দুলো-দীনের মত অমানুষদের পকেটে চলে যাচ্ছে। কলকাতায় বসে যারা নীতি ছকে দিচ্ছেন সেই সব উপরওয়ালারা হয়ত এ সমস্ত বিষয় জানেনেই না। নিজের মনেই অভিরূপ একবার মন্তব্য করে নেয়, 'বাঃ চলছে ভাল।' সুমিতা এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, সে হঠাৎ অভিরূপকে বলল, 'বাস আসছে, রেডি হও' তার কথা শুনে অভিরূপ তাড়াতাড়ি মণ্টুর হাত দুটো ধরে, 'তোরা ভালভাবে থাকবি, অকারণে ঝগড়া-ঝাঁটি করিস না। যেদিন কাজের অভাব হবে বাবাকে গিয়ে বলবি, আর আমি কলকাতায় গিয়ে বাবাকে চিঠি লিখে দেব তোকে প্রয়োজন মতো আবার কাজে নেবার জন্য, যা এবার সব বাড়ি যা।'

কথা বলতে-বলতেই বাস এসে থামলে অভিরূপ ও সুমিতা বাসে উঠে গেল, মণ্টু চিৎকার করে বলল, 'দাদাবাবু, কলকেতায় গিয়ে একটা চিটি দিও আর বড়বাবুর জন্য ভেবো না, আমরা আর কাউকে ফণীমাস্টারের ভৈরব সরকারের আর তোমার বাবার কোন ক্ষেতি করতে দোব না, জান দিয়ে লড়ব, তুমি ভেবো না, মন দিয়ে পড়াশুনা করগে যাও?'

বাসে উঠে সুমিতা লেডিজ সীটে বসবার একটা জায়গা পেল কিন্তু অভিরূপকে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল। প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে হাতে

ঝোলা নিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ধাক্কা খেতে-খেতে হেলতে হেলতে দুলতে-দুলতে টলতে-টলতে অবশেষে ঘণ্টা দেড়েক বাদে বর্দ্ধমান রেলষ্টেশনের স্টপেজে এসে অভিরূপ যখন নামল তার মুখের দিকে চেয়ে সুমিতার বড্ড মায়া হ'ল, বলল, 'তোমার খুব কষ্ট হয়েছে তাই না; সমস্ত রাস্তাটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আসতে হ'ল, ইসস্‌, কি বিশ্রী ব্যাপার!' অভিরূপ বলল, 'রাস্তাঘাটগুলো যদি একটু ভাল হয় তা'হলে বাস অত নাচে না আর বাসের ভিতরে মানুষগুলো যদি সামান্য একটু চিন্তাভাবনা করে অপরকে বাঁচিয়ে নামা-ওঠা করে তাহ'লেও কিছুটা ক্লান্তি বা কষ্ট কম হয় কিন্তু তা তো কেউ করবে না। রাস্তাঘাট তো চিরকালই এইরকম খাল ডোবায় ভরা থাকবে আর বাসগুলো কত্থক নৃত্য করতে-করতে ছুটবে এবং মানুষগুলোও সেইরকম। একটা সীট খালি হলে ডাইভ মেরে, গোঁত্তা মেরে সকলকে ঠেলে ফেলে তফাৎ করে দিয়ে সেখানে যাবার জন্য দশজন লোক একসঙ্গে লাফালাফি শুরু করে দেবে, সুতরাং আমার আজ যে কষ্ট হল এ কষ্ট এ দেশে চিরকালই সব বাসযাত্রীরই ভাগ্যে ঘটছে ও ঘটবে, নেঃ চল'; কথা বলতে বলতে দু-জনে রেলষ্টেশনের টিকিট কাউন্টারের কাছে এসে পৌঁছল। কাউন্টারের ভিতরে টাকা এগিয়ে দিয়ে দু'খানা হাওড়ার টিকিট কিনে অভিরূপের কাছে ফিরে এসে সুমিতা বলল, 'চল, স্টেশনের ভিতরে যাওয়া যাক।' দু'জনে মিনিট তিনেকের মধ্যে চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে একটা বেঞ্চে বসল, কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ি এলে গাড়িতে ঢুকে জানালার পাশে সীট দেখে পাশাপাশি বসল।

মিনিট দশেক পরে বাতাসে বৈদ্যুতিক শব্দের তরঙ্গ তুলে গাড়ি হাওড়া অভিমুখে যাত্রা শুরু করল। অভিরূপ ব্যাগ থেকে একখানা বই বের করে তাতে মনঃসংযোগ করল। সুমিতার খুবই ইচ্ছা হচ্ছিল অভিরূপের সঙ্গে গল্প করার কিন্তু দেখতে-দেখতে মিনিট কয়েকের মধ্যেই অভিরূপ পড়ায় এমনই নিবিষ্ট হয়ে পড়ল যে, তাকে বিরক্ত করতে সুমিতার আর ইচ্ছা হ'ল না, কারণ ছোটবেলা থেকেই

সে অভিরূপকে জানত, পড়তে বসলে তার আর কোন দিকেই খেয়াল থাকে না, ঠেলে না ওঠালে সে খেতে পর্যন্ত ওঠে না। সুতরাং অভিরূপের সঙ্গে এই মুহূর্তে গল্প করতে না পারার জন্য তার মনে নীরব অভিমানের সৃষ্টি হ'ল এবং সেও নিজের ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে তাতে মনোনিবেশ করল।

বই-এর দিকে চোখ রাখলেও সুমিতা কিন্তু মাঝে-মাঝে আড়চোখে অভিরূপের দিকেও দেখছিল এবং গাড়ির ঝাঁকানির সঙ্গে-সঙ্গে ইচ্ছা করে সে অভিরূপকেও ঝাঁকিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু অভিরূপ যেন পাথরের মূর্ত্তি। তাকে দেখে সুমিতার মনে হচ্ছিল যে, এই চলন্ত ট্রেনের কোলাহলমুখর পরিবেশটাও এই মুহূর্তে অভিরূপের কাছে যেন শান্ত তপোবনের পরিবেশ। সে যেন কোন তপোবনের সুশান্ত পরিবেশে ধ্যানরত ঋষি। সুমিতা বিস্ময়াকুল দৃষ্টি দিয়ে অভিরূপকে দেখতে থাকে। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে ভুলে যায় যে ট্রেনের অন্য যাত্রীরা তাদের দিকে চেয়ে থাকতে পারে, ভুলে যায় যে এভাবে একটা ছেলের দিকে একটা অনূঢ়া মেয়ের তাকিয়ে থাকা দেখলে অন্য যাত্রীরা কি ভাবতে পারে।

সুমিতা যখন অভিরূপের দিকে বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে তাকিয়ে ছিল ঠিক তখনই পাশ থেকে কয়েকটা আওয়াজ ভেসে এল, 'যাঃ ট্রেন আর যাবে না? কেন? দেরী হবে? তার কেটেছে?' শব্দগুলো কানে ঢুকতেই সুমিতার ধ্যান ভঙ্গ হ'ল। অভিরূপের মুখের থেকে চোখ ঘুরিয়ে সাধারণ যাত্রীদের দিকে চেয়ে তাদের কথাবার্তা শুনে সে যখন বুঝল যে সিমলাগড়ের কাছে কে বা কারা যেন ওভার হেড লাইনের তার কেটেছে, তার মানে ট্রেন যেতে দেরী হবে তখন বাম হাতের কনুইটা দিয়ে অভিরূপকে আলতোভাবে একটা খোঁচা মেরে সুমিতা বলল, 'এ্যাই ট্রেন আর যাবে না, কারা যেন ট্রাক্‌শন্‌-ওয়ার কেটেছে, শুনছ। এ্যাই?'

সুমিতার গুঁতোতে অভিরূপ বই থেকে চোখ তুলে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে 'এ্যাঁ এ্যাঁ' করতে লেগেছিল, ঘটনাটা কি হয়েছে

প্রথমে সে বুঝতে পারে নি। সুমিতা দ্বিতীয়বার বলতে অভিরূপ ব্যাপারটা বুঝল এবং বলল, 'ট্রেন যখন ছাড়বার কোন ঠিক নেই তখন তো কিছু খাবার ব্যবস্থা দেখতে হয়।' কথাগুলো বলতে-বলতে অভিরূপ সীট থেকে উঠে গাড়ির দরজার কাছে গিয়ে তাকিয়ে দেখল গাড়িটা প্রায় মেমারী স্টেশন প্ল্যাটফর্মের কাছাকাছি একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যাবার উদ্দেশ্যে যেই সে নামতে যাবে অমনি গাড়িটা ছেড়ে দিল এবং ধীরগতিতে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়ে গেল। গাড়ি থেকে নেমে এদিক ওদিক চাইতেই সে দেখতে পেল একটা লোক দু' চাকার ঠেলা গাড়িতে করে কি যেন বিক্রী করছে, তার কাছে অনেক লোকের ভীড়। অভিরূপ ভীড় ঠেলে কাছাকাছি পৌঁছে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলে উঠল, গাড়িটা মেমারী স্টেশন বাজারের দুর্গামাতা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের গাড়ি, সকাল থেকে ট্রেনের গোলমাল বলে তারা দু'খানা কচুরী মটরের ডাল ও দুটো করে দানাদার প্যাকেট করে বিক্রি করছে, দাম দু' টাকা। অভিরূপ চার টাকা দিয়ে দুটো প্যাকেট কিনে গাড়িতে এসে একটা প্যাকেট সুমিতার হাতে দিয়ে আর একটা প্যাকেট খুলে নিজে খেতে আরম্ভ করল। খাওয়া শেষ হলে ব্যাগ থেকে একটা প্লাষ্টিকের গ্লাস বের করে পুনরায় বাইরে গিয়ে টিউব-ওয়েল থেকে জল খেল এবং সুমিতার জন্য এক গ্লাস জল নিয়ে এল।

এদিকে প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ হয়ে গেল অথচ গাড়ী ছাড়ছে না দেখে সুমিতা বলল, 'আজ কপালে কষ্ট আছে দেখছি। কখন ট্রেন ছাড়বে, কত বেলা হবে বেহালা পৌঁছতে কে জানে? আজ কিন্তু বেশী দেরী হলে আমাকে বেহালায় পৌঁছে দিয়ে মামার বাড়িতে দুপুরে খেয়ে তুমি মেসে যাবে।' সুমিতার কথায় অভিরূপ বলল, 'তার মানে আজ সারাদিন আমার পড়াশুনা নষ্ট!' 'ওঃ কেবল পড়াশুনা আর পড়াশুনা। পড়াশুনা ছাড়া জীবনে যেন আর কিছুই নেই। বই ছাড়া যেন আর কোন দিকে চোখ ফেরাতে নেই?' বলে

সুমিতা অর্থপূর্ণ অভিমানী দৃষ্টি নিয়ে অভিরূপের মুখের দিকে তাকাল সুমিতার কথার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল অভিরূপ। তার দিকে দিচ্ছে না, তার সঙ্গে গল্প করছে না, সুমিতা যেমন চায় সেরূপ ব্যবহার করছে না, তাই সুমিতার অন্তরের অন্দরে অভিমানের মেঘ জমা হয়েছে। এ কথাগুলি তারই বহিঃপ্রকাশ বুঝে তার চোখের দিকে সোজাসুজি চেয়ে, 'একথা কিন্তু ঠিক হল না, যখন যেদিকে দৃষ্টি দেবার সময় হবে, প্রয়োজন হবে, তখন ঠিক সেই দিকেই দৃষ্টি দেব বা দিয়ে থাকি এটা নিশ্চয় জানিস,' বলে প্রসঙ্গটা সামান্য পরিবর্তন করে অভিরূপ আবার বলল, 'এই দ্যাখ্ না, যে মুহূর্তে নিজেদের অধিকার বজায় রাখবার প্রয়োজন বোধ হল অমনি ধান কাটবার জন্য জমিতে নেমে গেলাম, বিপ্লব করে এলাম।'······কথা শেষ করে সে হাসতে লাগল। একথা শুনে সুমিতার মনে-মনে সামান্য রাগ হল, কারণ সে অভিরূপকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তবু অভিরূপ যে তার দিকে যথেষ্ট নজর দিচ্ছে না, এবং একজন প্রেমিকের মতো ব্যবহার করছে না এই রকম চিন্তা করেই একটু আগের কথাগুলো বলেছিল, কিন্তু অভিরূপ যে ইচ্ছা করেই প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করে দিল সেটা বুঝে সুমিতা আর কথা না বাড়িয়ে জানালার ভিতর দিয়ে বাইরে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখ ঘুরিয়ে বাইরে তাকানো দেখে অভিরূপ বলল, ভোজবাড়ির নেমন্তন্ন খেতে যাবার আগে কাপড় পরা নিয়ে ঝগড়া করলে ভোজটাই মাঠে মারা যায় জানিস তো?' এ কথার অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে সুমিতা শালীন ঝঙ্কারে বলে উঠল, 'দরকার নেই আমার ভোজ খাবার?' 'তবে আমি নেমে অন্য কম্পার্টমেণ্টে যাই? বলে অভিরূপ নড়েচড়ে সীট থেকে উঠে দাঁড়াতেই সুমিতা তার ডান হাতের আঙ্গুলগুলো ধরে টেনে তাকে আবার বসিয়ে দিয়ে বলল, 'কি হচ্ছে কি? সব সময় দুষ্টুমি? চুপ করে বসে আমার সঙ্গে একটু গল্প কর না। তুমি পাশে থাকতে একা-একা চুপ করে বসে থাকা যায়? প্লীজ তুমি কিছু বল, আমি শুনি।' অভিরূপের সামান্য সান্নিধ্য

লাভের জন্য, তার কণ্ঠের উচ্চারিত দু-চারটি শব্দ শোনবার জন্য সুমিতার অন্তর সর্বদাই ব্যাকুল হয়ে থাকে, তাই এতক্ষণ তৃষ্ণার্তা চাতকীর মত পাশে বসে বর্দ্ধমান থেকে মেমারী পর্যন্ত এইটুকু রাস্তার মধ্যে বার-বার বই থেকে মুখ তুলে-তুলে অভিরূপের মুখের দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছিল।

তার সঙ্গে কথা বলার জন্য সুমিতার অন্তর যে ভিতরে-ভিতরে কতটা ব্যাকুল, কতটা উন্মুখ হয়ে রয়েছে সেটা বুঝে এবার অভিরূপ বলল, 'দ্যাখ সুমি, এবার বাড়ি গিয়ে অন্ততঃ একটা উপকার হয়েছে।' 'কি?' বলে প্রশ্নাকুল দৃষ্টিতে সুমিতা অভিরূপের মুখের দিকে চাইলে। সে বলল, 'মন্টু, গোবরা, ফটিক এদের মধ্যে একটা পরিবর্তন যে ঘটেছে সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল এবং প্রয়োজনে ওরা যে দুলো দীনের বিরুদ্ধে লড়বে এটাও বোঝা গেল।

'ওদের কিছু বিশ্বাস নেই, আজ দুলো-দীনের সঙ্গে হয়ত সামান্য মতের অমিল হয়েছে বা দুলো-দীনে আর বিশেষ কিছু পাইয়ে দিতে পারছে না বলে আমাদের হয়ে লাঠি ধরতে এসেছে। আবার কালই যদি দুলো-দীনে হুজুগ তোলে যে দৈনিক তিন কেজি চাল আর বার টাকা মজুরী পাইয়ে দেব, আয় আমাদের সঙ্গে যোগ দে, তখন ওরা আবার ঐ দুলো-দীনের সঙ্গেই ভিড়বে এবং ক্রমে-ক্রমে আর চাষের লোকই পাওয়া যাবে না।' বলে সুমিতা থামতেই অভিরূপ বলল কথাটা তুই যা বলেছিস তা বর্ণে-বর্ণে সত্যি, কারণ যার খেতে সারাদিন পাঁচ'শ গ্রাম চাল লাগে তার হাতে দু-কেজি কি তিন-কেজি চাল পড়লে স্বাভাবিকভাবেই পরদিন তার আর কাজ করার প্রয়োজনই থাকবে না।......একই পরিবারে তিন-চার জন মজুর থাকলে বার-চোদ্দ কেজি চাল দৈনিক ঘরে ঢুকবে আর হঠাৎ স্বাচ্ছন্দ্যের জোয়ারে গা ভাসিয়ে তারা অলস হয়ে পড়বে এবং কাজ করতে চাইবে না, তাছাড়া গ্রাম-জীবনে মজুর শ্রেণীর মানুষের সব থেকে পরম শত্রু যে নেশা, সেই তরল গরলের বাড়-বাড়ন্ত হবে এবং মজুরদের পরিবারগুলো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে সর্বনাশের শেষ ধাপে পৌঁছবে।

একদিকে কৃষি শ্রমিকের অভাব ঘটবে, সময়ে চাষবাস হয়ে উঠবে না, অন্যদিকে তারা আয়াসী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠবে।

অভিরূপের কথা শুনে সুমিতা কিছুটা উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, 'তাই বলে তো তারা না খেয়ে আমাদের সেবা দান করতে পারবে না, তাছাড়া সারা বছর সব জায়গায় সমস্ত মজুরের সব সময় কাজও থাকে না, যখন কাজ থাকবে না তখন তারা কি খাবে? কোথায় যাবে?' 'হ্যাঁ এটাও একটা বিরাট সমস্যা। এর জন্যই উপরওয়ালাদের উচিত বারমাস প্রত্যেকটি মজুর যাতে কাজ পায় আগে তার ব্যবস্থা করা'; বলে অভিরূপ থামতেই সুমিতা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, 'সেটা কিভাবে করা যেতে পারে?' অভিরূপ বলল, 'আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ, সুতরাং সেচের এবং সারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে পারলে বারমাসই কৃষিশ্রমিকরা কাজ পেতে পারে এবং এই শ্রমিক ও চাষী দু'পক্ষকে নিয়ে সৎভাবে যুক্তি করে উপরওয়ালারা সব সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজতে পারেন।'

এ সময় সুমিতা তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'কিন্তু এদেশে তো তা কোনদিনই হয় না। কল-কারখানার ক্ষেত্রে দেখছ না, ইউনিয়ন করে আরও দাও আরও দাও রব তুলে আদায় করতে-করতে আদায়ের কায়দা ও ভঙ্গীগুলো এমন একটা স্তরে পৌঁছেছে যে, মালিকরা অবশেষে কারখানা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে আর মাঝখান থেকে ঋণবাবদ দেওয়া ব্যাঙ্কের টাকাগুলো বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। সরকার কোন কারখানা অধিগ্রহণ করলে ভরতুকি দিতে-দিতে সরকারী অর্থভাণ্ডার শূন্য হয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই যেন-তেন প্রকারেণ মালিকদের টাকা সরানোর খেলাটা ধরা পড়ে যাচ্ছে কিন্তু তাদের সেই টাকা টেনে বার করবার এবং কারবারে পুনর্বিনিয়োগের ব্যবস্থা উপরওয়ালারা করাতে পারছেন না, ফলে বন্ধ কারখানার মালিকের হয়ত অন্নজলের অভাব কোনদিনই ঘটছে না কিন্তু বেকারত্বের অন্ধকার নরকে নিমজ্জিত শ্রমিকদের আত্মঘাতী হওয়া ছাড়া কোন উপায়ই থাকছে না, কারণ আন্দোলনকারী

জঙ্গী শ্রমিকদের অন্য কোন মালিক নতুন করে আর কাজ দিতে ভরসা পায় না। তাই শ্রমিকরা একবার বসে গেলে তার পক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ানো খুব শক্ত হয়ে পড়ে। চাষবাসের ক্ষেত্রেও আমাদের দেশে কলকারখানার মত অবস্থা ঘটতে চলেছে। সর্বত্র সমান বৃষ্টি হয় না; সারের দাম সরকারের উপর নির্ভরশীল, সরকারী কারখানায় ফাঁকিবাজ শ্রমিক ও পরিচালকদের জন্য যে লোকসানটা হয় সেই লোকসান পুষিয়ে নিতে গিয়ে সারের দাম বাড়াতে হচ্ছে। যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রমিকদের শ্রম-মূল্য-বৃদ্ধি ঘটছে, চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বহুতর দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে, সেগুলি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই, কিন্তু চাষী ফসলের দাম বাড়াতে গেলেই নীচু থেকে উপরের স্তর পর্যন্ত সবাই হাঁ হাঁ করে উঠছে অথচ ন্যায়তঃ যে দামটা পাওয়া উচিত সে দামটা চাষী না পেয়ে মাঝখান থেকে দালাল ও ফড়েরা পেয়ে যাচ্ছে আর এই মধ্যম শ্রেণীর তৎপরতার জন্য জনসাধারণকে পটল ছ'টাকা কিলো, আলু তিন টাকা কে. জি. হিসাবে কিনে খেতে হচ্ছে। এতে সর্বস্তরের মানুষেরই অসুবিধা হচ্ছে। উপরওয়ালারা কিন্তু সমস্ত বুঝেও না বোঝার ভান করে গদিতে বসে আরাম করে একই সঙ্গে ডুডু ও টামুক খেয়ে যাচ্ছে।' সাময়িক উত্তেজনার বশে এতকথা একসঙ্গে বলে সুমিতা থামল।

অভিরূপ তার মুখের দিকে একবার দেখে বুঝল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে-করতেও রাগে সুমিতার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেছে এবং সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে তার রাগ যে উপরওয়ালাদের প্রতি সেটা বুঝে নিজের অন্তঃস্থলে অনুসন্ধান করতে গিয়ে অভিরূপ দেখল তারও অন্তরে ঐ উপরওয়ালাদের প্রতিই ক্ষোভ ও ঘৃণা বহুদিন থেকেই সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। এই মুহূর্তে সুমিতা থামতে ধীরে-ধীরে সে বলে উঠল, 'সবই বাঁ-হাতের খেলা রে সুমি, সবই বাঁ-হাতের খেলা। উপরওয়ালাদের পকেটগুলো আজকাল ভীষণ লম্বা হয়ে গেছে, মানুষের সব দুঃখ-দুর্দশা বুঝে সে সমস্ত লাঘব করতে গেলে যে নিজেদের পকেট-বিহীন জামা পরতে হয়, কিন্তু পকেট বিহীন জামা

তো কোন উপরওয়ালাই পরে না……' অভিরূপের এ কথায় সুমিতা সত্যি-সত্যি রেগে গেল এবং বলল, 'হেঁয়ালী-টেঁয়ালী রেখে পরিষ্কার করে বল কি বলতে চাইছ ?' হাসতে-হাসতে অভিরূপ জবাব দিল, 'তুই বড্ড রেগে গেছিস, নাহ'লে ঠাণ্ডা মাথায় সামান্য চিন্তা করলেই আমার কথার অর্থটা ধরতে পারতিস। আমি বলছিলাম সবই টাকার খেলা, মানুষের ভাল করতে গেলে পাওনা করের টাকা আদায় করতে হয় এবং তাদের জন্য বরাদ্দীকৃত সমস্ত অর্থ যথাযথভাবে খরচ করতে হয়, তাহ'লে নিজেদের জামার লম্বা পকেটে নোটের বাণ্ডিল ঢুকবে কি করে ?

আজকাল সমষ্টির উন্নয়ণের কাজ করার চেয়ে আত্মোন্নয়ণের বা গোষ্ঠী উন্নয়ণের কাজ হচ্ছে অনেক বেশী। সমষ্টির দুঃখকষ্টের ভাবনার চেয়ে পারিবারিক এবং একান্ত ব্যক্তিগত সুখ, আনন্দ ও ভোগলালসার তৃপ্তির দিকেই উপরওয়ালাদের নজর বেশী। সমাজের মধ্যে এখনও দু-চারজন সৎ বা একনিষ্ঠ কর্মী আছেন, যাঁরা এই আজকের স্বার্থপরতা ও ক্রূরতার যুগেও মানুষের ভাল করতে চান কিন্তু স্বার্থপর কর্মবিরূপ ছিদ্রান্বেষী ও অর্থলোলুপ একশ্রেণীর মানুষের পাল্লায় পড়ে তাঁরাও কিছু করতে পারেন না বরং অবশেষে শঠতার ও চক্রান্তের শিকার হয়ে তাঁরা দুর্নামের অংশীদার হন কিংবা সৎ মনোবৃত্তিটাকে অন্তরের নিভৃতে নির্বাসিত রেখেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আর ঐ রকম লোক মারা গেলে তাঁদের জীবৎকালে যারা তাঁদের প্রতি শত্রুতা বা বিরোধিতা করেছে তারাই সবার আগে মালা হাতে নিয়ে ছোটে, মৌন-মিছিল করে এবং শোকসভায় কথার ফুলঝুরি ঝরায়।' 'আচ্ছা অভিরূপদা এ সমাজে এই অবস্থাটা আর কতদিন চলবে বলতে পার ?' বলে সুমিতা নিজের মাথাটা নীচু করে দু-হাতের তালুতে নিজের মুখটা লুকোয়। 'কিরে লজ্জায় ঘৃণায় ক্ষোভে মুখ লুকোচ্ছিস ?' বলে তার বাঁ হাতের কব্জিটা ধরে হাত টেনে নামিয়ে মুখের দিকে তাকাতেই অভিরূপ দেখতে পেল সুমিতার ডাগর দু'টো চোখের কোল বেয়ে তখন বড় বড় অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে।

তার এ অবস্থা দেখে অভিরূপ বুঝতে পারল সুমিতা ভিতরে ভিতরে দেশ ও দেশের মানুষকে কত ভালবাসে। সকলের ভাল থাকার ভাবনা সকলকে ভাল রাখার ভাবনাই তার চোখে জল এনে দিয়েছে। সুমিতার মত হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ মেয়ে দেশের ও জন্য হয়ত এভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে কুলকিনারা না পেয়ে নির্জনে বসে কাঁদে। তার নিজের মতো কত ছেলেই হয়ত দেশমায়ের এ অবস্থা দেখে প্রতি মুহূর্তে একটা বিরাট পরিবর্তনের আশা করে, কিন্তু বছরের পর বছর তারা হতাশ থেকে হতাশতর হয়ে পড়ে। অভিরূপ নিজের মনেই হঠাৎ আত্মগতভাবে আউড়ে উঠল, 'কে দেখাবে পথ? কে তুলে ধরবে আলো? কবে? কবে? কবে?' তার আপনমনে বিড়বিড় করা দেখে সুমিতা প্রশ্ন করল, 'কিছু বলছ অভিরূপদা?' কিছুটা উষ্ণ বাতাস বুকের গভীর থেকে বের করে অভিরূপ বলল, 'কি আর বলব বল! বলাবলি তো অনেকেই অনেকদিন ধরে করছেন। এদেশের মানুষের জন্য সাহিত্য কাঁদে, শিল্প চোখ মোছে, কিন্তু কে শুনছে কার কথা? যাদের শোনা উচিত তারা ব্রাউন-সুগারের নেশায় নেশাগ্রস্তের মত বুঁদ হয়ে আছে। তাদের এই কুম্ভকর্ণের নিদ্রা কে ভাঙ্গাবে বল! দেশের জন্য আজ বড্ড প্রয়োজন আমার ঐ শকুন বেঁটে আর শকুন বীরের মত নির্ভয় শ্যেন-দৃষ্টি-সম্পন্ন ও বিদ্যুতের মত তৎপর একদল টগবগে তরুণ যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের হাতে তুলে নেবে মানুষের ভাল করবার ভার।' অনেকক্ষণ কথা বলছে? তাই অভিরূপ এবার একেবারে চুপ করে গেল এবং সুমিতার মুখের পাশ দিয়ে জানালার বাইরে স্বপ্নাতুর দৃষ্টি মেলে শীতের রুক্ষ অংশতঃ শস্যহীন মাঠের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখের এই আচম্বিত পরিবর্তন লক্ষ্য করে সুমিতাও নীরব হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে গাড়ি চলতে শুরু করে প্রায় ব্যাণ্ডেল এসে পড়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যাণ্ডেল থেকে ছেড়ে গাড়ি হাওড়ার দিকে ছুটতে

লাগল। সারাটা রাস্তা সুমিতা ও অভিরূপ নিজেদের মধ্যে আর একটি কথাও বলল না; দু'জনের মনের ভিতর শুধু নানা চিন্তার জট বাঁধা-খোলা হতে থাকল।

অবশেষে বেলা প্রায় বারটা নাগাদ ট্রেন চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াতেই সুমিতা উঠে দাঁড়িয়ে অভিরূপকে বলল, 'চল আজ আমার মামার বাড়িতে স্নান-খাওয়া সেরে বিকেলে মেসে আসবে।' অভিরূপ বলল, 'বেহালা যেতে প্রায় দেড়টা বেজে যাবে, বরং মেসে গেলে আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।' 'প্লীজ অভিরূপদা, প্লীজ' বলে অভিরূপের ডান হাতটা নিজের ডান হাতেধরে এমন অনুনয়ের ভঙ্গী করল যে, সে আর 'না' বলতে পারল না, বরং সুমিতার সঙ্গে চলতে-চলতে বাসে উঠে এক সময় বেহালায় তার মামা সতীনাথবাবুর বাড়ি এসে পৌঁছল।

বাড়িতে ঢুকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই অভিরূপ একে-একে সতীনাথবাবু ও তাঁর স্ত্রী সুরুচি দেবীকে প্রণাম করল। সে প্রণাম করে মাথা তুলতে না তুলতেই পর-পর তিনটি ছেলেমেয়ে অভিরূপকেও প্রণাম করে পাশে দাঁড়াল। সুমিতা তাদের উদ্দেশে এই হলেন অভিরূপদা, কি এইবার সাধ মিটল তো?' বলে পর পর তিনজনের গালে একটু করে টোকা দিয়ে তাদের আদর করল। 'সাধ মিটল মানে?' বলে অভিরূপ সুমিতার দিকে চাইতেই সুমিতা হাসতে-হাসতে 'আঃ, এটাও বুঝলে না! ওরা ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট বয় দেখে নি, তাই আমার উপর হুকুম ছিল অভিরূপদাকে একদিন যেমন করে হোক এ বাড়িতে আনতেই হবে, এবার বুঝছ!' বলে সুমিতা আবার হাসতে থাকল এবং সঙ্গে-সঙ্গে সুরুচি, শুধু-শুধু ছেলেমেয়েদের দোষ দিচ্ছিস কেন মা? আমরা দু'জনেও তো তোকে কতদিন বলেছি, অভিরূপকে নিয়ে আসতে, দেখবার সাধ তো আমাদেরও ছিল'; বলে অভিরূপের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন 'আজ আমাদের কি সৌভাগ্য বাবা, তোমার মত ছেলেকে কাছে পেয়েছি, নাও এখন জামা-কাপড় ছেড়ে হাতে-মুখে জল দাও, আমি

একটু মিষ্টি জল নিয়ে আসি,' বলে আপত্তি করার কোন সুযোগ না দিয়ে তিনি বের হয়ে গেলেন।

সুমিতা অভিরূপকে মামার ঘরের পাশে একখানা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল এবং মামার একটা ধুতি ও একটা তোয়ালে এনে তার হাতে ধরিয়ে দিল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই অভিরূপ বুঝল মানুষ মানুষকে কতখানি ভালবাসলে এতটা আন্তরিক হতে পারে! কারণ স্নান করে বাথরুম থেকে বের হয়েই সে দেখতে পেল তার পরনের জামা কাপড় গেঞ্জী আণ্ডারওয়ার এমন কি রুমালটি পর্যন্ত এর মধ্যে কেচে উঠোনের তারে শুকোতে দেওয়া হয়ে গেছে। অভিরূপ সুরুচির উদ্দেশে একবার অনুযোগ করে উঠল, 'এ কি মামীমা, দু-এক ঘণ্টার জন্য আবার ঐ ময়লা জামা কাপড়গুলো কাচতে গেলেন কেন?' সুরুচি বললেন, 'ঐ ময়লা জামা-কাপড়গুলো মেসে গিয়ে তো তোমাকে নিজে কাচতে হবে, তাই কেচে দিয়েছি।' 'ছিঃ-ছিঃ এ ভারী অন্যায়, সামান্য কয়েক মিনিটের পরিচয়ে······' অভিরূপের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুরুচি বললেন, 'তাই কি হয় বাবা, সামান্য কয়েক মিনিটের পরিচয় বলে কি মা ছেলের ময়লা কাপড়কে ঘৃণা করতে পারে! আমি যে তোমার আর একজন মা,' সুরুচির এ-কথার পর অভিরূপ নিজেই লজ্জা পেয়ে গেল, সে বুঝল, ইনি যেন আর এক শ্রীলেখা আর এক বেলা দেবী। মুহূর্তে সে মনে-মনে এই পরিবারের আপনজন হয়ে গেল এবং এই পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষও তার নিজের বাড়ির লোক বলেই বোধ হ'তে লাগল।

ওদিকে স্নান শেষ করে বাথরুম থেকে সুমিতার বের হতে একটু দেরী হ'ল, নিজের ঘরে গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে সে যখন খাবার ঘরে এসে ঢুকল তখন দেখল সবাই সেখানে নিজের-নিজের আসনে বসে তারই জন্য অপেক্ষা করছেন। ঘরে ঢুকেই সে, 'ছিঃ-ছিঃ আমার খুব দেরী হয়ে গেল, কি অভিরূপদা, তোমার খুব খিদে পেয়েছে?' বলে দুষ্টুমি করে হাসতে লাগল। তার দুষ্টুমি শুনে সতীনাথ বললেন, 'তোর পায় নি বুঝি? না পেয়ে থাকে তো একটু ঘুমিয়ে-টুমিয়ে

নিয়ে না হয় পরে খেলেই পারতিস ?' 'না বাবা, আমারও খুব খিদে পেয়েছে, এখন ঘুমোতে গেলে ঘুম আসবে না, বরং হাজার ছুঁচো পেটের ভিতরে ব্যায়াম শুরু করে দেবে ! বলে সুমিতা খেতে শুরু করে দিল। মজা করে বলা তার কথাগুলো শুনে ঘরের সবাই হেসে উঠল। খেয়ে উঠে মামার ঘরে গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই সেখানে সুমিতা ও মামাতো ভাইবোনেরা এসে জুটল এবং তাদের সঙ্গে গল্প করতে-করতে অভিরূপ একসময় তন্দ্রাভিভূত হল।

বেলা সাড়ে চারটের সময় সুমিতার ডাকে ঘুম ভাঙ্গতেই অভিরূপ বিছানায় বসে চোখ কচলাতে-কচলাতে দেখতে পেল মামীমার হাতে চায়ের ট্রে এবং সুমিতার হাতে এক প্লেট খাবার। সে বাইরে গিয়ে মুখেচোখে জল দিয়ে এসে মামীমার হাত থেকে শুধুমাত্র চায়ের কাপটা তুলে নিল দেখে মামীমা হাঁ হাঁ করে উঠলেন এবং প্লেট থেকে কিছু খাবার নিয়ে খেতে অনুরোধ করতে লাগলেন, কিন্তু অভিরূপ, 'এখন পেটে একেবারে জায়গা নেই, আবার পরে একদিন এসে খেয়ে যাব ; বলে চা-টুকু পান করে নিজের জামাকাপড়ের সন্ধান করতে লাগল। সুমিতা বলল, 'আর একটু বস না, এখনই যাবার অত তাড়া কিসের ?' অভিরূপ বলল, 'দ্যাখ সুমি, সারাদিন যথেষ্ট ফাঁকি দেওয়া হয়েছে আর না, এবার মেসে গিয়ে একটু পড়াশুনা করতে হবে।' সুমিতা জানে পড়াশুনার চিন্তা মাথায় ঢুকলে আর কোন কিছু দিয়েই তাকে আটকানো যায় না, তাই অভিরূপ এক্ষুনি চলে যাবে বুঝে তার মনটা ভিতরে ভিতরে বিদায়ের ব্যথায় মুচড়ে উঠল, তবু একবার ক্ষীণ আশায় অভিরূপের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'সন্ধ্যার পর একেবারে কিছু খেয়ে-দেয়ে গেলেই পারতে, আবার তো গিয়েই মেসের সেই......।' 'থাক থাক হয়েছে' বলে মাঝপথে অভিরূপ তাকে থামিয়ে দিতেই মামীমা অভিরূপকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'সুমিতা তো ঠিকই বলেছে বাবা, আমি সকাল-সকাল তোমার জন্য চাট্টি রেঁধে দেব তুমি খেয়ে-দেয়ে আট-টা নাগাদ যাবে, থাক না বাবা সন্ধ্যাবেলাটা আমাদের কাছে।' মামীমার কণ্ঠে যেন মিনতি ঝরে

পড়ল, সেটা বুঝে অভিরূপ মামীমার কাছে গিয়ে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে, 'ছিঃ মামীমা ছেলেকে কি ও-ভাবে অনুরোধ করতে হয়? আপনি হুকুম করলে পরে আবার আসব কিন্তু আজকে আর নয়, সামনে কয়েকমাস পরেই আমার পরীক্ষা, সুতরাং এখন পড়ায় ফাঁকি দিলে রেজাল্ট খারাপ হয়ে যাবে' ; বলে সে দ্রুত হাতে বাইরে থেকে সুমিতার এনে দেওয়া জামাকাপড়গুলো পরতে লাগল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সতীনাথবাবুকে প্রণাম ও ভাইবোনদের আদর করে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে পা বাড়াল। তার সঙ্গে-সঙ্গে সুমিতা ও তার মামাতো ভাইবোনেরা সকলেই বাসস্ট্যাণ্ড পর্যন্ত অভিরূপকে এগিয়ে দিতে এল। কিছুক্ষণের মধ্যে বাস এলে তাতে উঠবার আগে মুখ ঘুরিয়ে সুমিতার দিকে লক্ষ্য করতেই অভিরূপ দেখতে পেল তার দু-চোখের কোল বেয়ে বড় বড় বিন্দুতে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। অভিরূপ, 'আচ্ছা চলি' বলে সুমিতাদের দিকে হাত নেড়ে বাসে উঠে পড়ল আর ভারাক্রান্ত চিত্তে অন্তরে সহস্র কান্নার আবেগ চাপতে-চাপতে সুমিতা মামাতো ভাইবোনেদের নিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

ক্রমাগত দিন এগিয়ে চলছিল, কিন্তু মাসখানেক পরে হঠাৎ সন্ধ্যাবেলায় মেসে বর্দ্ধমান সদর ফৌজদারী আদালত থেকে এক সমন এসে হাজির। সমনটায় চোখ বুলিয়ে অভিরূপ বুঝল যে, কাটোয়া থানার ও. সি. মিঃ ধরের বিরুদ্ধে অন্য দুই কনেস্টবল হত্যার চেষ্টার জন্য মামলার সমন। ফরিয়াদী পক্ষে ছয়জন কনেস্টবলের নাম, ব্যাপারটা বুঝে অভিরূপ মনে-মনে হাসল। ভাবল তা'হলে চাকা ঘুরতে শুরু করেছে এবং ঠিক করে নিল সাক্ষ্য সে নিশ্চয় দেবে। সাক্ষ্যের দিন ফেব্রুয়ারীর ছয় তারিখ, মাঝে দিন দশেক সময় আছে। পরদিন ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে সুমিতার সঙ্গে দেখা করতেই জানতে পারল সে যা ভেবেছিল ঠিক তাই অর্থাৎ সুমিতাও সমন পেয়েছে। অতঃপর দু'জনে যুক্তি করে ফেব্রুয়ারীর পাঁচ তারিখে বাড়ী যাওয়া

ঠিক করল এবং ঐদিন সকালবেলায় দু'জনে যথারীতি বর্দ্ধমান লোকালে চেপে বসল।

বাড়িতে পৌঁছবার পর অভিরূপ ও সুমিতা জানতে পারল ঐ একই কেসের জন্য মুরারিবাবু, ফণীবাবু, ভৈরববাবু প্রভৃতি উপস্থিত সকলেই, এমন কি, মণ্টু ও তার দু-চারজন সাঙ্গোপাঙ্গও সাক্ষী আছে। তারা আরও জানতে পারল যে, ইতিমধ্যেই ও. সি. সাহেব বার-বার জীপ নিয়ে গ্রামে আসছেন এবং সাক্ষীদের কখনও অনুনয়-বিনয় করছেন, কখনও ভয় দেখাচ্ছেন যাতে তাঁর বিরুদ্ধে কেউ সাক্ষ্য না দেয়।

খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করে বিকেলে অভিরূপ এ ব্যাপারে নিজেদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য ফণীবাবুর বাড়িতে সকলকে হাজির হতে অনুরোধ করলে বেলা সাড়ে চারটে নাগাদ সকলে একে একে এসে সেখানে হাজির হলেন। ওখানে বসে সকলে মিলে যথাযথ সাক্ষ্য দেওয়াটাই সাব্যস্ত করল এবং এও ঠিক করল সকলে মিলে এক সঙ্গে না গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায়ে কোর্ট খুলবার আগেই বর্দ্ধমানে হাজির হতে হবে। ঘরোয়া সভা সেরে ঘরে ফেরার জন্য যখন উঠে দাঁড়িয়েছে ঠিক তখনই বোমা ফাটার বিকট একটা শব্দে সকলে চমকে উঠল। বোমার আওয়াজ মিলিয়ে যেতে না যেতে বাইরে রাস্তায় দুলো ও দীনের কণ্ঠস্বরে সবাই বুঝল দুলো ও দীনেকে ও. সি. ভয় দেখাবার কাজে লাগিয়েছে। তারা তখন চিৎকার করে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, 'যে শালা হারামীর বাচ্চারা বর্দ্ধমানে সাক্ষী দিতে যাবে তারা আর জ্যান্ত এ গাঁয়ে ফিরতে পারবে না, তাদের ঘরে শালা কালই আগুন লাগিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব, দেখি কোন শালা সাক্ষী দিতে যায়! দেখি কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে!' দুলো-দীনের এ কথায় অভিরূপ সুমিতা ও উপস্থিত অন্য সকলে পরিষ্কার বুঝলেন যে, আবার একটা বিরাট ঝামেলা হবে। বুঝেও সবাই কিন্তু সাক্ষ্য দিতে যাওয়াই মনস্থ করলেন এবং অভিরূপের অনুরোধে শুধুমাত্র ভিন্ন ভিন্ন দলে না গিয়ে একটা জীপ

ভাড়া করে সকলে একই সঙ্গে যাওয়া স্থির করলেন। অভিরূপের এ অনুরোধের কারণ যদি রাস্তায় কোন বাধা আসে তো সে সঙ্গে থাকলে বেঁটে ও বীর সেই বাধা সরিয়ে দেবে।

পরদিন সকালে যথারীতি সকলে গ্রাম থেকে জীপে চড়ে যাত্রা করে যেই গ্রাম প্রান্তে পাকা রাস্তায় উঠতে যাবে অমনি সাত-আট জন লোক লাঠি আর টাঙ্গী হাতে তাদের ঘিরে দাঁড়াল। ওদিকে বেঁটে ও বীর অভিরূপ জীপে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে তালগাছ থেকে জীপ অনুসরণ করে পাকা রাস্তার মাথায় এসে উড়ে বেড়াচ্ছিল। লাঠি আর টাঙ্গী হাতে লোকগুলির মধ্য থেকে দীনে বের হয়ে এসে বলল, 'খবরদার, জীপ যদি আর এক ইঞ্চিও এগিয়েছে তো সব কটাকে শেষ করে দেব, নাম শালারা, নেমে আয় জীপ থেকে, আজ সব শালাকে মাটিতে থুতু ফেলিয়ে চাটাব, আয় শালারা, নেমে আয় জীপ থেকে'; বলে সদর্পে হাতের লাঠিটা দিয়ে জীপের বনেটের উপর দড়াম করে এক ঘা বসিয়ে দিল। ভাড়ার জীপ, পাছে জীপওয়ালার ক্ষতি হয় তাই অভিরূপ ভিতর থেকে বলল, 'এ্যাই খবরদার, জীপটা নষ্ট করবে না, জীপওয়ালা গরীব মানুষ, পুরনো এই জীপটা কিনে নিজে চালিয়ে ভাড়া খেটে খাচ্ছে, ওর কি দোষ? ওর জীপ নষ্ট কর না, যা বলবার আমাদের বল।' 'কে রে ভেতর থেকে নেকচার ঝাড়ছে? সাইন-সিস্টের বাচ্ছাটা, না? আয় শালা বেরিয়ে আয়, দেখি কেমন বাপের বেটা, এই শালা সাইনসিস্টের বাচ্চাটাই যত নস্টের গোঁড়া,' কথাগুলো যখন দীনে বলছিল সেই সময়ে অভিরূপ জীপ থেকে নেমে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে নামতে দেখে সুমিতা ও অনুরূপও নামতে যাচ্ছিল, অভিরূপ হাত ইশারায় তাদের থামিয়ে দিয়ে দুলো দীনের কাছে গিয়ে বলল, এ্যাই, কি হচ্ছে কি?' 'দেখবি কি হচ্ছে'! বলে দুলোর এক সাকরেদ যেই টাঙ্গী উঁচিয়েছে অমনি সঙ্গে-সঙ্গে বেঁটে ও বীর দুদিক থেকে এসে একটা তার হাতে, আর একটা তার ডান চোখে ছোঁ মারতেই ভয়ে যন্ত্রণায় লোকটা টাঙ্গী ছেড়ে গ্রামের দিকে এক দৌড়। দুলো তখন তার হাতের তালুর মধ্যে লুকনো

একটা বোমা নিয়ে 'এই শালা শুকুনির বাচ্চা দুটোই যত নষ্টের গোঁড়া,' বলে শকুনদের দিকে ছুঁড়বে বলে যেই হাত ঘুরিয়েছে অমনি ঠিক তার গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা দীনের মুখে হাতটা লেগে বোমাটা ফেটে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে দারুন যন্ত্রণায় চিৎকার করতে-করতে দীনে মাটিতে পড়ে গেল আর দুলোর ডান হাতের কব্জির কাছ থেকে খানিকটা অংশ ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল। বোমার স্পিল্‌ণ্টারের দু-একটা টুকরো এসে জীপের ছাদে ও বডিতে লাগল, কিন্তু জীপের আরোহীরা সবাই অক্ষত রয়ে গেল। তাকে লক্ষ্য করে টাঙ্গী তুলতেই মুহূর্তের মধ্যে অভিরূপ বেশ কিছুটা দূরে সরে গিয়েছিল, তাই সেও অক্ষত রয়ে গেল।

ওদিকে আহত দুলোর সাঙ্গপাঙ্গরা তখন 'দীনেকে ইচ্ছা করে তুই মারলি, আজ শালা তোরই একদিন কি আমাদেরই একদিন' বলছে আর দুলোকে পিটুচ্ছে। এই গোলমালের সুযোগে অভিরূপ তাড়াতাড়ি জীপে উঠতেই গাড়ী ছেড়ে দিল। গাড়ী কিছুদূর এগোতেই ফনীবাবু বললেন, 'তুমি কি বাবা মন্ত্র জানো? ওঃ, শকুন দুটো যেন কৃষ্ণ-বলরাম! কত বার যে আমাদের বাঁচাল! শকুন-দুটোকে দেখেও এ-গাঁয়ের মানুষগুলোর শিক্ষা হয় না? ছিঃ ছিঃ।' মাস্টার-মশায়ের কথা শেষ হতেই সুমিতা বলল, 'শকুন দুটো না থাকলে যে আমাদের কি হত ভাবাই যায় না।' সারা রাস্তা সকলেই শকুনগুলোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ; তাদের গল্পেই মেতে রইল এবং বেলা প্রায় সাড়ে নটায় কোর্ট প্রাঙ্গনে হাজির হ'ল। বাড়ী থেকে স্নান সেরে এসেছিল, তাই এখানে একটা দোকানে ঢুকে সকলে একটু মিষ্টি জল ও চা খেয়ে এজলাস শুরুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

বেলা প্রায় সওয়া দশটা নাগাদ দেখা গেল ও. সি., মিঃ ধর তাঁর গাড়ী নিয়ে হাজির হলেন এবং গাড়ী থেকে নেমে চতুর্দিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে কিছু যেন খুঁজতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে তাঁর অভিপ্রেত বস্তু না পেয়ে হতাশ দৃষ্টিতে একবার অভিরূপদের দলটার দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে এগিয়ে অভিরূপের সামনে দাঁড়িয়ে

কঠোর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে কর্কশস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'কি ? গ্রাম থেকে আর কেউ আসে নি ?' 'আপনি কার কথা জিজ্ঞাসা করছেন বলুন তো ?' বলে অভিরূপ মিঃ ধরের চোখের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল সেখানে যেন রক্তের তৃষ্ণা ঝরছে। মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে সে পুনরায় বলল, 'দেখতেই তো পাচ্ছেন কারা সব এসেছেন,' 'আঃ ওদের কথা আমি জিজ্ঞাসা করি নি, অন্য আর কেউ এসেছে কি না তাই জানতে চাইছি,' বলে মিঃ ধর অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে ভ্রূ কোঁচকালেন।

বার-বার অন্য কেউ এসেছে কি না প্রশ্ন করতে থাকায় অভিরূপের মনে একটা সন্দেহের দোলা লাগল, তার মনে হল হয়ত তুলো-দীনেদের মিঃ ধরের পক্ষ নিয়ে সাক্ষ্য দিতে আসবার কথা ছিল কিন্তু তারা এখনও পৌঁছয় নি বলে ধর সাহেব বার-বার জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইছেন। কোর্টের লিষ্ট্ অনুযায়ী বেলা এগারটায় মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হবে, তাই উনি এত উতলা হয়ে পড়েছেন। ব্যাপারটা বুঝে অভিরূপের মনে-মনে হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু সে গম্ভীর হয়েই রইল, অবশেষে মিনিট কয়েক কেটে যাবার পর মিঃ ধর অভিরূপকে তার জীপের কাছে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেবার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন। অনুনয়-বিনয়ে যখন কাজ হল না তখন ধর-সাহেব অভিরূপকে বললেন, 'আপনাদের প্রত্যেককে আমি দু-হাজার করে টাকা দেব, আপনারা আমার ফেভারে সাক্ষ্য দিন না হ'লে আমার চাকরী চলে যাবে, ছা-পোষা মানুষ মশায়, ছেলে পিলে নিয়ে মারা পড়ে যাব,' বলতে বলতে তিনি অভিরূপের হাত দুটো ধরে ফেললেন। অভিরূপ আর একবার মিঃ ধরের চোখের দিকে সোজাসুজি চাইল এবং এখন দেখল একটু আগের দেখা সেই হায়নার দৃষ্টি সম্বলিত চোখের দুটো কোলে অশ্রুবিন্দু চিক্‌চিক্ করছে। অভিরূপের হাতে ধরে বার-বার অনুরোধ করে যখন বিশেষ সুবিধা হল না তখন একে-একে মুরারীবাবু, ফনীবাবু, সুমিতা, ভৈরব-বাবু সকলের কাছে গিয়ে হাতে ধরে-ধরে তিনি অনুরোধ করতে

লাগলেন আর অভিরূপ তাঁর পাশে-পাশে থেকে সমস্ত কথাগুলো তার জামার পকেটে রাখা একটা ছোট্ট টেপ-রেকর্ডারে রেকর্ড করতে লাগল। প্রথম থেকেই মিষ্টার ধরের সমস্ত কথা সে টেপে ধরতে শুরু করেছিল। কিন্তু শেষের দিকের কথাগুলো দারুণ কাজ দেবে ভেবে অভিরূপ সমস্ত অনুনয়-বিনয়, টাকার অফার দিয়ে সাক্ষ্য ঘোরানোর প্রচেষ্টা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো বেশ ভালভাবে রেকর্ড করল এবং রেকর্ড করা শেষ হলে সেখান থেকে দূরে গিয়ে রি-ওয়াইণ্ড করে টেপ বাজিয়ে শুনে এল যে, সমস্ত কথাবার্তা বেশ ভালভাবেই রেকর্ড হয়েছে। অভিরূপ এতক্ষণে মনে-মনে নিশ্চিন্ত হল।

বেলা ঠিক এগারটায় চতুর্থ বেঞ্চে সাক্ষ্য দান শুরু হল এবং একে-একে মুরারীবাবু, ফণীবাবু, ভৈরববাবু, অম্বুরূপের সাক্ষ্য নেওয়া শেষ হলে সুমিতার ডাক পড়ল। সুমিতা সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠতে এজলাসে উপস্থিত অন্য উকিলবাবুরা, বিরোধী পক্ষের উকিল, এমন কি জজ সাহেব নিজেও নড়ে চড়ে বসলেন, কারণ তার মুখের দিকে চেয়ে সকলেই যেন বুঝতে পারছিলেন এ মুখ অতি চেনা, এ মুখ যেন কোথায় দেখেছেন, কিন্তু কেউই ঠিক করতে পারছিলেন না যে, এ মুখ কোথায় দেখেছেন। কারও-কারও আবার নামটাও চেনাচেনা লাগছিল, কিন্তু শুধু তার দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া কারোরই কোন প্রশ্ন করবার অবকাশ নেই ; একমাত্র আসামী পক্ষের ও ফরিয়াদী পক্ষের উকিল দুজনই তাকে প্রশ্ন করতে পারেন তাই প্রথমে নিয়মানুযায়ী শপথ গ্রহণান্তে আসামী পক্ষের অর্থাৎ মিঃ ধরের উকিল মিস্টার বলাই পাত্র সুমিতাকে প্রশ্ন করলেন, 'কি নাম তোমার ?' উত্তর নেই, সুমিতা চুপ, শুধু চোখ ঘুরিয়ে একবার উকিলকে দেখে আবার চোখ নামিয়ে নিল। মিঃ পাত্র আবার প্রশ্ন করলেন, 'কি নাম তোমার ?' সুমিতা এবার উকিলের দিকে না তাকিয়ে জজসাহেবের দিকে ঘুরে তাঁকে প্রশ্ন করে বসল, 'ইওর অনার! আজকাল এল. এল. বি. পড়ানোর সময় ল-কলেজের অধ্যাপকগণ তাঁদের ছাত্রদের এজলাসে দাঁড়ানো ভদ্রমহিলাদের 'তোমার' বলে সম্বোধন করতে শেখান নাকি ?'

সুমিতার কথার খোঁচায় মিঃ পাত্র রাগে জ্বলে উঠলেন এবং সাক্ষীর কাঠগড়ার কাছে এসে কাঠের ব্যারিকেডে সজোরে থাপ্পড় মেরে ধমকে বলে উঠলেন, 'ধানের জমিতে কোমর বেঁধে কাস্তে হাতে ধান কাটে কোন্ ভদ্রলোকের মেয়ে ? তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে ?' সুমিতা এবার জজসাহেবের দিকে ঘুরে পরিষ্কার ইংরাজীতে বলল 'আই সীক ইওর প্রটেকশন্ ইওর অনার ? আই ও'ন্ট রিপ্লাই টু এনি কোয়েশ্চেন টিল দি লারনেড্ ল-ইয়ার বিহেভস্ প্রপারলি এণ্ড আস্ক কোয়েশ্চেনস্ উইথ প্রপার ম্যানারস্।' সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো দোহারা চেহারার শ্যামলা মেয়েটির মুখ থেকে মেমসাহেবের মতো ফর ফর করে ইংরাজী বেরিয়ে আসতে শুনে গোটা এজলাসে উপস্থিত সকলে তার দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন। চেয়ারে উপবিষ্ট জজসাহেবও হেলান ছেড়ে টেবিলের সামনে ঝুঁকে পড়ে তার দিকে তাকালেন এবং মিঃ পাত্রকে উদ্দেশ করে বললেন, 'মিঃ পাত্র, ভ্য লেডী সীম্স্ টু বি ওয়েল-কোয়ালিফায়েড এণ্ড কামস্ অফ্ এ নোব্ল ফ্যামিলি, প্লীজ আস্ক কোয়েশ্চন্স উইথ ডিগ্নিটি এণ্ড ম্যানারস্।'

ফরিয়াদী পক্ষের উকিল মি তালুকদার এতক্ষণ চেয়ারে বসে-বসে মজা দেখছিলেন, তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মিঃ পাত্র, নিন্, এবার শুরু করুন, আমার সাক্ষীর সময়ের অনেক দাম।' মি. পাত্র এবার সুমিতার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কতদূর পড়াশুনা করেছেন ?' 'শেষ হয় নি এখনও', বলে সুমিতা চুপ করে গেল। মিঃ পাত্র আবার বিরক্তির সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, 'আঃ কতটা শেষ করেছেন, মানে কি ডিগ্রী আপনার আছে তাই জানতে চাইছি ?' সুমিতা বলল, 'বি. এ.।' তার কথা শুনে মি. পাত্র সকলকে শুনিয়ে-শুনিয়ে স্বগতোক্তির মত করে বললেন, 'বাবা, বি. এ. তেই এই, না জানি এম. এ. পাশ করলে হাতে কটার মাথা নেবে ?' সুমিতার তাৎক্ষনিক উত্তর 'অন্ততঃ আপনার মত অভদ্র কিছু উকিলকে শাস্তি দেবার মত যোগ্যতা অর্জন করবার চেষ্টা করব এটা নিশ্চিত।' 'কি ? কি বললেন আপনি ?' বলে চিৎকার করে মিঃ পাত্র জজ সাহেবের দিকে

চেয়ে, ইওর অনার শুনলেন কত বড় স্পর্ধার কথা ? একটা অর্ডিনারী বি এ. পাশ মেয়ে এম.এ. পড়তে চান্স পেয়েছে কিনা তারও ঠিক নেই, তার বচন শুনেছেন ইওর অনার ? জজসাহেব বিরক্ত হয়ে মিঃ পাত্রকে বললেন, 'আপনি প্রসঙ্গ নিয়ে জেরা করুন, অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপারে যাচ্ছেন কেন ?' ওঁর কথা শেষ হতে না হতেই ফরিয়াদী পক্ষের উকিল তালুকদার সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে জজ সাহেবের উদ্দেশে বললেন, 'অবজেকশন্ ইওর অনার, মিঃ পাত্র সাক্ষীকে এজলাসে সর্বসমক্ষে ব্যক্তিগত ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় রত হয়েছেন, তাঁকে এই মুহূর্তে এ রকম প্রয়াস থেকে নিবৃত্ত হ'তে অনুরোধ করছি আর প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে দিচ্ছি আমার সাক্ষী সুমিতা সরকার বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষার সাম্মানিক ইংরাজীতে প্রথম স্থানাধিকারিনী, এই দেখুন তার প্রমান', বলে ব্যাগ থেকে এক বছর আগেকার খানছয়েক সংবাদপত্র মিঃ পাত্রের দিকে এগিয়ে দিলেন। সংবাদপত্রগুলো হাতে নিয়ে মিঃ পাত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত সুমিতার ছবি ও তার সংক্ষিপ্ত জীবনী পড়ে বুঝলেন যে, সুমিতা জীবনে কোন পরীক্ষাতেই সেকেণ্ড হয় নি। তাঁর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। এদিকে এজলাসে একটা গুঞ্জনধ্বনি উঠল, উপস্থিত সকলে, এমন কি, জজসাবেব এবং আসামীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান ও. সি, মিঃ ধর পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে বার-বার সুমিতার দিকে চাইতে লাগলেন। খবরের কাগজগুলো মিঃ তালুকদারের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে মিঃ পাত্র এবার নরম সুরে সুমিতাকে প্রশ্ন করলেন, ঠিক কি দেখেছিলেন, সেদিন ?' 'দেখেছিলাম দুটো শকুনকে মারতে গিয়ে মিঃ ধর গুলি করে তাঁর অধস্তন দুই সিপাহীকে আহত করেছিলেন।' সুমিতা থামতেই মিঃ পাত্র আবার প্রশ্ন করলেন, 'মিঃ ধর কিসের থেকে গুলি করেছিলেন?' সুমিতার উত্তর তাঁর সার্ভিস রিভলবার থেকে।' এমন সময় মিঃ পাত্র চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'আমি বলছি না, সর্ভিস রিভলবার থেকে নয়, আপনাদের মধ্যে থেকেই কেউ পাইপগানের গুলি চালিয়েছিলেন যে গুলি লেগে দু-জন কনেষ্টবল আহত হয়েছিল, ও. সি. মিঃ ধরকে খুব

দিয়ে থান পাহারা দিতে রাজী করাতে পারেন নি বলে কোর্টে দাঁড়িয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছেন। মিঃ পাত্রর কথায় সুমিতা হেসে উঠল এবং বলল, 'সিপাহীদের শরীরের ক্ষতের ফরেনসিক পরীক্ষা হয়েছে তো ? সেই রিপোর্ট কি বলছে ? তাছাড়া এফ. আই. আর করেছে পুলিশেরই অন্যলোক, এফ. আই. আর কি আমাদের বিরুদ্ধে হয়েছে ?'

সুমিতার এই ধরনের বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণী কথাবার্তায় মিঃ পাত্র দমে গিয়ে বুঝলেন একে আর জেরা করা বৃথা, সুতরাং তিনি জজসাহেবের দিকে ঘুরে, 'ছাটস অল ইওর অনার', বলেই আর একটা প্রশ্ন করবার জন্য হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে, 'ইওর অনার ওয়ান মোর কোয়েশ্চেন,' বলতেই জজসাহেব বললেন, 'য়্যালাউড'. এবং মিঃ পাত্র সুমিতার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এম. এ. পাশ করে আপনার কোন সার্ভিসে যাবার ইচ্ছা আছে ? 'ল পড়বার ইচ্ছা আছে নাকি ?' মিঃ তালুকদার এই সময় উঠে দাঁড়িয়ে, 'অবজেকশন ইওর অনার, এটা সাক্ষীর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, এ ধরনের প্রশ্ন......' ওদিকে তখন সুমিতার কণ্ঠস্বর মিঃ তালুকদারের কণ্ঠকে চাপা দিয়ে বলতে শুরু করেছে, 'নিশ্চয়ই পড়ব, তবে যে পেশায় অনর্গল মিথ্যা বলতে হয়, নির্দোষকে দোষী প্রমাণের জন্য এবং দোষীকে নির্দোষ প্রমানের জন্য নিজস্ব বিবেক এবং সততা পদে-পদে বিকিয়ে দিতে হয়, যে পেশায় উপরওয়ালাদের চাপের মুখে পড়ে আইনের ধারায় লড়াই করা ছেড়ে কাপুরুষের মত নৈতিক দায়িত্ব পালনে ভীত হয়ে উপরওয়ালাদের মন রাখা গোছের লড়াইয়ে নামতে হয় এবং একের দোষ অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বাহবা কুড়োতে হয় সেরকম পেশাকে জীবনে অবলম্বন করতে আমি ঘৃণা বোধ করি।'

সুমিতার কথায় এজলাসের সমস্ত উকিলের পিঠে যেন চাবুক পড়ল, মিঃ পাত্র ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, 'আবার আপনার মত মেয়েরা স্বামী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে বা গুণ্ডা দ্বারা ধর্ষিতা হয়ে যখন কোর্টে হাজির হয় তখন এই আমরাই বাঁচাই; তখন কিন্তু এই উকিল সাহেবরা ছাড়া

গতি থাকে না!' এ কথায় খুব এক চোট হেসে নিয়ে সুমিতা মিঃ পাত্রর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'আমার বিশ্বাস, আপনার মত উকিল বাবুরা সমাজের সত্যিকারের মঙ্গল করবার জন্য আইন পাশ করেন নি, করেছেন নিজস্ব ব্যক্তিগত ছাঁচের কিছু ইতর স্বার্থপর কুটীল মানুষকে তাদের শয়তানীবৃত্তি চালিয়ে যাবার জন্য রক্ষাকবচ তৈরী করে দিতে যেমন আজকের এই কেসে আপনি ঘুষখোর, সমাজের উপর উপদ্রবকারী, চোরগুণ্ডাদের প্রশ্রয়-দাতা কাটোয়া থানর ও. সি. মিঃ ধরকে বাঁচাবার তৎপরতায় নিজের বুদ্ধি-বৃত্তিকে কাজে লাগালেন যেটা নোংরা কাজ, আর স্বামী কর্তৃক নিগৃহীতা মেয়েদের কথা বলছেন? সে স্বামী কারা? এও আপনার মত ক্লীব পুরুষ মানুষরাই স্বামীত্বের অধিকারে এদেশে মেয়েদের নির্যাতনের সাহস পায়। ধর্ষিতারাই এদেশে জেলে বা রেসকিউ হোমে বছরের পর বছর বিনা বিচারে পচতে থাকে আর তাদের ধর্ষকরা আপনার মত উকিলবাবু-দের এবং ঐ ও.সি. মিঃ ধরের মত ঘুষখোর অফিসারদের হাতে টাকার বাণ্ডিল গুঁজে দিয়ে জঘন্য অপরাধ থেকে রেহাই পেয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় ও পরবর্তী ধর্ষণের পরিকল্পনা করতে থাকে। শিব শঙ্কর বাবুর মত দু এক জন ভিন্ন আপনাদের মত পুরুষ-প্রবরগন এ-দেশে এ-সমাজে মেয়েদের বাঁচাবার জন্য যে কতটা তৎপর ও উদার তা তো নিত্যই সংবাদপত্র পাঠ করে এবং লোকমুখে সবাই জানতে পারছে!' সুমিতার কথায় মিঃ পাত্র জ্বলে ওঠেন এবং তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ওঠেন, 'সাট আপ, ইট্স্ টু মাচ, ইউ হ্যাভ আটারড মেনি এ্যাবিউসিভ ল্যাঙ্গুয়েজ এগেনস্ট দ্য ল-প্রফেশন এণ্ড দ্য কোর্ট, আমি আপনার নামে মানহানির মামলা করব।

জজসাহেব এতক্ষন নিজের চেয়ারে বসে মুচকি মুচকি হাসছিলেন এবার তিনি বলে উঠলেম, 'মিঃ পাত্র, হোয়াই আর ইউ গেটিং ইরিটে-টেড? মেয়েটির কথাবার্তায় আপনি রাগ করছেন? আমার তো মনে হয় এই মেয়েটির মনের কথাই আজ আমাদের সমাজের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের কথা। আজকের সমাজে সামান্য দু-চারজন ব্যতীত

ল-প্রফেশনের বেশীর ভাগ মানুষই সমাজের চোখে অনেক নীচে নেমে গেছেন। আজকে ল-প্রফেশনের মানুষদের নিজেদের সংশোধন করবার সময় এসেছে। অনেক সময় জেনে বুঝে সমস্ত পয়েণ্টস্ হাতে থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র চাকরীর ভয়ে আমরা অনেক উপরওয়ালাকে শাস্তি দিতে পারি না, বেকসুর খালাস করে দিতে বাধ্য হই। আজকের এই কেসে দেখুন না সমস্ত সাক্ষীই আপনার মক্কেলের বিরুদ্ধে; তাঁর নিজেরই অধস্তন কর্মীরা এফ. আই. আর করেছেন অথচ আপনি এতক্ষণ ও. সি, কাটোয়াকে বাঁচাবার জন্য কি অপচেষ্টাই না করলেন? আপনিও সমস্ত ব্যাপারটা থেকে বুঝেছেন যে, ও. সি. কাটোয়া সম্পূর্ণ দোষী, অথচ···তা ছাড়া আজকাল মামলার উকিল-বাবুরা প্রায়ই গট-আপ ডকুমেণ্টস্, ফোর্জড্—ডকুমেণ্টস্ সাবমিট করেন কোর্টে, ফলে মামলা জট পাকিয়ে যায় এবং দীর্ঘায়ত হয়; যার জন্যই আজ দেশব্যাপী সমস্ত কোর্টে হাজার-হাজার মামলা ঝুলছে। অথচ উকিলবাবুরা বা পুলিশ প্রশাসন যদি সামান্য সততার সঙ্গে কাজ করেন তো বহু মামলাই কোর্ট পর্যন্ত আসে না, তার আগেই নিষ্পত্তি হয়ে যেতে পারে। আজ সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে একটি বাচ্চা মেয়ে বলল বলে আপনারা রাগ করতে পারেন, কিন্তু এই আপনারাই আবার উপরওয়ালাদের সম্বন্ধে যখন সমালোচনা করেন তখন ঐ বাচ্চা মেয়েটির মতই কথা বলেন। আমি তো মেয়েটির মুখ থেকে এতক্ষণ যা শুনলাম তাতে সত্য ছাড়া মিথ্যা কিছুই শুনলাম না। সুতরাং এক্ষেত্রে মানে লাগলেও ওঁর বিরুদ্ধে মান হানির মামলার প্রশ্নই ওঠে না। নিন এবার কাজ শুরু করুন, অন্য সাক্ষী ডাকুন,' বলে বিচারক মিঃ সুশোভন দত্ত থামবার আগে সুমিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইয়ং লেডি, ইউ মে গো।'

জজ-সাহেব থামতেই মিঃ পাত্র শেষ সাক্ষী অভিরূপ ঘোষকে ডাকতে আর্দালীকে নির্দেশ দিলেন। নিজের নামের হাঁক শুনে এজলাসের এক পাশে অপেক্ষমান অভিরূপ ধীরে-ধীরে কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল। গো-বেচারার মত ধুতি ও হাফ-সার্টে সজ্জিত দোহারা

চেহারার অভিরূপের সাক্ষীর কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে শপথ বাক্য পাঠ শেষ হতেই মিঃ পাত্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, 'কি বাবা, তুমি আবার কোন ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট বয় ?' অভিরূপের সপ্রতিভ জবাব, 'যে ইউনিভার্সিটিতে আপনি পড়েন নি, কিন্তু এর পরের প্রশ্ন করার সময় সম্বোধনটা সম্মানজনক না হলে উত্তর দেব না।' 'উত্তর দিতে তুমি বাধ্য', বলে মিঃ পাত্র হুঙ্কার ছাড়লেন। 'উঁহু উঁহু তুমি নয়, তুমি নয়, আপনি,' বলে মিঃ পাত্রর কথার উত্তরে কথাগুলি বলতে-বলতে অভিরূপ চোখ বড় করে তাঁর দিকে তাকাল এবং বলল, 'বাধ্য নই, উত্তর না দিলে বড় জোর উইটনেশ্‌কে হস্টাইল ডিক্লেয়ার করা যেতে পারে। নিন্ প্রশ্ন করুন কিন্তু তুমি তুমি করে নয়, আপনি আজ্ঞে করে।'

অভিরূপের কথায় মিঃ পাত্র মিঃ তালুকদারের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে প্রশ্ন করলেন, মাই লারনেড ফ্রেণ্ডের এ সাক্ষীটিও কি বিশ্ববিদ্যালয়ের হীরক-খণ্ড নাকি ?' মিঃ তালুকদার এ কথার উত্তরে আবার খান-দশেক পুরনো খবরের কাগজ মিঃ পাত্রর হাতে তুলে দিলে তিনি চোখ বুলিয়ে দেখলেন যে, সাক্ষী অভিরূপ ঘোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক রসায়নের প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থানাধিকারী। ওদিকে মিঃ তালুকদার তখন বলতে শুরু করেছেন, রিয়্যালি দিস বয় ইজ এ্যা পীস্ অফ প্লাটিনাম। নিন্ মিঃ পাত্র, বাজে না বকে আপনার আসল কাজ শুরু করুন।' ওদিকে কোর্টরুমে তখন বিস্ময়ের পর বিস্ময়। একই কেসে একই গ্রামের দু-দুটো হীরের টুকরো ছেলে-মেয়ে সাক্ষী দিতে এসেছে। উপস্থিত জুনিয়ার উকিলবাবু যারা কেস-আর্গুমেন্ট শুনবেন বলে আদালতে এসেছিলেন তাঁরা আর্গুমেন্টের কথা ভুলে তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বার-বার সুমিতা ও অভিরূপকে দেখতে লাগলেন এবং সমস্ত কোর্টরুমে গুঞ্জন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। গুঞ্জন উচ্ছ্বসিত হতেই জজ মিঃ দত্ত, 'অর্ডার অর্ডার' বলে বার-বার টেবিলে হাতুড়ী ঠুকতে লাগলেন। তাঁর হাতুড়ীর ধ্বনিতে মিনিট খানেকের মধ্যে কোর্ট-রুম শান্ত হ'ল। এরপর মিঃ

পাত্র অভিরূপের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তা মিঃ ঘোষ, আপনি সেদিন আপনার গ্রামের মাঠে কি দেখেছিলেন? মিঃ ধরকে গুলি চালাতে দেখেছিলেন?' 'হ্যাঁ' অভিরূপের ছোট্ট উত্তর। 'তা কোন চোখ দিয়ে দেখলেন যে মিঃ ধরই গুলি চালাচ্ছিলেন?' বলে মিঃ পাত্র অভিরূপের দিকে কটমট করে চাইলে অভিরূপ তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে নিজের চোখের দিকে ডান হাতের দুটো আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করে বলল, 'এই মুহূর্তে আপনি কটমট করে যেমন আমার দিকে চেয়ে আছেন ঠিক সেইরকম আমার এই দু-চোখ দিয়ে পরিষ্কার দেখেছি ও. সি, কাটোয়া মিঃ ধর, গুলি করে তাঁর দুই অধস্তন কর্ম্মীকে আহত করলেন।' 'মিঃ ধর তো আপনার ডাইরী অনুযায়ী আপনাদেরই প্রটেক্‌শন দিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু আজ আপনিই তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছেন?' বলে মিঃ পাত্র গলা নামিয়ে অভিরূপকে বললেন, 'জানেন তো ঈশ্বর অকৃতজ্ঞ মানুষকে ক্ষমা করেন না।' মিঃ পাত্রের কথায় অভিরূপ এজলাসের কাঠ ধরে হোঃ হোঃ করে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল এবং বলল, 'আপনি হাসালেন, একজন উকিল হয়ে আপনাকে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে মক্কেলকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হচ্ছে? আপনার মত উকিলেরা ঐ মিঃ ধরের মত ও. সি, মহোদয়গণ তারপর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মি. এস. আর. হাজরার মত উপরওয়ালাদের তাঁবেদারগণ কি ঈশ্বর মানেন? মানলে আগেভাগে ডাইরী করা সত্ত্বেও ডি, এম. কেন তাঁর নোটের সঙ্গে সাঙ্কেতিক চিহ্ন মারফৎ ও. সি. কে বুঝিয়ে দেন যে, এ কেসে প্রটেক্‌শন্‌ দেবার প্রয়োজন নেই? ও. সি. কেন সম্ভাব্য উপদ্রবকারীদের বিরুদ্ধে পূর্বাহ্ণেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি? ঈশ্বর! ঈশ্বরের কথা তাঁদের মুখেই শোভা পায় যাঁদের হৃদয়ে মনুষ্যত্বের অণুমাত্র বোধও জাগ্রত আছে, যাঁদের অন্তরে নৈতিকতার সামান্যতম অংশও অবশিষ্ট আছে।' 'আপনার এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন কথাটার অর্থ ঠিক বুঝলাম না, একটু বুঝিয়ে বলুন তো মিঃ ঘোষ' বলে মিঃ পাত্র অভিরূপের দিকে চেয়ে থাকেন। অভিরূপ তখন পকেট থেকে

ডি. এম. এর কাছে লিখিত ডাইরীর উপরে ডি-এম-এরই দেওয়া নোটের শেষে একটি ছোট্ট শূন্য দেখিয়ে 'এই দেখুন, এই জিরো শব্দটার অর্থই হল—পুলিশ এ্যাকশন স্ক্যাড বি জিরো, অথবা পুলিশ স্ক্যাড নট টেক এনি এ্যাকশন্ ইন দিস ম্যাটার, কি মিঃ ধর? তাই না?' বলে অভিরূপ আসামীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান মিঃ ধরের দিকে চাইল। অভিরূপ চাইতেই মিঃ ধর মাথাটা সামান্য নীচু করে নিলেন। একটা বিশ-একুশ বছরের ছোট্ট ছেলের মুখ থেকে এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ শুনে মিঃ তালুকদার ও বিচারক মিঃ দত্ত প্রায় একই সঙ্গে তাঁর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে বসেন, 'ইজ ইট ট্রু মিস্টার ধর? সাধারণ আইন-কানুন রক্ষার ক্ষেত্রেও আজকাল সাঙ্কেতিক চিহ্ন মারফৎ ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয় নাকি?' মিঃ ধর চুপ করে আছেন দেখে উপস্থিত সকলে ধরে নিলেন অভিরূপের অভিযোগ সত্য এবং মিঃ দত্ত মিঃ পাত্রকে পুনরায় জেরা চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন।

মিঃ পাত্র এবার বললেন, 'তা হলে আপনি একটু আগে বললেন মিঃ ধরই গুলি চালিয়েছেন, তিনি জবরদস্তি আপনাদের ধান কেটে নিয়ে যাবার বিরুদ্ধে প্রটেক্শন্ দিতে যান নি; কিন্তু হঠাৎ তিনি ওখানে গেলেন কেন?' এ কথার উত্তরে অভিরূপ বলল, 'এ কথার উত্তর তো আপনার মক্কেলই দিতে পারেন'। অভিরূপের এই বিদ্রূপাত্মক কথায় মিঃ পাত্র ধমকে উঠে বললেন, 'আঃ এ কথার উত্তর তো আপনার পেটের ভিতর সাজানো, বলুন, আপনাকে উত্তর দিতেই হবে।' অভিরূপ মিঃ জাস্টিসের দিকে একবার চেয়ে মিঃ পাত্রর উদ্দেশে বলল, 'আপনি ভুল করলেন আমার পেটের ভিতর খাবার সাজানো থাকে কথা নয়, কথা সাজাই আমি মাথার ভিতরে।' 'আঃ মিঃ ঘোষ বিরক্ত করবেন না, যা বলছি তার উত্তর দিন, বলুন কেন তবে মিঃ ধর ওখানে গিয়েছিলেন?' বলে মিঃ পাত্র আবার অভিরূপকে উত্তর দিতে নির্দেশ দিলে অভিরূপ বলল, 'নেহাতই শুনবেন? শুনুন তাহলে মিঃ ধর আমাদের প্রটেকশন্ দিতে যান নি, গেলে

দাঙ্গার অনেক আগেই যেতে পারতেন, উনি গিয়েছিলেন দুলো-দীনের কাছে ফায়দার ভাগ নিতে।' 'ফায়দার ভাগ? সেটা আবার কি রকম?' বলে মিঃ পাত্র সব জেনেশুনেও না জানার ভান করে অভিরূপের দিকে চেয়ে থাকেন।

অভিরূপ বলতে থাকে, 'হ্যাঁ ফায়দার ভাগ, কারণ মিঃ ধর ডাইরীতে লেখা দিন ও সময় অনুযায়ী ভালই জানতেন যে, অমুক দিন অমুক সময় ধান কাটা শুরু হবে, ধান কাটা শুরু হলে দুলো-দীনেরা মারামারি শুরু করবে, মারামারি করে জোর করে ধান কাটতে গিয়ে দু-চার জন আহত হবে বা তাদের লাশ পড়তে পারে তাই সেই লাশ পড়ার সূত্রে বা কারও আহত হওয়ার সুযোগে দুলো-দীনেকে ভয় দেখিয়ে কিছু রোজগার করা যাবে আর আমাদের কাছ থেকেও কিছু আদায় করা যাবে; কিন্তু ব্যাপারটা হয়ে গেল উল্টো। আদায় করতে গিয়ে তিনি নিজেই আজ আদালতের কাঠগড়ায়, আর ঐ মিঃ পাত্রর কথায় ঈশ্বর আছেন বলেই মিঃ ধর আজ কাঠগড়ায়। তবে সেই ঈশ্বর হচ্ছে দুটো শকুন যাদের নাম 'বীর' আর 'বেঁটে'। বীর আর বেঁটে না থাকলে আমরা তিন-তিনটে পরিবার সেদিন সবংশে নিধন হতাম।' এমন সময় বিচারক মিঃ দত্ত অভিরূপকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'আচ্ছা মিঃ ঘোষ, ঐ শকুনের ব্যাপারটা কি? এখানে পিটিশনেও দেখছি শকুনের কথা লেখা রয়েছে!' মিঃ দত্তর কথায় অভিরূপ তখন সমস্ত ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দিল। তার কথা শুনে গোটা আদালত কক্ষের উপস্থিত সকলে হৈ চৈ করে উঠল এবং মিঃ দত্ত-ও হেসে মন্তব্য করলেন-এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার! আপনিই বলুন, এটা কি নিছক গল্প বলে মনে হচ্ছে না?' 'নাঃ, ইওর অনার, এটা গল্প নয়, ও. সি, কাটোয়া মিঃ ধরকে ওঁর ডান কানটা কি ভাবে এমন হল, জিজ্ঞাসা করুন তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।' মিঃ দত্ত তৎক্ষণাৎ মিঃ ধরকে জিজ্ঞাসা করায় মিঃ ধর বললেন, মাস ছয়েক আগে একটা মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় আঘাত লেগেছিল, তাই অপারেশন করে কানটা কিছুটা বাদ দিতে হয়েছে।'

মিঃ ধর এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আশে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর ছয়জন অধস্তন কর্মী ও মুরারী বাবু-ফনী বাবু প্রভৃতি অন্যান্য সাক্ষী সকলে প্রায় একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, মিথ্যা কথা ইওর অনার্ ঐ কানটা শকুনেতে টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে তাই রাগে উনি গুলি চালিয়ে শকুন মারতে গিয়েছিলেন, কিন্তু শকুন না মেরে গুলি করলেন নিজেরই দুই স্টাফকে।' সবাই এক সঙ্গে চিৎকার করে একই কথা বলে ওঠায় মিঃ দত্ত ব্যাপারটা সিরিয়স্ বুঝে ও প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে মিঃ পাত্রকে আবার জেরা করতে নির্দেশ দিলেন।

মিঃ পাত্র এবার অভিরূপের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার পূর্ববর্তী সাক্ষী তো একটু আগে এখানে দাঁড়িয়ে মিঃ ধরকে ঘুষখোর, চোর-গুণ্ডাদের প্রশ্রয়দাতা, সমাজের উপর উপদ্রবকারী বলে নানা বিশেষণে বিভূষিত করে গেলেন, আপনারও কি ওঁর সম্বন্ধে ঐ একই মত নাকি?' এ কথার জবাবে অভিরূপ বলল, 'সাক্ষী মিস সরকার যা বলেছেন আমার ধারণা তার থেকেও স্বচ্ছ। মিঃ ধর যে শুধু দু-হাতে ঘুষ নেন তাই-ই নয়, নিজেকে বাঁচাবার প্রয়োজনে তিনি হাজার-হাজার টাকা ঘুষ দিতেও প্রস্তুত, যেমন কোর্ট শুরু হওয়ার সামান্য পূর্বে উনি আমাদের ন-জনকে দু-হাজার টাকা করে মোট আঠারো হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন ঘুষ হিসাবে। সামান্য একজন ও. সি. এই দুর্মূল্যের বাজারে তাঁর নির্দ্ধারিত বেতন থেকে মাসে কত টাকা বাঁচাতে পারেন যে, মাত্র একটা কেস থেকে রেহাই পাবার জন্য গ্রাম্য, ইতর, চাষা-ভূষো কতকগুলো লোককে হাজার-হাজার টাকা দিতে পারেন? ঘুষ না নিলে এ-টাকা আসে কোথা থেকে?'

'কি যা তা বকছেন? ও. সি, আপনাদের ঘুষ দিতে চেয়েছিলেন?' বলে মিঃ পাত্র মিঃ ধরের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই মিঃ ধর চিৎকার করে ওঠেন, 'মিথ্যা কথা, ওটা একটা রাস্কেল, সমস্ত বানিয়ে-বানিয়ে বলছে। বে-আইনীভাবে ওর জমির ধান পাহারা দিতে রাজী হই নি বলে ওই-ই আমার সিপাহীদের সঙ্গে মিলে

মামলা করিয়েছে।' অভিরূপ এই সময় বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'আমি রাস্কেল ? মিথ্যাবাদী ? তাহলে আপনার এক্ষুনি বলা সমস্ত সত্য কথার বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপিত করি ?' কথাগুলো বলে হাসতে-হাসতে নিজের পকেট থেকে ছোট্ট টেপ-রেকর্ডার বের করে চালিয়ে দিতেই ঘণ্টা দুয়েক আগে সকলের কাছে ঘুরে-ঘুরে সাক্ষী না দেবার জন্য অনুনয়-বিনয়, ভয় দেখানো এবং প্রত্যেককে দু-হাজার টাকা করে ঘুষ দেবার চেষ্টার কথাগুলো পর-পর মিঃ ধরের কণ্ঠস্বরে বাজতে থাকল এবং কোর্টরুমে উপস্থিত সকলে হতবাক হ'য়ে তা শুনতে লাগলেন। বিচারক মিঃ দত্ত সমস্ত ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে অভিরূপকে হাত ইশারায় রেকর্ডারটি তুলে টেপটি খুলে কোর্টে জমা দিতে নির্দেশ দিলেন। অভিরূপ সঙ্গে-সঙ্গে পকেট থেকে আর একটি টেপ বের করে জজসাহেবের কেরানীর দিকে এগিয়ে দিল। অন্য টেপ দেখে মিঃ দত্ত অভিরূপকে প্রশ্ন করলেন, 'ওটা কি ?' অভিরূপ বলল, 'এইটি অরিজিনাল, আমি একটা ডুপ্লিকেটও রেকর্ড করে রেখেছি, এতক্ষণ সেইটিই বাজছিল। আমি অরিজিন্যালটিই কোর্টে জমা দিতে চাই।' অভিরূপের ব্যাপার-স্যাপার দেখে উপস্থিত সকলেই বেশ বুঝতে পারছিলেন যে, মিঃ ধরের পানিশমেণ্ট হবেই, সুতরাং তার ঐ দ্বিতীয় টেপটি বের করে দেওয়ায় আর কেউই আপত্তি করল না, বরং রেকর্ড যাতে কেউ নষ্ট করে দিতে না পারে সে জন্য সে যে দুটো টেপে রেকর্ড করেছে সেটা বুঝে তার বুদ্ধিমত্তার জন্য সকলে তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাইতে লাগল। মিঃ পাত্র ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে অভিরূপের দিকে চেয়ে গম্ভীর মুখে শুধু বললে, 'থ্যাটস্ অল, আই হ্যাভ নাথিং টু আস্ক মোর ? অভিরূপ মৃদু হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলল, 'সে কি ? শুধুমাত্র ঐ টেপের ভাষ্য অনুযায়ী মিঃ ধরের ঘুষ খাওয়া, ঘুষ দেওয়ার প্রচেষ্টা নিজের অপরাধের প্রমান লোপের চেষ্টা এবং সাক্ষীকে ভীতি প্রদর্শনের অপরাধের বিরুদ্ধে কতগুলো কেস করা যায় সে প্রসঙ্গ তুলবেন না ?' মিঃ পাত্র অভিরূপের দিকে না তাকিয়ে শুধু হতাশাব্যঞ্জক মন্তব্য

করলেন, 'হাও হরিবল্! ওঃ এনাফ অফ্ ইট্, এনাফ অফ্ ইট্, ইউ মে গো, ইউ মে গো নাও,' কথাগুলি বলে তিনি অলসভঙ্গীতে চেয়ারে বসে পড়লেন।

মিঃ তালুকদার এবার উঠে জজের দিকে চেয়ে ডিফেন্স উইটনেস্ ছুলাল মণ্ডলকে ডাকতে চাইলে জজসাহেব অনুমতি দিলেন, কিন্তু অনেক ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তাই পরবর্তী ডিফেন্স উইটনেস্ দীননাথ নন্দীর ডাক পড়ল, কিন্তু দীননাথের বদলে সুউচ্চ আদালত কক্ষে শুধু তার নামের উচ্চারণধ্বনির প্রতিধ্বনিত শব্দ সমষ্টিই ফিরে এল, অর্থাৎ সেও গরহাজির। তারপর একে-একে আরও জন আষ্টেক সাক্ষীর নাম ডাকা হল, কিন্তু কেউই উপস্থিত নেই দেখে মিঃ তালুকদার একবার চেয়ারে উপবিষ্ট মিঃ পাত্রর দিকে চেয়ে 'কাকে জেরা করব বাবা, তোমার কোন সাক্ষীই তো হাজির নেই দেখছি ; তা তুমিই ওঠ তোমার সঙ্গেই না হয় একটু গাল-গল্প করি,' বলে এবার তিনি বিচারক মিঃ দত্তর দিকে চেয়ে আইনের বিভিন্ন ধারা-উপধারা উল্লেখ করে বলতে শুরু করলেন, ইওর অনার, ফরিয়াদী পক্ষের সমস্ত সাক্ষীকে জেরা করে যা যা অনুধাবন করা গেল তা থেকে মিঃ ধরের দোষ স্পষ্টতঃই প্রমাণিত। একজন পুলিশ অফিসার শকুনের ভয়ে সন্ত্রস্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অধস্তন কর্মীদের দেহে গুলি চালালেন, অর্থাৎ পুলিশের চাকরী করার মত স্থৈর্য্য বা মানসিকতা নেই এবং লক্ষ্যও স্থির নেই, সুতরাং পুলিশের চাকরীতে বহাল থাকার মত অধিকার বা যোগ্যতা কোনটাই আপাততঃ এনার নেই। তাছাড়া সাক্ষী অভিরূপ ঘোষের জমা দেওয়া টেপের ভাষ্য অনুযায়ী মিঃ ধর যে ঘুষখোর, সমাজের উপর উপদ্রবসৃষ্টিকারী এবং অন্যায় ভীতি-প্রদর্শক ও প্রমাণ লোপে সচেষ্ট ছিলেন এ সমস্ত প্রমাণিত, সুতরাং এ রকম একজন লোক জনসেবামূলক বা জনহিতকর বা জনগণের শান্তি রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কোন পদে বহাল থাকতে পারেন না। তাই আইন অনুযায়ী মিঃ ধরকে পুলিশের চাকরী থেকে পনের বছরের জন্য সাসপেণ্ড করা হোক এবং সাজা

হিসাবে তাকে জেলে ভরা হোক, হুটস্ অল ইওর অনার,' বলে নীচু হয়ে বিচারককে অভিবাদন জানিয়ে মিঃ তালুকদার নিজের আসনে বসে পড়লেন। বিচারক মিঃ দত্ত বেলা তিনটার সময় রায় দেওয়া হবে জানিয়ে এজলাস ছেড়ে উঠে গেলেন। ইতিমধ্যে টিফিন আওয়ার হয়ে যাওয়ার জন্য কোর্টরুম্ খালি করে সকলে বের হয়ে গেল।

বেলা তিনটার সময় যথারীতি কোর্ট বসলে প্রথমেই জজ্ মিঃ দত্ত তিন হাজার দুইশত বাইশ নম্বর কেসের আসামী কাটোয়া থানার ও. সি, মিঃ ধরকে চাকুরী থেকে বার বছরের জন্য সাসপেনসনে রাখার অর্ডার দিলেন এবং সরকারী তহবিল থেকে মিঃ ধরের পাওনা বেনিফিটের টাকা থেকে দশ হাজার টাকা করে আহত দুই কনেষ্টেবল-দের প্রত্যেককে ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে নির্দ্দেশ দিলেন। তারপর অন্য কেসে হাত দিলেন।

রায়ের বয়ান শুনে অভিরূপ, সুমিতা, ফণীবাবু, মুরারীবাবু, ভৈরববাবু সকলেই মনে-মনে উল্লসিত হল এবং ও. সি, মিঃ ধরকে মুখ নীচু করে তাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখল। এর পর তারা সকলে মিলে জীপে উঠে সন্ধ্যা প্রায় ছটায় গ্রামে ফিরে এল।

গ্রামে এসে অভিরূপ শুনল ইতিমধ্যেই দুলো-দীনের সাঙ্গ-পাঙ্গরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছে, বিস্তর লোক আহত হয়েছে এবং দুলোর বোমার আঘাতে দীনে মারা গেছে; দুলোর অবস্থাও খুবই খারাপ। সঙ্গে-সঙ্গে অভিরূপ বুঝতে পারল একে তো বোমা ফেটে হাতটা উড়ে গেছে আর তার উপর প্রতিরোধবিহীন আহত অবস্থাতে পড়ে পড়ে মার খেয়েই দুলোর অবস্থা খারাপ হয়েছে। গ্রামের লোকে ইতিমধ্যেই দুরক'ম মন্তব্য আরম্ভ করেছে, কেউ বলছে বাঁচা গেল, এবার গ্রামটায় শান্তি ফিরবে, কেউ বলল আরে এতো হতেই হবে, শয়তান কি চিরকাল বাঁচে?'

অভিরূপ লোকের বলা সমস্ত কথাগুলো শুধু শুনতে লাগল আর ভাবতে লাগল—এই লোকগুলোই কয়েক ঘণ্টা আগেও

দুলো-দীনের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে সাহস পেত না অথচ কি আশ্চর্য! যেই দুলো-দীনে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে অমনি তাদের বিরুদ্ধে মন্তব্য। অভিরূপ কিন্তু মন্তব্যের ধারে কাছেও গেলে না। দুলো-দীনের জন্য তার দুঃখ হতে লাগল, কারণ দুলো-দীনের আজকের এই পরিণতির জন্য তারা নিজেরা যে মোটেই দায়ী নয় এ কথা অভিরূপ ভালই জানত। তাদের এই নির্মম পরিণতির জন্য দায়ী যে উপরওয়ালারা অভিরূপ মনে-মনে তাদের অভিসম্পাত করতে লাগল। ভাবতে লাগল উপর-ওয়ালাদের নিষ্ঠুর খেলার পরিণামে কত মায়ের কোল অকালে খালি হয়ে যাচ্ছে। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে একজন ছাত্র মারা গেলে তার মৃতদেহ নিয়ে শৃগাল-কুকুরের টানাটানি পড়ে যায়, একদল বলে আমার দলের ছাত্র, অন্য দল বলে,—না, আমার দলের ছাত্র। মৃতদেহটি তখন আর পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজনের থাকে না, হয়ে যায় বিশেষ এক গোষ্ঠীর। একদল মানুষ আর একদল মানুষের সঙ্গে মারামারি করে বিধ্বস্ত হচ্ছে, কিন্তু দুদল মানুষই যে এই দেশের এ কথাটা কেউ বুঝছে না। একদল ভাবছে অন্যদল যেন বিদেশী নাগরিক, তাদের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের যেন কোন প্রয়োজনই থাকতে পারে না, তাদের জন্য চিন্তা ভাবনার যেন কোন প্রয়োজনই নেই।

এইভাবে দশকের পর দশক নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম করে-করে গোটা জাতিটাই হীনবল হয়ে পড়েছে। অদূর অতীতের ইতিহাস বলছে ঠিক এইভাবেই নিজেদের মধ্যে লড়াই করে, একে অপরের বিরুদ্ধে গিয়ে, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের পিছনে লেগে নিজেরা হীনবল হতে-হতে একসময় গোটা ভারতবর্ষটাকেই বিদেশীদের হাতে তুলে দিয়েছিল, শেষে অশেষ নির্যাতনে নির্যাতিত হয়ে পুনরায় তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম চালিয়ে তবে স্বাধিকার ফিরে পেয়েছিল। আজ চতুর্দিকের ছবি দেখে মনে হচ্ছে যে, আবার সেই প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের হানাহানি মারামারির পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। ভাবতে-ভাবতে অভিরূপ ক্লান্ত চিত্তে বাড়ীতে ঢুকল এবং

জামাকাপড় পরিবর্তন করে হাতমুখ ধুয়ে একখানা মাছুর পেতে দাওয়ার একপাশে বসল।

সন্ধ্যা যখন উত্তীর্ণ এমন সময় ফণীবাবু ও সুমিতা এসে মুরারি-বাবুর বাড়ী ঢুকলেন। মুরারিবাবু যথারীতি ওঁদের চা-য়ে আপ্যায়িত করলেন এবং নিজে এসে তাঁদের পাশে বসলেন। চা পান করতে-করতে ফণীবাবু একবার অভিরূপের পিঠে এবং একবার সুমিতার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'এবার আর অন্য দিকে নজর নয়; পরীক্ষার আর মাত্র মাস আষ্টেক বাকী, এবার কলকাতায় গিয়ে ভাল করে পড়াশুনা কর তোরা। এ-গ্রামের ভবিষ্যত বলতে তোরাই। সারা পশ্চিমবাংলার মধ্যে এই কুরচি গাঁ-টাও যদি শান্তিধাম হয়ে ওঠে তবে আমরা জানব আমাদের জীবন সার্থক; সুতরাং তোদের ছু-জনকে বড় হতেই হবে।' এর পর সারাদিনের নানা ঘটনার আলোচনা হতে-হতে রাত্রি যখন দশটা বাজল তখন ফণীবাবু উঠে বাড়ীর দিকে রওনা হলেন এবং সুমিতাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী পৌঁছে দিলেন।

পরদিন আবার কলকাতা এসে হওড়া স্টেশন থেকে অভিরূপ যথারীতি তার মেসে এবং সুমিতা তার মামার বাড়ীতে পৌঁছল। এবার এসে থেকে ছুজনেই জোর পড়শুনা শুরু করল। দেখতে-দেখতে মাস ছয়েক কেটে গেল, পরীক্ষার আর দেরী নাই, ছু-জনের কারোরই সময় নেই, এমন কি, এই মাস ছুয়েকের মধ্যে অভিরূপ সুমিতার মধ্যে মাত্র বার ছুয়েক সাক্ষাৎ ঘটেছিল। ছুজনেই গভীর মনোনিবেশ সহকারে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, এমন সময় একদিন সন্ধ্যায় সুমিতার মামা সতীনাথবাবু অভিরূপের মেসে এসে পরবর্তী রবিবার ছুপুরে তাঁর বাড়ীতে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করে গেলেন। হঠাৎ নিমন্ত্রণ কিসের জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন—

ঐদিন বড় ছেলেটার দশম বর্ষের জন্মদিন ; প্রত্যেক বছর তো আর জন্মদিন পালন করা সম্ভব নয়, তাই এই দশম বর্ষকে বেছে নিয়ে ঐ দিনটা পালন করার আয়োজন করছেন। তিনি এও বললেন, উদ্যোগটা সম্পূর্ণ সুমিতার। তারই উৎসাহে পড়ে সতীনাথবাবু তাঁর কয়েকজন একান্ত বন্ধু-বান্ধবকে, সুমিতার দু-একজন ক্লাস-মেটকে এবং অভিরূপকে নেমন্তন্ন করেছেন। বার-বার তিনি অভিরূপকে যাবার জন্য অনুরোধ করে তার নিজের হাতে তৈরী চা পান করে বিদায় নিলেন। বাসস্ট্যাণ্ড পর্যন্ত তাঁকে পৌঁছে দিয়ে অভিরূপ মেসে ফিরে এল।

মেসে ফিরে মনে-মনে সুমিতার উপর তার প্রচণ্ড রাগ হ'ল, ভাবল পরীক্ষা সুরু হতে আর মাত্র মাস খানেক বাকী, আর উনি এখন মামাতো ভাই-এর জন্মদিন পালন করছেন! আবার মামার কথা অনুযায়ী সবটা সুমিতারই উদ্যোগে ঘটছে ; তার অর্থ জিনিষপত্র কেনা কাটা, কাজকর্ম্ম সব কিছুর দায়িত্ব সুমিতা নিশ্চয়ই নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে অর্থাৎ পড়াশুনায় প্রচণ্ড ফাঁকি দিচ্ছে। অভিরূপের অজান্তেই তার বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল এই ভেবে যে, সুমিতা এই সব করতে গিয়ে শেষে পরীক্ষার রেজাল্ট না খারাপ করে বসে।

রবিবার সকাল থেকে বেহালায় সতীনাথবাবুর বাড়ীতে উৎসবের আমেজ জড়িয়ে গেল। লোকজন আসবে বলে আগে থেকেই সুমিতা সমস্ত ঘর-দোর আসবাব-পত্র ঝেড়ে-মুছে, বিছানা-পত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে গোটা বাড়ীটাকে ঝকঝকে করে তুলেছিল। তার কাজ-কর্ম ও পরিশ্রম করার ক্ষমতা দেখে সতীনাথ-বাবু ও সুরুচি দেবী তো প্রশংসায় পঞ্চমুখ। খাওয়া-দাওয়ার নিমন্ত্রণ দুপুরে। সুতরাং বেলা দশটা এগারটার পর থেকেই দু-একজন করে অতিথি আসতে শুরু করলেন এবং বারটার মধ্যে অভিরূপ ব্যতীত সকলেই উপস্থিত হলেন। সকলকে প্রথম কিস্তিতে মিষ্টিমুখ করানো, চা সরবৎ ইত্যাদিতে আপ্যায়ন করার ফাঁকে-ফাঁকে সুমিতা একবার

করে সদর দরজার দিকে চোখ ফেলে দেখছিল, কিন্তু তার বহু আকাঙ্খিত ও প্রত্যাশিত মানুষটির কোন চিহ্ন না দেখতে পেয়ে অবশেষে একসময় প্রায় অশ্রু ছল-ছল চোখে মামীমার কাছে গিয়ে বলল, 'মামীমা, অভিরূপদা বোধ হয় এলেন না।' সুরুচি দেবী সুমিতার মনের কথা অনুধাবন করে যেই মুহূর্তে উচ্চারণ করেছেন, 'জানিস তো, ছেলেটা কি রকম বই-পাগলা, দেখগে হয়তো ভুলেই বসে আছে?'

সুরুচির কথা শেষ হতে না হতেই, 'কই, মামীমা কই, ...কই রে সুশান্ত, কোথায়?' বলে সুমিতার মামার বড় ছেলের নাম ধরে ডাকতে-ডাকতে অভিরূপ এসে বাড়ীতে ঢুকল। তার কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে সুরুচি ও সুমিতা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দেখতে পেলেন অভিরূপ ততক্ষণে দরজা থেকে ছোট্ট উঠোন পেরিয়ে বারান্দার কাছ পর্যন্ত এসে গেছে। তাকে দেখে সুরুচি, 'এস বাবা, উঠে এস,' বলে খাবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। মৃদু ভর্ৎসনার সুরে সুমিতার কণ্ঠ ছন্দিত হয়ে উঠল, 'যাক আসতে পারলে তা হলে? আমি তো ভেবেছিলাম তুমি বুঝি আর এলেই না।' একটু আগেই অভিরূপের দেরী দেখে সুমিতার চোখের কোল ঝাপসা হয়ে উঠেছিল, তখনও তার চোখ দুটো জলের ভারে চিক্‌চিক্ করছিল, সেদিকে তাকিয়ে অভিরূপ বলেই ফেলল, 'দেরী দেখে তুই কি কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিলি নাকি?' 'জানো তোমাকে শুধু কয়েক ঘণ্টা কাছে পাবার জন্য মামীমা আর আমি যুক্তি করে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি, কতদিন তুমি আসোনি বল তো? কতদিন তোমাকে দেখি নি বল তো?' শেষের দিকের কথাগুলো বলতে-বলতে সুমিতার গলাটা ভারী হয়ে এল। তার কণ্ঠস্বরে যেন চিরন্তনী প্রেমিকার দীর্ঘ বিরহের অবসানে প্রিয় সন্নিধানের আনন্দ-মিশ্রিত অভিমানের বেদনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

মির্জাপুর স্ট্রীটের মেস থেকে বাসে আসার সময় পরীক্ষার আগে এই সমস্ত অনুষ্ঠানে জড়িয়ে পড়ার জন্য সুমিতাকে কত বকবে বলে

ঠিক করে এসেছিল, কিন্তু সুমিতার উদ্বেগাকুল কণ্ঠস্বরের তোড়ে তাকে শাসন করবার সমস্ত অভীপ্সা অভিরূপের মন থেকে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সে সুমিতার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বুঝল, এই মুহূর্তে তার যেন কোন ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই, কোন চিন্তা নেই, কোন উদ্বেগ নেই, কোন দুঃখ নেই, কোন দৈন্য নেই। এই মুহূর্তে সে যেন পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে খুশী, সব থেকে সুখী এক নারী, যে তার চিরন্তন দয়িতকে কাছে পেয়ে সব দুঃখ—ব্যথা ভুলে অন্তরে আনন্দের জোয়ারে ভাসছে। অভিরূপ বসার ঘরে গিয়ে অন্যান্য অতিথিদের পাশে একখানি চেয়ারে বসল। সে আসন গ্রহণ করতেই সতীনাথবাবু উপস্থিত সকলের সঙ্গে অভিরূপের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে খাওয়ার ডাক পড়তেই সকলে উঠে ছাদের প্যাণ্ডেলে খাওয়ার জায়গায় গিয়ে পৌঁছলে সতীনাথবাবু বিভিন্ন রকমের সুস্বাদু খাবারে সকলকে আপ্যায়িত করতে লাগলেন। খাওয়ার জায়গায় বসে অভিরূপ সব কিছু দেখে বুঝল খুব ঘরোয়া ভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা মোট জন ত্রিশ, তার মধ্যে আবার জন দশেক শিশু ও কিশোর। খেতে বসার আগে অভিরূপ সুশান্তকে ডেকে গালে একটা টোকা মেরে, একটু আদর করে তার হাতে সুভাষ বসুর লেখা 'তরুণের স্বপ্ন' বইখানা উপহার দিলে সুশান্ত অভিরূপের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে তাকে জাপটে ধরল। অভিরূপও আদর করে তার মাথাটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল। সুমিতা সুরুচির সঙ্গে পরিবেশন করতে-করতে আড়চোখে সবই দেখল এবং বলল, 'এ্যাই সুশান্ত, বইটা কিন্তু আমি আগে পড়ব, তুই বইটা আমার ঘরে রেখে দিবি।' অভিরূপ বলল, 'না, কাউকে দিবি না, পরীক্ষার পরে ধীরস্থির হয়ে এই বই পড়তে হয়, পরীক্ষার আগে ঐ বই পড়লে আর পড়ার বই পড়তে ইচ্ছা করবে না আর তোর দিদির রেজাল্ট খারাপ হয়ে যাবে। বইটা এখন মামাবাবুর হাতে দিবি, পরীক্ষা হয়ে গেলে তবে বের করবি।'

তার এই কথা শুনে সুমিতা হাসতে-হাসতে বলল, 'এক বেলা পেলেই হবে, তা হলেই ও-বই শেষ। এক বেলায় পরীক্ষার পড়ার এমন কিছু ক্ষতি হবে না।' 'এক বেলা কি? তোর ব্যাপার-স্যাপার দেখে তো মনে হচ্ছে তুই অন্ততঃ গত দশ-দিন যাবৎ বইপত্র স্পর্শ করিস নি। এবার পরীক্ষায় যে তুই কি করবি তা তুই-ই জানিস' বলে অভিরূপ থামতেই সতীনথাবাবু বলে উঠলেন, 'না বাবা, মেয়ে আমার ফাঁকি মোটেই দেয় নি, কাজকর্মের শেষে রাত্রি বারটা-একটা-দুটো পর্যন্ত সুমিতা পড়াশুনা করে, আবার খুব সকাল-সকাল উঠে পড়তে বসে। পরীক্ষা ও ভালভাবেই দেবে, দেখো, ও এবার ফার্স্ট ক্লাস পাবে।' সতীনাথবাবুর কথা শুনে অভিরূপের মন কিছুটা আশ্বস্ত হ'ল কারণ সুশান্তর জন্মদিনের অনুষ্ঠানের কথা শুনে থেকেই তার ধারণা হয়েছিল যে, সুমিতা নিশ্চিতই পড়াশুনায় যথেষ্ট ফাঁকি দিচ্ছে। হঠাৎ অভিরূপের মনে কিছুক্ষণ আগে বলা সুমিতার 'শুধু তোমাকে ঘণ্টাকয়েক কাছে পাবার জন্য মামীমা ও আমি যুক্তি করে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি'—কথাটা মনে পড়ে গেল এবং সে ভাবতে লাগল, সত্যি! নারী হৃদয়ের অসীম রহস্যের কিনারা পাওয়া খুবই মুস্কিল। 'মামীমা ও আমি যুক্তি করে' কথাটা সুমিতা বললেও অভিরূপের মনে হল তাকে কাছে পাবার জন্য সুমিতাই হয়ত বিশেষ উৎসাহী হয়ে সুশান্তর জন্মদিনের এই অনুষ্ঠান করতে বলেছে, কারণ এর আগে সতীনাথবাবু এ বাড়ীতে আসবার জন্য বেশ কয়েকখানা পোস্ট কার্ড লিখলেও সে আসেনি। তাই তাকে নিমন্ত্রণ করবার মত একটা সামাজিক সুযোগ পেয়েই সঙ্গে-সঙ্গে সতীনাথবাবু নিমন্ত্রণ করে এসেছেন। বহু দিন অদর্শনের বেদনা বুকে নিয়ে সুমিতাও পড়াশুনার ফাঁকে-ফাঁকে মাঝে-মাঝেই সুরুচির কাছে বসে অভিরূপের সম্বন্ধে নানা গল্প করত, তাকে ভুলে থাকতে অসুবিধা হচ্ছিল, তাই তার মনের কথা বুঝেই মামীমাও সুশান্তর জন্মদিন পালনের ব্যবস্থা করতে মত দিয়েছিলেন। আজ এই মুহূর্তে অভিরূপকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে সকলেই খুশী।

হাসি আনন্দ ও উচ্ছলতার মধ্যে আহার সমাপন করে অভিরূপ অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে বসবার ঘরেই বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুরুচি তার হাতটা টেনে ধরে, 'তুমি আমার সঙ্গে এস,' বলে যে ঘরে এনে তাকে হাজির করলেন সে ঘরের মেঝেয় বসে সুশান্ত, তনু ও বিনু তিনজনে তখন লুডো খেলছিল।

ঘরে পা দিয়ে চতুর্দিকে তাকিয়ে অভিরূপ অবাক হয়ে গেল, কারণ এ-ঘরের সাজ-সজ্জা যেন একটু অন্য রকম। প্রতিটি জানালায় ডিপ-মেরুন রঙের পর্দা ঝুলছে যার প্রতিটিতে সাদা সুতোর হাতের কাজের বিভিন্ন নকৃশা। এক কোনে টেবিলের উপর ইংরাজী সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থকারের অন্ততঃ খান দশেক গ্রন্থ সাজানো, পাশের একটি বুক কেসে ভূবিদ্যা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস এমন কি, বেদ-উপনিষদ পর্যন্ত থরে থরে সাজানো। ঘরের এক পাশে এক-জনের শয়নোপযোগী একটি খাট, আর ঠিক তারই পাশে একটি ছোট্ট কাঠের ষ্ট্যাণ্ডিং আলনা। প্রথমেই বইয়ের টেবিলের উপর এবং পরে আলনার দিকে চোখ পড়াতে অভিরূপের বুঝতে বাকী থাকে না যে ঘরটা সুমিতার জন্যই বিশেষ রূপে বরাদ্দ। জানালার পর্দা, বিছানার চাদর ইত্যাদির উপর চোখ বুলিয়ে দেখতে-দেখতে অবাক হয়ে সে যখন ভাবছে পর্দার সীবন শিল্প কার,—সুমিতার, না মামীমার, ঠিক তখনই মামীমা অভিরূপের দৃষ্টি অনুসরণ করে হেসে, 'সব সুমি-মায়ের হাতের কাজ, আর শুধু এই ঘরেতেই নয়, তোমার মামাবাবুর ঘরে এবং বৈঠকখানা ঘরের পর্দাগুলোও ওরই তৈরী,' বলতে-বলতে সুরুচি সুমিতার খাটের পরিচ্ছন্ন বিছানাটাতেই হাত বুলিয়ে ঝেড়ে চলে যাবার আগে মেঝেয় খেলায় মত্ত ছেলেদের চেঁচামেঁচি না করার জন্য নির্দেশ দিয়ে অভিরূপকে বললেন, 'তুমি এই খাটে শুয়ে এখন একটু বিশ্রাম কর ; সুমিতার খাওয়া হ'লে নীচে নামবে, তখন সবাই মিলে গল্প করো।'

মামীমা চলে গেলে অভিরূপ বিছানায় বসে আর একবার ভাল করে চোখ বুলিয়ে চতুর্দিকে দেখতে থাকল, দেখতে—দেখতে তার

হঠাৎ নজরে পড়ল বুক কেসের উপরের সেলফের এক কোণে স্টীলের ফ্রেমে বাঁধানো কার যেন একটা ছোট্ট ছবি রয়েছে। খাটে বসে ঠিক বুঝতে না পারায় কাছে গিয়ে দেখে সে বিস্মিত হয়ে গেল, কারণ ছবিটা তারই ছবি। ভাল করে দেখে সে বুঝল তার বি. এস-সি. পরীক্ষার রেজাল্ট বের হওয়ার পরে যে খবরের কাগজে এ ছবি বের হয়েছিল সেই কাগজ থেকে কেটে সাদা বোর্ডের উপর সেটা পেষ্ট করে চারিদিকে নক্‌শা এঁকে সেটাকে স্টীলের ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঐ-ভাবে অতি যত্নে স্থমিতা বুক-কেসের এক কোণে রেখেছে। বুক-কেসের কাছ থেকে বিছানায় এসে সে সটান হয়ে শুয়ে পড়ল এবং দু-চোখ বন্ধ করে স্থমিতা কত কাজের হয়েছে এবং ভিতরে-ভিতরে স্থমি যে তাকে কত শ্রদ্ধা করে সেই ভেবে সে পুলকিত হ'ল। স্থমিতা যে মনে-মনে তাকে কামনা করে এ-কথা বর্দ্ধমানে পড়তে-পড়তে এবং বাড়ীতে নিরালা স্থযোগে বহুবার ইঙ্গিতে ও কথাবার্তার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সে সমস্তকে অভিরূপ কোনদিন প্রশ্রয় দেয় নি। সে-সব কিশোর বয়সের ও প্রথম যৌবনের স্বাভাবিক আকর্ষণের পরিণাম ও মোহ বলে এড়িয়ে গিয়েছে, কিন্তু আজ স্থমিতা তার ঘরের বুক-কেসের উপর নিভৃতে এক কোণে তার ছবি বসিয়ে যে তাকে হৃদয়মন্দিরের সিংহাসনেই বসিয়ে রেখেছে এ কথা অভিরূপের মত চৌখস ছেলের বুঝতে বিন্দুমাত্র দেরী হল না; গর্বে তার বুকটা ভরে গেল। এই মুহূর্তে স্থমিতার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে আদর করতে ইচ্ছা হল, কিন্তু অন্তরের সমস্ত ইচ্ছা দমন করে সে চুপচাপ বিছানায় পড়ে-পড়ে তারই কথা ভাবতে থাকল। স্থমিতার কথা ভাবতে-ভাবতেই কখন যে চোখ দুটো তার তন্দ্রালস হয়ে পড়েছিল সে নিজেই বুঝতে পারে নি। আচম্বিতে চোখের পাতার উপর কার শীতল হাতের স্পর্শে অভিরূপের তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। 'কে?' বলে পাশ ফিরতেই দেখে খাটের পাশে স্থমিতা দাঁড়িয়ে রয়েছে আর মেঝেয় প্রশান্ত, তনু আর বিনু গাল্‌চের উপর ঘুমিয়ে লুটোপুটি যাচ্ছে। অভিরূপ স্থমিতার একটা হাত ধরে তাকে খাটের এক পাশে বসতে

বললে সে ঘরের কোণে পড়ার টেবিলের সামনের চেয়ারটা খাটের পাশে এনে সেটায় বসল। বিছানায় শুয়ে-শুয়েই অভিরূপ তার মুখের দিকে আবিষ্ট চোখে দেখতে লাগল। সুমিতা যেন আগের থেকে অনেক বেশী ফর্সা হয়েছে ত্র-বছরের শহর-জীবনের পরিমার্জ্জন ও প্রসাধনে গ্রাম্য শ্যামলতা ঘুচে গিয়ে তার অঙ্গ গৌরবর্ণ ধারণ করেছে।

অভিরূপ তাকে নিবিড় করে দেখছে বুঝে সুমিতা বলল, 'কি দেখছ অমন করে?' 'তোকে, তোকে রে সুমি, তোকে দেখছি। তোকে যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। তুই যে এত ভাল সেলাই জানিস, এমন সুন্দর ঘর সাজাতে পারিস এ সব তো কোনদিন বলিস নি।', বলে অভিরূপ পুনরায় তার দিকে চাইলে সুমিতা বলল, 'যাঃ এ সমস্ত সব মেয়েই পারে, এগুলো আবার কোন কাজ হল? না, এর মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য আছে?' 'তোর বুক-কেসের উপর ডান-দিকের কোণে একটা সাঁইবাবার ছবি রয়েছে মনে হল, ওটা নিয়ে আয় তো দেখি।' অভিরূপের এ কথায় সুমিতা বুঝতে পারল অভিরূপ ছবিটা নিশ্চয়ই দেখে ফেলেছে এবং মজা করার জন্য এ কথা বলছে। ধরা পড়ে গিয়ে সে তাড়াতাড়ি উঠে ছবিটা লুকোতে গেল কিন্তু অভিরূপ ছবিটা কেড়ে নিয়ে তার হাতটা ধরে পুনরায় বিছানার পাশে এনে তাকে চেয়ারে বসাল। চেয়ারে বসেই সুমিতা পালানোর জন্য আবার উঠে পড়তে যাচ্ছিল কিন্তু মতলব বুঝে অভিরূপ জোর করে তাকে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'উঁহু, ওটি হচ্ছে না, পালানো চলবে না, আচ্ছা তুই কি পাগলী রে? সেই কোন ছোটবেলা থেকে এক সঙ্গে ঘুরেছিস, ফিরেছিস, খেলেছিস, বাসে-ট্রেনে যাতায়াত করেছিস, কতদিন থেকেই তো আমাকে দেখছিস, তবু আমার ছবি রেখেছিস কেন রে? তাও কোন ভাল ছবি নয়, খবরের কাগজের ফটোর কাটিং! কি ব্যাপার বল তো? পড়াশুনা ছেড়ে এই যে আনন্দ-উৎসব, সেলাই-ফোঁড়াই ফটো-সেবা এই সব করছিস এতে পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে না?'

'বাব্বাঃ সব সময় শাসন? পড়াশুনায় আমি কোনদিন ফাঁকি দিই না, আর ফটোর কথা বলছ? তুমি সত্যি করে বল তো মামা তোমাকে গত ক-মাসে মোট ক-খানা চিঠি দিয়েছিলেন? তুমি একবারও কি আসতে পারতে না? কেন আসো নি তুমি? তোমাকে অনেকদিন দেখতে না পেলে মন খারাপ করে, তাই কি করব?' বলে সুমিতা অনুযোগ করে উঠল এবং কথা বলতে-বলতেই তার দু-চোখের কোল ছাপিয়ে জল এসে গেল। অভিরূপ তার মনের অবস্থা বুঝে একবার শুধু মৃদুস্বরে বলল, 'তাই বলে ফটো? এতদিন ধরে আমাকে দেখেও……' তাকে থামিয়ে দিয়ে সুমিতা বলল, 'ও তুমি বুঝবে না, মানুষের দেখার ধারাটা ক্রমাগত বদলে যায়। এক-এক বয়সে চোখে এক-এক রকম রঙ ফুটে ওঠে, তাই তার চোখে একই জিনিস বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন রূপে ধরা দেয়।' সব বুঝেও অভিরূপ নেহাতই মজা করবার জন্য, 'আমি কি তোর জিনিস যে, আমার ক্ষণে-ক্ষণে পরিবর্তন ঘটছে আর তুই তাই নিয়ে রিসার্চে মেতেছিস?' 'তুমি তো আমার প্রাণহীন কোন দ্রব্যসামগ্রী নও, তুমি যে আমার প্রাণময় অমূল্য সম্পদ অভিরূপদা, তাই তোমাকে পাই না বলে তোমার ছবি নিয়ে হাসি, খেলি, শাসন করি, ভালবাসি, মিনতি করি, প্রার্থনা জানাই', বলে সুমিতা মুখে হাত চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সুমিতা যে ভিতরে-ভিতরে একেবারে ভেঙ্গে আছে, সে নিজে যে তার ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন এ-কথা বুঝে অভিরূপ ধীরে-ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে-দিতে বলল, 'আমি সবই বুঝি রে সুমি, কিন্তু সামনেই পরীক্ষা, এখন এ সব নিয়ে ভেবে যদি ভেঙ্গে পড়িস তাহলে পরীক্ষা দিবি কি করে? সুমি, প্লীজ এই দেড়টা মাস সব ছেড়ে তুই পড়াশুনাটাকে চেপে ধর, ফার্ষ্ট তোকে হতেই হবে। সুমিতা বলল, 'রেজাল্ট আমার ভালই হবে, কিন্তু তারপর! তারপরও কি তোমাকে পাব?' এ কথায় অভিরূপ শায়িত অবস্থা থেকে উঠে সিধে হয়ে বিছানায় বসে সুমিতার হাত দুটো নিজের কোলের উপর টেনে নিয়ে এক হাতে তার হাত দুটো

চেপে ধরে আর এক হাতে তার মাথা স্পর্শ করে বলল, 'এই তোকে ছুঁয়ে শপথ করছি তোকে না গ্রহণ করতে পারলে এই অভিরূপ ঘোষ জীবনে আর কোনদিন কাউকে গ্রহণ করবে না আর কথা দিচ্ছি সময় ও সুযোগ হওয়া মাত্রই তুই আমায় যে আসনে বসিয়েছিস ঠিক সেই মূর্ত্তিতেই পাবি।' 'আঃ বাঁচালে অভিরূপদা,' বলে সুমিতা দু-চোখের আয়ত দৃষ্টি দিয়ে অভিরূপকে দেখতে থাকল। এতদিন ধরে এত কাছ থেকে অভিরূপকে দেখেও যেন তার সাধ মেটে না; সারা-জীবন প্রতি মুহূর্তেই যেন ঠিক এইভাবে অভিরূপের চোখে চোখ রেখে তাকে দেখতে ইচ্ছা করে। আজ এই মুহূর্তে নারীর সমস্ত লজ্জা ভুলে স্থির দৃষ্টিতে সুমিতা সরকার তার আবাল্য সখা অভিরূপ ঘোষকে দু-নয়ন ভরে দেখতে লাগল।

সুমিতার বিহ্বল-ভাব দেখে তাকে স্বাভাবিক করবার জন্য অভিরূপ বলল, 'তোর বুক-কেসে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, বেদ, উপনিষদ সব রকমের বই দেখলাম, ওগুলো কি সব পড়ে ফেলেছিস? ওগুলো কি তোর, না, মামাবাবুর?' 'সবই মামা আমায় কিনে দিয়েছেন। আমার পড়ার নেশা দেখে একটা-একটা করে মামা সব এনেছেন আর আমারও সব শেষ।' সুমিতার কথায় অভিরূপ যেন চমকে উঠল, 'য়্যাঁ, বলিস কি! নিজের পড়ার বই ছাড়াও এই এত বই তুই পড়ে ফেলেছিস! সত্যি তুমি আমায় অবাক করলে?' 'কি বললে! অভিরূপদা কি বললে?' বিস্মিতা সুমিতা আবার শুনতে চাইলে অভিরূপ বলল, 'বললাম সত্যি তুমি আমায় অবাক করলে!' 'অভিরূপদা তুমি আমায় 'তুমি' বলে সম্বোধন করলে, ভুলে বল নি তো?' বলে সুমিতা আগ্রহাকুল দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলে সে বলল, 'নাঃ ভুলে বলিনি, জ্ঞানতঃই বলেছি এবং আজ থেকে তুমি বলেই সম্বোধন করব।' 'ওঃ অভিরূপদা, এক্ষুনি এই মুহূর্তে আমার বুকটা যদি চিরে দেখাতে পারতাম......' তার কথা শেষ হতে না হতেই অভিরূপ বলল, 'বুঝতে পারছি তোমার খুব ভাল লাগছে, খুব আনন্দ হচ্ছে, পরীক্ষায় ফার্স্ট না হতে পারলে কিন্তু......' 'অভিরূপদা প্লীজ,

প্লীজ অভিরূপদা, এখন কয়েকটা মিনিট অন্ততঃ পড়াশুনার কথাটা তুলো না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। তুমি দেখে নিও আমি ফার্স্ট হবই, এই কয়েকটা মিনিট অন্ততঃ আজকের এই আনন্দটা আমায় উপভোগ করতে দাও। আজ তুমি যে স্বীকৃতি আমায় দিলে এরপর আর মরতেও আমার দ্বিধা নেই······' বলতে বলতে সুমিতা তার মুখটা নামিয়ে এনে অভিরূপের দু-হাত নিজের হাতে নিয়ে নিজের গালে চেপে ধরল। সুমিতার এ অবস্থা দেখে অভিরূপের হঠাৎ মনে হল সে যেন নব জলধর আর সুমিতা যেন ময়ূরী তাই তার আনন্দ-বিহ্বল চিত্তকে সংহত করবার জন্য সে বলল, 'সুমিতা সংযমই কিন্তু মানুষের জীবনের সর্ব অবস্থায় প্রধান সুহৃদ।' এ রকম আনন্দের মহূর্তে অভিরূপের মুখ থেকে মৃদুস্বরে ধ্বনিত এই কটি শব্দ যেন আনন্দ-বিহ্বল সুমিতার পিঠে শাসনের চাবুক হয়ে নেমে এল। চকিতে অভিরূপের হাত দুটো নিজের গাল থেকে নামিয়ে সুমিতা চেয়ার থেকে উঠে, 'সত্যি তুমি পাষাণ অভিরূপদা, সত্যি তুমি পাষাণ,' বলতে বলতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বহুক্ষণ কেটে গেল সুমিতা আর এ ঘরে এল না, এদিকে বেলা প্রায় চারটে বাজল, গোটা বাড়ীটা নিস্তব্ধ নিঝুম, সকাল থেকে নানা পরিশ্রমের ঝক্কিতে ক্লান্ত সতীনাথবাবু সুরুচিদেবী নিজেদের ঘরে সম্ভবতঃ বিশ্রামরত, ছেলেমেয়েগুলোও এ ঘরের মেঝেতে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। অভিরূপ ঘরের আলনা থেকে নিজের শার্টটা তুলে গায়ে চড়িয়ে নিয়ে মেসে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে রইল। ধারে কাছে জাগ্রত কাউকে দেখলে অনুমতি নিয়ে বা বলে যাবে এই রকম চিন্তা করে বুক কেস থেকে একটা বই নিয়ে পড়তে থাকল। পড়তে পড়তে কখন যে বইয়ের মধ্যে ডুবে গেছে তা খেয়াল ছিল না, হঠাৎ মামীমার ডাকে তার ঘোর কাটল, চমকে উঠে বাইরে তাকিয়ে দেখল সন্ধ্যা হয়-হয় আর সুরুচি দেবী চা বিস্কুট হাতে নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। মামীমার হাত থেকে চায়ের কাপটা ও একটা বিস্কুট নিয়ে অভিরূপ তাড়াতাড়ি চায়ে চুমুক দিল। চা শেষ করে মামীমাকে জিজ্ঞাসা করে

জানল সুমিতা ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে গেছে। এটা যে সুমিতার পালিয়ে যাওয়া, ইচ্ছা করে অভিরূপকে কষ্ট দেওয়া সেটা বুঝে অভিরূপ নীরবে মামীমা, মামা ও বাচ্চাদের নিকট বিদায় নিয়ে চলে গেল।

দেখতে-দেখতে বাকী কয়েকটা দিন কেটে গেল এবং পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল। সুমিতার পরীক্ষা যদিও মাস খানেকের মধ্যে শেষ কিন্তু অভিরূপের থিওরি প্রাকটিক্যাল মিলিয়ে পরীক্ষা চলল প্রায় মাস-দেড়েক ধরে। পরীক্ষা দুজনেই খুব ভাল দিল। পরীক্ষার শেষ দিনে বেলা দুটো নাগাদ অভিরূপ পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে বেহালায় যাবে বলে চোদ্দ নম্বর বাসে উঠল। ভবানীপুর পর্যন্ত বাস ঠিকই এল কিন্তু হাজরার মোড় থেকে টালিগঞ্জ ফাঁড়ি পর্যন্ত বিরাট জ্যামে পড়ে বাস আর নড়তেই চাইল না, শম্বুকের চেয়ে ধীর গতি গ্রহণ করল ফলতঃ বিরক্ত হয়ে অধিকাংশ যাত্রীই নেমে হাঁটতে লাগল শুধুমাত্র বেহালা পর্যন্ত যাদের টিকিট সেইরকম কয়েকজন যাত্রী নিরুপায় হয়ে বাসে চুপ-চাপ বসে রইল। রোদে-গরমে ঘামতে-ঘামতে বসে থাকতে অভিরূপের খুবই বিরক্তি বোধ হচ্ছিল কিন্তু উপায়হীন হয়ে চুপচাপ বসে রইল। অবশেষে বেলা পাঁচটা নাগাদ বাস এসে স্ট্যাণ্ডে ঢুকতে বাস থেকে নেমে বত্রিশ নম্বর বেচারাম চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীটের উদ্দেশ্যে সে পা চালাল। মিনিট দশেক হেঁটে সে যখন সতীনাথবাবুর বাড়ীতে পৌঁছল তখন তার চোখ মুখ শুকিয়ে গেছে, তৃষ্ণায় বুকের ভেতরটা হু হু করছে।

বাড়ীর দরজায় এসে 'সুশান্ত' 'সুশান্ত' বলে ডাকতেই তার কণ্ঠস্বরে চমকিত হয়ে প্রায় একই সঙ্গে সুশান্ত, সুরুচি ও সুমিতা বারান্দায় বের হয়ে দেখল দরজায় দাঁড়িয়ে অভিরূপ। সুশান্ত তাড়া-তাড়ি ছুটে গিয়ে অভিরূপের হাত দু-খানা ধরে টানতে-টানতে তাকে নিয়ে বারান্দায় উঠে এল। অভিরূপ বারান্দায় সুরুচিকে প্রণামটা সেরে নিল। প্রণাম করে মুখটা তুলতেই সুরুচি বললেন, 'পরীক্ষার পড়া পড়ে ছেলের আমার মুখটা শুকিয়ে গেছে।' তিনি সুমিতাকে

তাড়াতাড়ি অভিরূপের জন্য সরবৎ ও জলখাবার দিতে বললেন। অভিরূপ বাড়ীতে পা দেওয়ার পর থেকে সুমিতা কোন উচ্ছলতাই প্রকাশ করল না, এমন কি. অভিরূপ কেমন আছে, পরীক্ষা কেমন হল এ প্রশ্নও করল না, শুধু নীরবে মামীমার হুকুম তামিল করতে থাকল এবং মিনিট পাঁচেকের মধ্যে একটা ছোট্ট ট্রেতে এক গ্লাস সরবৎ এবং এক গ্লাস সাদা জল এনে অভিরূপের সামনে দাঁড়াল। অভিরূপ তার দিকে চাইতেই সে নিজের দৃষ্টিটাকে পাশের জানালা দিয়ে বাইরে সরিয়ে দিল ; ভাবখানা এই, অভিরূপকে যেন সে এই প্রথম দেখছে। তার এই ভাবলেশহীন গম্ভীর নিস্পৃহ দৃষ্টি দেখে অভিরূপ প্রথমটায় সামান্য বিস্মিত হলেও কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মাস খানেক আগে তার নিজেরই সুমিতাকে দেওয়া হুঁশিয়ারী, 'সংযমই কিন্তু মানুষের জীবনের সর্ব অবস্থায় প্রধান সুহৃদ', কথাগুলো মনে পড়ে গেল এবং নিজের অজান্তে ঠোঁটের বাঁকে ঈষৎ হাসি ফুটে উঠল। অবস্থাটা পরিবর্তনের জন্য অভিরূপ সুশান্তকে বলল, 'তোদের বাড়ীর টিউবওয়েলে কি আজকাল গরম জল বেরুচ্ছে নাকি রে? সরবৎ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে মনে হচ্ছে, দেখ দেখ ট্রে-টাতেও যেন আগুন ধরে যাচ্ছে মনে হচ্ছে!' অভিরূপের কথার অর্থ সুশান্ত অনুধাবন করতে না পারলেও সুমিতার বুঝতে এতটুকু দেরী হ'ল না ; সে বুঝল তার গাম্ভীর্য ও নিরাসক্তি দেখে অভিরূপ ঠাট্টা করে বলতে চাইছে যে সুমিতা রাগে আগুন হয়ে আছে। বুঝেও সুমিতার চোখে মুখে কোন পরিবর্তন হ'ল না, সে ধীরে ধীরে একটা ছোট সেণ্টার-টেবিলের উপর সরবতের ট্রে-টা নামিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। মিনিট দশেক পরে একটা প্লেটে নানারকম ফল মিষ্টি সাজিয়ে নিয়ে পুনরায় ঘরে ঢুকে দেখল ট্রেতে রাখা সাদা জলের গ্লাসটা খালি কিন্তু সরবৎটা যেমন ছিল তেমনিই রয়েছে। একবার অভিরূপের মুখের দিকে তাকিয়ে খাবারের প্লেট ও আর এক গ্লাস জল টেবিলের উপর রেখে খালি গ্লাসটা নিয়ে সে বের হয়ে গেল।

মিনিট খানেকের মধ্যে সুরুচি এসে অভিরূপের পাশে সোফায়

বসে সরবৎটা পান করবার জন্য গ্লাসটা তুলে তার মুখের কাছে ধরলে বাধ্য ছেলের মত অভিরূপ সেটা পান করল। এরপর তার পরীক্ষা কেমন হ'ল সে খবর নিয়ে মামীমা পাশে বসে গল্প করতে করতে এক সময় খাবারের প্লেট-টা তার হাতে তুলে দিলে সে ধীরে-ধীরে খাওয়া শুরু করল। জল-যোগের সময় সুমিতা একবারও এ ঘরে আর ঢুকল না কিন্তু যেই মাত্র খাওয়া শেষ করে সে প্লেট-টা টেবিলে নামিয়ে রাখল অমনি সুমিতা আর একটা ট্রেতে করে তিন কাপ চা নিয়ে সেই ঘরে ঢুকল। অভিরূপের চা তার সামনে রেখে মামীমার হাতে একটা কাপ ধরিয়ে দিয়ে নিজে আর একটা নিল। চা-টা নিয়ে অভিরূপের থেকে অনেকটা দূরে একটা সিঙ্গল সোফায় সে বসল। চা খেতে খেতে অভিরূপ মামীমার সঙ্গে বহু কথা বলল কিন্তু তার একটিতেও সুমিতা যোগ দিল না। সে পূর্ব্ববৎ নিরাসক্ত ও নীরব রয়ে গেল। সুমিতার অভিমান হয়ে থাকতে পারে কিন্তু তাই বলে এত দীর্ঘক্ষণ যাবৎ এ রকম নির্বিকার থাকাটা অভিরূপের নিকট কিছুটা বিস্ময়কর বোধ হ'ল, কারণ সে জানত না যে সেদিনের সংযমী হতে বলাটা সুমিতার নারীত্বের প্রতি অবমাননা হয়ে গেছে।

নারী চিত্তের চাওয়া-পাওয়া, আশা-নিরাশা, ভাব-ভাষা সম্বন্ধে অভিরূপের কোন ধারণাই ছিল না, তাছাড়া সুমিতা যথেষ্ট সংযমী। অন্তরের আনন্দে উদ্বেল হয়ে শুধুমাত্র অভিরূপের হাত দুটো নিয়ে দূর থেকে নিজের গালে একবার চেপে ধরে তৃপ্তি পেতে চাওয়া যদি অসংযমের পরিচয় হয় তাহলে মনে প্রাণে অভিরূপকে চাওয়াটাও অসংযমেরই পরিচয়, এই ভেবে অভিরূপ চলে যাওয়ার পর সে রাত্রে সুমিতা দু-চোখের পাতা এক করতে পারে নি, দারুন মানসিক যন্ত্রণায় বিছানায় পড়ে সারারাত সে ছটফট্ করেছিল। অভিরূপের সাবধানবানী সুমিতার কানেই নয় প্রাণেও বেজেছিল, তার প্রেমময়ী পবিত্র আত্মাকে বিদ্ধ করেছিল, তাই আজ সে এরকম নিরাসক্ত, এরূপ ভাবলেশহীনা। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে অভিরূপ আড় চোখে কয়েকবার সুমিতার দিকে তাকাল কিন্তু সুমিতা

নির্বিকারভাবে চায়ে চুমুক দিয়ে চলেছে, সেখানে হাসি, ঔৎসুক্য বা আনন্দের চিহ্নমাত্র নেই দেখে অভিরূপ চা শেষ করে মামীমাকে উদ্দেশ করে, 'মামীমা, আমি আগামীকাল সকালে সাতটা পাঁচের ট্রেনে বাড়ী যাচ্ছি, এবার তাহলে চলি', বলে তাঁকে প্রণাম করে উঠে পড়তেই সুরুচি সুমিতার উদ্দেশে বললেন, 'তুইও তো কবে থেকেই বাড়ী যাব-যাব করছিস, তাহ'লে আগামীকাল অভিরূপের সঙ্গেই চলে যা।' মামীমার একথায় সুমিতা শুধু একবার ঘাড়টা হেলিয়ে সম্মতি জানাল, কিন্তু মুখে কিছুই বলল না। ভাবভঙ্গী দেখে অভিরূপ মনে-মনে ভাবল বড্ড পাজী হয়েছ, না, দাঁড়াও আজকের এই গাম্ভীর্যের এবং কথা না বলার প্রতিশোধ কাল দেব, সারা রাস্তায় জ্বালাব। মুখে কিছু না বলে অভিরূপ বাড়ী থেকে বের হবার মুখে রাস্তায় সতীনাথ-বাবুর সঙ্গে দেখা হলে মাথা নীচু করে প্রণাম করল এবং তাঁকে তার পরীক্ষার খবরাখবর দিয়ে সে বাসস্ট্যাণ্ডে এসে বাসে উঠল।

পর দিন সকালে হাওড়া স্টেশনে এসে দুটো টিকিট কেটে তাদের নির্দ্ধারিত স্থান বড় ঘড়ির নীচে না দাঁড়িয়ে অভিরূপ বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকল যাতে সুমিতা এসেই চট্ করে তাকে দেখতে না পায়। সুমিতা পৌনে সাতটা নাগাদ কাঁধে একটা সাইড ব্যাগ ও হাতে খান দুয়েক বই নিয়ে বড় ঘড়ির নীচে এসে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল এবং মাঝে-মাঝেই পিছন ফিরে ঘড়িটার দিকে তাকাতে লাগল। অবশেষে যখন প্রায় সাতটা, ঐ ট্রেনে যাওয়ার আশা ত্যাগ করে তখনও সে একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকল। ওদিকে অভিরূপও বুঝল চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে আর গাড়ী পাওয়া যাবে না। তবু সে দূরে দাঁড়িয়ে, তাকে না দেখে সুমিতা কি করে তাই দেখতে থাকল দেখতে দেখতে পাঁচ মিনিট কেটে গেল এবং সাতটা পাঁচের লোকাল বাঁশী বাজিয়ে চলে গেল, সব বুঝেও সুমিতা নিশ্চল হয়ে ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করতে থাকল এবং মাঝে-মাঝে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে এদিক ওদিক দেখতে থাকল।

দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ সুমিতা লক্ষ্য করল একটা লোক

এসে প্রায় তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল এবং তার কানের কাছে মুখ নিয়ে কিছু বলে সামান্য দূরে সরে গেল। প্রথমটায় সুমিতা বুঝতে পারল না, লোকটার দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল তার বয়স অন্তত বছর পঁয়তাল্লিশ হবে, তাকে দেখে······বাঙালী বলেও মনে হল না। সুমিতা তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আবার অভিরূপের সন্ধানে এদিক ওদিক দেখতে থাকল কিন্তু সেই লোকটা আবার মিনিট খানেক পরে সুমিতার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাংলায় বলল, 'কি গো খালি আছে কি? দিন ভরকে লিয়ে যাবে হমার সঙ্গে, হমার সঙ্গে গাড়ী আছে, দেখো, যাবে তো সারাদিনকে লিয়ে খানাপিনা আর একশ' রূপিয়া দিবে, কি যাবে তুমি?'—এই সাত সকালে প্রকাশ্য জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে লোকটার কথাগুলো শুনে এবং তার সাহস দেখে সুমিতার রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল; সে সটান পায়ের এক পাটি চটি খুলে পটাপট করে লোকটার দু-গালে সজোরে কয়েক ঘা লাগাতেই সেখানে হৈ হৈ পড়ে গেল। দূর থেকে ব্যাপার বুঝতে না পেরে অভিরূপ সেখানে ছুটে এল এবং ঘটনা শুনে সে লোকটার জামার কলার চেপে ধরে প্রচণ্ড মারতে লাগল। অভিরূপ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে থেকে সবাই মিলে লোকটাকে এমন শিক্ষা দিল যে, প্রায় অর্দ্ধ-অচেতন অবস্থায় হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে-চাইতে লোকটা কোন রকমে সে স্থান ত্যাগ করল। আশে পাশে দাঁড়িয়ে কেউ-কেউ সুমিতার উদ্দেশেও দু-একটা কটুক্তি করছিল, বলছিল-'আজ কাল মেয়েগুলোও বেহায়া হয়ে গেছে, এই সাত সকালেই সেজেগুজে সব শিকার ধরতে বেরোয়।' সুমিতা এবার চিৎকার করে তাদের উদ্দেশে বলল, 'কই সাধু-যুধিষ্ঠিরের বংশ-ধরেরা কোথায়, যারা এতক্ষণ ফোড়ন কাটছিলেন, কই সাহস থাকে তো চলুন সামনেই ঐ পুলিশ আউটপোষ্টে, ঐখানে গিয়ে আমার নামে ডাইরী লেখাবেন, চলুন, কার কার হিম্মৎ আছে আমার পরিচয় জানতে চান তো চলুন।' পুলিশ আউটপোষ্টের কথা উচ্চারণ করতেই ব্যাপার না বুঝে যারা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ফোড়ন কাটছিল তারা যে-যার

সরে পড়তে লাগল এবং মুহূর্তের মধ্যে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল। তাদের পলায়ন দেখে সুমিতা চিৎকার করে বলে উঠল, 'বীর-পুরুষের দল সব গা ঢাকা দিচ্ছ কেন? কই চল সব।' তার এই চ্যালেঞ্জ শুনেও কেউ আর পিছন ফিরে তাকাল না, বরং দ্রুত স্থান ত্যাগ করে পালাল। সুমিতা আবার মন্তব্য করল, 'যত্ত সব কাপুরুষ ইতর কোথাকার!' ঘটনাটা থিতিয়ে যাবার পর সুমিতা ঘাড়টা তুলে দেখল ঘড়িতে তখন প্রায় সাড়ে সাতটা। আটটা কুড়ির আগে আর বর্দ্ধমান যাবার গাড়ী নেই, তাই অগত্যা অভিরূপের মতে সায় জানিয়ে তার পিছন-পিছন গিয়ে স্টেশনের কাফেটারিয়ায় ঢুকল।

অভিরূপ-সুমিতা যে টেবিলে এসে বসল ঠিক তার পাশের চেয়ারে প্রায় বছর ষাটেক বয়সের এক ভদ্রলোক এসে বসলেন এবং অযাচিত ভাবেই সুমিতার উদ্দেশে বললেন, 'তুমি যা করলে মা এখন প্রত্যেকটি বাঙলী মেয়েরই বোধ হয় এই-ই করা উচিত, তা না হ'লে আমাদের ঘরের মেয়েদের আর ইজ্জত থাকছে না। ভদ্রলোকের মেয়েরা পথেঘাটে সীন্ ক্রিয়েট করতে পারে না বলে সেই সুযোগে ঐ জানোয়ার গুলো যা নয় তাই করে বেড়াচ্ছে। তোমাকে অপমান করার সমস্ত ব্যাপারটা আমি লক্ষ্য করেছি এবং পিছনে দাঁড়িয়ে শুনেছি, কিন্তু কি করব বল, বুড়ো হয়ে গেছি, এ সমস্ত দেখে শুনে আমাদের মত বুড়ো মানুষদেরও রক্ত টগবগ করে ফুটে ওঠে, কিন্তু আজকালকার ছেলেগুলো ঘুরে দাঁড়িয়ে কেন যে প্রতিবাদ করে না তা বুঝতে পারি না। কয়েকটা বাঙালী ছেলে এক জোট হয়ে প্রটেষ্ট করলে এ সমস্ত জিনিস কখনও কলকাতায় ঘটাতে ওরা সাহস পায়? আমাদের ছেলেদের এখন সবেতেই ভয় আর গা বাঁচিয়ে চলবার ধান্দা, মরুক গে যার হচ্ছে সে ব্ঝুকগে, এই রকম মনোভাব। আরে এ-রকম করে কি বাঁচা যায়? কালকে তোরই বোন বা স্ত্রীকে যদি. কেউ ঐ রকম অপমানজনক প্রস্তাব দেয় তখন?' তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অভিরূপ, 'তখনও ওরা দূর থেকে দেখে সরে যাবে এবং ঝামেলা মিটলে কাছে এসে ন্যাকা সেজে বলবে ইস্‌স্

তাই নাকি, আমি থাকলে লোকটাকে একবার দেখে নিতাম,' বলে ভদ্র লোকের দিকে চেয়ে হাসতে থাকল। এমন সময় বেয়ারা এসে সামনে দাঁড়াতেই অভিরূপ তাকে অর্ডার দিতে যাচ্ছিল কিন্তু ভদ্রলোক তাকে নিরস্ত করে বললেন, 'বাবা, আমি আজ তোমাদের খাওয়াব, তোমাদের মধ্যে এখনও মর্যাদাবোধ আছে, মনুষ্যত্ব আছে বাঙালীত্ব আছে দেখে আমি আনন্দিত, সে জন্যই আমি খাওয়াব।'

ভদ্রলোকের কথা শুনে অভিরূপ ও সুমিতা হতবাক, একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের পয়সায় তারা খাবে কি করে, তাই দুজনে একই সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল, 'না, না, সে হয় না।' দুজনের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'আমি অপরিচিত তোমাদের কেউ নই এই তো? শিশু যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন তার পিতা-মাতা কাকা-কাকী কেউই তো পরিচিত থাকে না, তবু তাঁরা শিশুকে আদর করবার বা ভালবাসবার বা সযত্নে লালন করবার অধিকার ভোগ করেন, তা বাবা তোমরা আমাকে তোমাদের কোন এক জ্যাঠামশায় বা কাকাবাবু বলে মনে করে নাও, আর এটুকু স্নেহ দেখাবার অধিকার দাও·····।' ভদ্রলোকের স্বরে যেন মিনতি ঝরে পড়ল, ভদ্রলোক কি বলতে চান বুঝতে পেরে অভিরূপ ও সুমিতা একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে প্রায় নিমরাজী ভঙ্গীতে বলল, 'ছিঃ ছিঃ একি বলছেন! বয়সে সত্যিই আপনি আমাদের জ্যাঠামশায়ের মত, আচ্ছা বলুন আপনার যা খাওয়াবার ইচ্ছা।'

অভিরূপ ও সুমিতা রাজী হতেই খুশীতে ভদ্রলোকের মুখটা উজ্জল হয়ে উঠল। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে সামনে অপেক্ষারত বেয়ারাকে খাবার ও চায়ের অর্ডার দিয়ে নিজের জামার বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা কার্ড বের করে অভিরূপের হাতে দিলেন। কার্ড নিয়ে দুজনে দেখল ভদ্রলোকের নাম রামমোহন মুখোপাধ্যায়। কি খেয়াল হতে সুমিতা অভিরূপের হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে ভাল করে দেখতেই বুঝতে পারল তার মনে এতক্ষণ যে সন্দেহের কথা ঝিলিক

নিচ্ছিল ঠিক তাই; উনিই সেই বিখ্যাত সুরকার ও সংগীত শিল্পী রামমোহন মুখার্জী। শুধু সংগীত শিল্পীই নন, ওঁর হাতে বিভিন্ন রকমের বাদ্যযন্ত্রও যেন কথা বলে, রেডিও ও টি. ভি. তে বহুবার ওঁর বাজনা ও গান শুনেছে, তাই প্রথম থেকেই ভদ্রলোকের মুখটা সুমিতার চেনা-চেনা লাগছিল।

পরিচয়টা বুঝে অভিরূপ ও সুমিতা টেবিলের ওধারে গিয়ে ভদ্রলোকের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল এবং নীরব হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকল। এ চাওয়াটা একজন বিখ্যাত মানুষের প্রতি সাধারণ মানুষের যে ভয় ও শ্রদ্ধামিশ্রিত দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, ঠিক সেই রকম চাওয়া।

অভিরূপ ও সুমিতার প্রণাম করা দেখে ভদ্রলোক বুঝলেন ছেলে-মেয়ে দুটি নিশ্চিতই খুব ভাল ঘরের ছেলেমেয়ে, কারণ আজ-কালকার ছেলেমেয়েরা অনাত্মীয় তো দূরের কথা নিজের বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়-পরিজন, এমন কি, বাবা-মায়ের পায়ের কাছে মাথা নীচু করতেও কুণ্ঠিত হয়। যে বাবা মা তাদের পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন শিক্ষা দীক্ষা দিয়েছেন, জীবনে বড় হবার সুযোগ করে দিতে গিয়ে নিজেরা প্রাণপাত করেছেন তাঁদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করাকেও অসম্মা-নের কাজ ভাবে, কিন্তু নিজেদের চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে অভিরূপ ও সুমিতার প্রণাম করা এবং কিয়ৎ-পূর্বে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের তাৎক্ষণিক প্রতিবাদের সৎ-সাহস দেখে রামবাবু মুহূর্তেই ছেলেমেয়ে দুটিকে ভালবেসে ফেলেছিলেন, তাই তাদের সঙ্গে আলাপ করবার অভিপ্রায়েই পিছু পিছু কাফেটারিয়াতে এসে একই টেবিলে তাদের সামনে আসন গ্রহণ করেছিলেন।

ইতিমধ্যে বেয়ারা খাবার নিয়ে এলে দেখা গেল তিনটি প্লেটেই দু-পীস করে টোষ্ট, একটা করে ডবল ডিমের ওমলেট এবং টমেটো সস ও জেলী রয়েছে। বেয়ারা খাবারগুলো নামিয়ে দিতেই রামবাবু নিজে সেগুলো সুমিতা ও অভিরূপের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'নাও শুরু কর।' খেতে-খেতে গল্প করতে-করতে তিনি অভিরূপ ও

সুমিতার পরিচয় পেয়ে খুশীতে উদ্বেল হয়ে উঠলেন এবং বললেন 'তাহলে ভুল লোককে খাওয়াচ্ছি না বল, বিদ্যালয়ের দুজন ফার্স্ট পজিশনের ছেলেমেয়েকে খাওয়াচ্ছি। এ খাওয়া কিছুই নয়, ফার্স্ট হওয়ার জন্য আর একদিন বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তোমাদের পেটভরে খাওয়াব', বলে হাসি-গল্পে আনন্দে খাওয়া শেষ করে পকেট থেকে কাগজ বের করে অভিরূপ ও সুমিতার গ্রামের বাড়ী ও কলকাতার আস্তানার ঠিকানা লিখে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। চা শেষ হলে দাম মিটিয়ে তাদের সঙ্গে এসে তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে আটটা কুড়ির আপ হাওড়া-বর্ধমান লোকাল ট্রেন ধরলেন, তাঁর বাড়ী উত্তর-পাড়ায়, সুতরাং অভিরূপ ও সুমিতার কাছে বিদায় নিয়ে তিনি উত্তর-পাড়া স্টেশনে নেমে পড়লেন।

রামবাবু নেমে যাওয়ার পর অভিরূপ ও সুমিতার মন খারাপ হয়ে গেল। বিমর্ষচিত্তে অভিরূপ বলল, 'চারিদিকের এত জঘন্যতা এত নোংরামির মধ্যেও রামমোহনবাবুর মত মানুষ এখনও আছেন যাঁরা সমাজের অত্যন্ত সম্মানীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকেও নিজের কর্মকৃতিত্বের অহঙ্কার ভুলে সাধারণ পোষাকে সজ্জিত একেবারে অপরিচিত ছেলেমেয়েকে সযত্ন-স্নেহে কাছে টানতে পারেন, তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা কেড়ে নিতে পারেন। রামমোহন বাবুর মত গুণী এবং বিখ্যাত অন্য মানুষেরা নিজেদের অহঙ্কার ভুলে, বৃথা সমালোচনামূলক মনোভাব পরিত্যাগ করে আজকের তরুণ তরুণীদের যদি সযত্ন-স্নেহে কাছে টেনে উপদেশ দিয়ে পথের হদিশ দেন তো সমাজ থেকে অনেক হতাশা, অনেক গ্লানি দূর হয় এবং সার্বিক অবক্ষয়ের অন্ধকার থেকে এ যুগের তরুণ-তরুণীরাও মুক্তি পেয়ে আনন্দের সঙ্গে, উৎসাহের সঙ্গে, সাহসের সঙ্গে তাদের কর্তব্য কর্মে লিপ্ত হয় ও বহু অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে এ—সমাজকে আলোর পথে নিয়ে যেতে পারে। অভিরূপের কথায় সুমিতা একবার মুখটা ঘুরিয়ে তার মুখের দিকে চাইল, কিছু বলল না। রামমোহনবাবু নেমে যাওয়ার পর বার-বার তাঁর মুখটা মনে পড়ছিল। অন্যমনস্ক

হবার জন্য সে একখানা বই খুলে তাতে মন দেবার চেষ্টা করল। ওদিকে স্টেশনে এত কাণ্ড যে ঘটে গেল, তার সবটাই অভিরূপের ছেলেমানুষীর এবং দুষ্টুমীর জন্য সেটা ঘুণাক্ষরেও সুমিতা বুঝতে পারল না।

সুমিতা বইয়ে চোখ রাখতেই অভিরূপ তার ডান হাতটা ধরে বলল, 'থাক, এখন পড়তে হবে না।' সুমিতা আস্তে-আস্তে নিজের হাতটা সরিয়ে নিয়ে, যখন-তখন নারীদেহ স্পর্শ করাটা কোন সংযমী পুরুষের লক্ষণ নয়,' বলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ট্রেন ছোটার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের মাঠ, বাড়ী-ঘরগুলো কেমন দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে তাই দেখতে থাকল। তার কথা শুনে অভিরূপ বুঝল সুমিতার রাগ এখনও পড়েনি তাই তাকে আর বিরক্ত করল না, চুপচাপ নিজেও একখানা বই খুলে পড়তে শুরু করল। বর্দ্ধমানে নেমে যথারীতি বাসে উঠে অবশেষে বেলা একটার সময় এসে বাড়ী পৌঁছল।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া শেষে বিশ্রাম নিয়ে বিকেল পাঁচটা নাগাদ অভিরূপ ফনীবাবুর বাড়ী গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে ফেরবার পথে ভৈরববাবুর বাড়ীতে ঢুকল। ভৈরববাবু ও বেলাদেবীকে প্রণামান্তে শারীরিক কুশলবার্তা বিনিময় করে সে অনুরূপ ও সুমিতার খোঁজ করল। অনুরূপ খেলতে গেছে শুনে অভিরূপ, 'তবে যাই খেলার মাঠে গিয়ে একটু দেখি ছেলেগুলো কেমন খেলছে,' বলে তৎক্ষণাৎ চলে যেতে চাইল। তার চলে যাওয়া দেখে ভৈরববাবু বাইরে থেকেই সুমিতাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'সুমিতা, বাইরে আয়, অভিরূপ এসেছে।' সুমিতা এতক্ষণ ঘরের ভিতরটা গোছগাছ করছিল। বাবার ডাক শুনে বাইরে আসতেই অভিরূপ তার দিকে চেয়ে দেখে বুঝল সকাল থেকে ভ্রমণজনিত এবং বিকেলে গৃহকর্মজনিত শ্রান্তিতে সুমিতা ঘর্মাক্ত ও অবসাদগ্রস্ত। তার দিকে মুহূর্তের জন্য চেয়ে অভিরূপ মুখ ঘুরিয়ে ভৈরববাবু ও বেলাদেবীর সঙ্গে গল্প করতে লাগল। সুমিতা বারান্দার তারে-রাখা একটা গামছা নিয়ে ঘাড়ের মুখের ঘামটা মুছে বাবা-মায়ের পাশে বসে চুপচাপ গল্প শুনতে লাগল। ভৈরববাবু ও

বেলাদেবীর প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে সে কলকাতার মেস, সতীনাথ-বাবুদের খবর এমন কি, সুশান্তর জন্মদিন পালনের খবর পর্যন্ত সমস্ত নিখুঁতভাবে বর্ণনা করল। নানারকম গল্পে সময় গড়িয়ে বেলা পড়ে এলে অভিরূপ যাবার আগে সুমিতা ও অনুরূপকে সন্ধ্যার সময় তাদের বাড়ী পাঠিয়ে দেবার জন্য বেলাদেবীকে অনুরোধ করে বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল।

বাড়ী ফিরে বাবা-মায়ের কাছে বসে অভিরূপ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে-করে গ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহল হল। ইতি-মধ্যেই সে ফনীবাবু ও ভৈরববাবুর কাছেও কিছু-কিছু খবর শুনেছিল। এখন বাবামায়ের মুখ থেকে সব শুনে গ্রাম এখন মোটামুটি শান্ত আছে এবং আপাততঃ কোন উৎপাত নেই জেনে অভিরূপ বেশ কিছুটা আশ্বস্ত হ'ল। গল্প করতে-করতেই সুমিতা ও অনুরূপ এসে হাজির হল। সুমিতা সকলকে প্রণাম করে বসতেই মুরারিবাবু তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে পরীক্ষা কেমন হয়েছে জানতে চাইলে, সে বলল 'মোটামুটি হয়েছে।' মুরারিবাবু কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে গোয়াল-বাড়ীর দিকে গেলেন এবং শ্রীলেখা রাত্রের রান্নার ব্যবস্থা করতে রান্নাঘরে ঢোকবার আগে সুমিতা ও অনুরূপকে একেবারে রাত্রে খেয়ে যাবার জন্য বলে দিলেন এবং বাড়ীতে খবরটা জানিয়ে আসবার জন্য অনুরূপকে পাঠিয়ে দিলেন।

সবাই উঠে গেলে অভিরূপ সুমিতাকে বলল, 'রাগটা পড়েছে কি? তাহলে ঘরে গিয়ে কিছু কথা বলতাম। সেদিনের বেহালার বাড়ীতে সংযমের কথাটা তোমাকে ছোট করবার জন্য বা অপমান করবার জন্য বলিনি, বলেছিলাম সাবধান করবার জন্য, কারণ মেয়েদের থেকে এ যুগের পুরুষরা অনেক বেশী অসংযমী আর আমি তো একটা পুরুষ মানুষ, তাই তোমার দুর্বলতার সুযোগে হঠাৎ যদি আমি লোভ সামলাতে না পারি, যদি নিজেকে সংযত রাখতে না পারি তাই নিজের প্রতি অবিশ্বাস ও ভয়ে ঐ কথাটা বলেছিলাম। ঐ কথাটা বলা যদি ভুল হয়ে থাকে তো আমি মাফ চাইছি, তাছাড়া আরো একটা

ব্যাপারে আমার ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে।' এ পর্যন্ত বলার সঙ্গে-সঙ্গে সুমিতা আর কথা না বলে থাকতে পারল না, বলে ফেলল, 'কি ? আবার আর একটা কি অন্যায় হয়ে গেছে বুঝলাম না তো!' কথা-গুলো বলতে পেরে সুমিতা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, কারণ গত মাস দুই অভিমান ভরে অভিরূপের সঙ্গে কথা না বলে বিশেষ করে আজকে কলকাতা থেকে বাড়ী ফেরবার পথে ট্রেনে-বাসে কোন কথা বলতে না পারার জন্য তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে-ভেঙ্গে পড়ছিল, নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছিল না, তাই অভিরূপ সুশান্তর জন্মদিনের দুপুরবেলার প্রসঙ্গ তুলে ক্ষমা চাইতেই সঙ্গে-সঙ্গে সেও কথা বলে ফেলল। তার সব রাগ-অভিমান মুহূর্তে জল হয়ে গেল। সুমিতার কি আবার আর একটা কি অন্যায় হয়ে গেছে প্রশ্নে অভিরূপ তার হাত দুটো ধরে টেনে তুলে তার নিজের ঘরে নিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসতে দিল।

চেয়ারে বসে সুমিতা পুনরায় দ্বিতীয় অন্যায়ের প্রসঙ্গ তুলতেই অভিরূপ আজ সকালে যথা সময়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছেও মজা করে দেখা না দেওয়া, সাতটা পাঁচের ট্রেন ইচ্ছে করে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলতেই সুমিতা বলে উঠল, 'দারুণ ভুল করেছ।' 'হ্যাঁ, ভুল করেছি, সেজন্য অবাঙালী আধবুড়োটা তোমাকে অপমানকর প্রস্তাব করতে সুযোগ পেয়ে গেল আর এত ঝঞ্ঝাট ঘটে গেল, সেই জন্যই তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি,' বলে অভিরূপ সুমিতার দুটো হাত নিজের হাতে নিয়ে 'বল, ক্ষমা করলে তো ?' সুমিতা বলল, 'ক্ষমা না হয় আমি করলাম কিন্তু ব্যাপারটা কি বিশ্রীই না হয়ে গেল বল তো ? আজকাল বাঙালী ছেলেদের মজা করার ব্যাপারগুলো, বান্ধবী বা সহপাঠীদের সঙ্গে ইয়ার্কি দিয়ে কথা বলার ভঙ্গীগুলো এবং বাসে-ট্রেনে বাঙালী মেয়েদের প্রতি অশালীন ব্যবহার বা বিরক্তি উৎপাদক ব্যাপার-স্যাপারগুলো অন্যরাও শিখে নিয়েছে এবং সামান্য সুযোগেই এ সবের ব্যবহার ঘটিয়ে চলেছে। দেখলে তো মজা করে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে কি ব্যাপারটাই ঘটালে ?' 'আরে সাত সকালে হাওড়া স্টেশনের

মত জনারণ্যের মাঝখানে ভদ্রবেশী বয়স্ক একজন লোক তোমাকে কু-প্রস্তাব করবে এটা ভাবব কি করে বল ?' বলে অভিরূপ ক্ষোভ প্রকাশ করল। সুমিতা বলল, 'ভাববে কি করে ? কেন, তিন বছর তো কলকাতায় রয়েছ, এই তিন বছরের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পার নি কলকাতা ও তার আশে-পাশে পথে-ঘাটে মেয়েদের অবস্থা কত করুণ ? তারা সহজে সচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে ? মুখ নামিয়ে মাটির দিকে চেয়ে তাদের পথ হাঁটতে হয়। চলতে-চলতে মাথা সোজা করতে আজ-কাল মেয়েরা ভয় পায়, কারণ কোন মেয়ের চোখ যদি একবার পথ চলতি কোন পুরুষের চোখে পড়েছে অমনি সে পুরুষটি ভেবে নেয় মেয়েটি বুঝি তার জন্যই পাগল। তাকে না পেয়ে বুঝি মেয়েটির জীবনই বরবাদ হয়ে যাচ্ছে, তাই মেয়েটি যতই ঘৃণা করুক পোষা-কুকুরের মত পুরুষটি অমনি তার সঙ্গ নেয়, গা ঘেঁষে-ঘেঁষে চলতে থাকে, অন্যমনস্কের মত ভঙ্গী করে বারে-বারে এগিয়ে এসে কায়দা করে বেশ মনস্ক ধাক্কা দিয়ে মেয়েটির মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করতে থাকে। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অযাচিত প্রেম নিবেদন করে, জিজ্ঞাসা করে বিকেলে কোন এনগেজমেন্ট আছে কিনা, অমুক জায়গায় অমুক সময় দাঁড়াতে পারবে কিনা ? আবার অধিক সাহসী কেউ কেউ কানের কাছে মুখ নিয়ে রেট কত জিজ্ঞাসা করে। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা দুর্বিসহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু খারাপ মেয়ে রাস্তাঘাটে ঘোরে বলে ঐ ধরণের জানোয়ারগুলো সব মেয়েকেই খারাপ ভাবে। নিজেদের মা-বোনদের ইজ্জৎ জলাঞ্জলি যেতে দেখেও বাঙালী ছেলেগুলো প্রতিবাদে গর্জে ওঠে না। ভয়েই হোক বা মজা দেখবার জন্যই হোক অনেকেই বরং প্রতিবাদের পরিবর্তে পথ চলতি মেয়েটির অসহায় অবস্থা অবলোকন করতে-করতে বিরক্তি-উৎপাদকের কাছা-কাছি হাঁটতে থাকে। অবশেষে মেয়েটির দিক থেকে সাড়া না পেয়ে বিরক্তি-উৎপাদক দূরে সরে গেলে আবার ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর ইতরগুলো মেয়েটির হিতাকাঙ্খী সেজে······কাছে এসে ভাব করবার চেষ্টা করে এবং পূর্বতম বিরক্তি-উৎপাদক কি বলছিল, তার সঙ্গে মেয়েটির চেনা

পরিচয় আছে কিনা এ সব জানতে চায় অর্থাৎ তার নিজের একটা চান্স হয় কিনা বাজিয়ে দেখতে চায়।

বিশেষত মহিলা কলেজ গুলোর, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিত্থালয়ের, কলকাতা বিশ্ববিত্থালয়ের মেয়েদের তো পথ চলবার উপায় নাই। সর্বস্তরের মেয়েদের, সে ডাক্তার হোক, এঞ্জিনীয়ার হোক অধ্যাপিকা হোক আর ছাত্রীই হোক বয়স কম থাকলে আর রক্ষা নেই। কমবয়সী মেয়েগুলোকে ইদানীং পুরুষগুলো যেন হরিণের মাংস ভিন্ন অন্য কিছু ভাবতে পারে না।'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে সুমিতা থামতেই অভিরূপ কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার কণ্ঠস্বর চাপা দিয়ে সুমিতা পুনরায় বলে উঠল, 'অথচ ত্মাখ, নিজের বাড়ীর মেয়েদের নিয়ে এরা যখন রাস্তাঘাটে বের হয় তখন এদের চোখেমুখে একেবারে ভদ্রতা ও বৈদগ্ধ্যের আলো ঝরে পড়ে। তখন এদের চোখ মুখ দেখলে মনে হয় এক-একজন যেন সিদ্ধ-সাধু-পুরুষ, এক-একজন যেন নিদারুন কর্তব্য পরায়ন, মাতৃভক্ত, ভগ্নীবৎসল, পত্নীপরায়ণ, অত্যন্ত সৎ নাগরিক; এরা যেন পরনারীর দিকে তাকাতে জানে না। কি অদ্ভুত মনোবৃত্তি বুকে ভরে এই জানোয়ারগুলো যে কলকাতা ও তার আশেপাশে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তা আজকের দিনের শিশুটি পর্যন্ত জানে। অথচ দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর এই দুষ্কর্ম করেও এরা পার পেয়ে যাচ্ছে, এদের শাস্তি দেবার কোন লোক নেই।'

অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলা সুমিতার কথাগুলো শুনে অভিরূপ স্বগতোক্তির মত করে বলতে থাকে, 'সত্যি, কলকাতাটা কি জঘন্যই না হয়ে উঠছে দিনদিন। পশ্চিম বাংলা ও বাঙ্গালীর গর্ব, সহস্র সংস্কৃতির পীঠস্থান, কলকাতা শহর ইদানীং বাঙালীদের পক্ষে বাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে, নেহাত পেটের দায় এবং আন্তরিক একটা মায়ার টানে পড়ে কিছু বাঙালী এখনও কলকাতায় বাস করবার জন্য দাঁতে দাঁত চেপে লড়ে যাচ্ছে।

বড়-বড় ব্যবসায় সংস্থাগুলি তো বহুদিন থেকেই বাঙালীদের

হাতছাড়া। ইদানীং ছোট-খাট দোকান, এমন কি, পাড়ায় পাড়ায় ছোট-খাট ধোবাখানা, সেলুন ও চায়ের দোকানগুলি পর্যন্ত দ্রুত অন্যদের হাতে চলে যাচ্ছে। সব দেখে-শুনে, জেনে-বুঝেও উপরয়ালারা কেউ কিস্সু করছে না। এভাবে চললে বাঙালী আর কতদিন লড়বে? চার দেওয়ালের ভিতর কোণ ঠাসা হয়ে পড়লে কি বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে লড়াই করে বেশীক্ষণ টিকে থাকা যায়? চতুর্দিক থেকে বাঙালী আজ কোণ-ঠাসা। এবার কেবল গলা ধাক্কা আর পিছনে লাথি পড়বার অপেক্ষা। আর্থিক ও মানসিক নির্যাতন তো বহুদিন আগে থেকেই সারা হয়ে আছে, এবার শারীরিক নির্যাতন শুরু হয়েছে। ধীরে-ধীরে এই নির্যাতন যত বৃদ্ধি পাবে বাঙালী তত দিশেহারা হয়ে উঠবে এবং ক্লীব ফেরু-পালের মত শহর ছেড়ে মফঃস্বলে, এমন কি, প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেবে, ফলতঃ শহর-কেন্দ্রিক ছোটখাট অর্থকরী সংস্থাগুলিও অন্যদের দখলে চলে যাবে আর বাঙালী দূরে দাঁড়িয়ে আঙ্গুল চুষবে।'

অভিরূপের কথা শেষ হতে না-হতে সুমিতার ভিতর থেকে সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে বাতাসে মিশে গেল, সে বলল, 'আচ্ছা অভিরূপদা, এত কিছু দেখেও আমরা চিরকালই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকব? কেউ প্রতিবাদের প-টি পর্যন্ত উচ্চারণ করব না? এ রকম চললে যে গোটা বাঙালী জাতটাই উদ্বাস্তু হয়ে পড়বে এটা কি কেউ ভাবছে না? এদেশের বড় দুর্ভাগ্য অভিরূপদা যে নেতাজী সুভাষ বোসের মত লোককে হারাতে হয়েছে!' বলেই সুমিতা অভিরূপের ডান হাতটা ধরে নাড়া দিয়ে প্রশ্ন করে বসে, 'আচ্ছা অভিরূপদা, নেতাজীর মত আর একজন মহা-মনীষী কি আর একবার এ দেশে জন্মাতে পারেন না! আমরা কি এতই পাপী যে, ঐ রকম আর একজন ক্ষাত্রতেজে দীপ্ত মহাপুরুষ আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়াতে পারেন না? গোটা বাঙালী জাতটাকে চাবুক মেরে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে নির্দেশ দিতে পারেন না?' বলতে-বলতে সুমিতার গলার স্বর কাঁপতে থাকে, ক্রন্দনের আবেগে তার কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হয়ে

আসে, আর অভিরূপ ভাবতে থাকে সুমিতার মত লক্ষ-লক্ষ মেয়েই আজ এইরকম অবরুদ্ধ ক্রন্দনের যন্ত্রণা বুকে বয়ে, সমস্ত অবমাননা, সমস্ত রকমের হেনস্তা মাথা পেতে নিয়ে জীবনে বড় হবার সাধনায়, নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টায় সংগ্রাম করে চলেছে অথচ এদেরকে সামান্য সান্ত্বনা, সামান্য সাহস দেবার মত মানুষ এদেশে প্রায় নেই।

প্রসঙ্গক্রমে সকালে হাওড়া স্টেশনে সদ্য পরিচিত সৌম্যদর্শন পলিত কেশ বৃদ্ধ রামমোহনবাবুর কথা অভিরূপের মনে পড়ে গেল, সে বলে উঠল, 'এবার কলকাতা যাবার সময় উত্তরপাড়ায় নেমে রামমোহনবাবুর সঙ্গে দেখা করে যাব।' অভিরূপের কথায় সুমিতা হাসতে-হাসতে বলল, 'তুমি যে দেখছি এরই মধ্যে রামমোহনবাবুর স্নেহের ফাঁদে ধরা পড়ে গেলে?' 'হ্যাঁ ও রকম মানুষের স্নেহের ফাঁদে ধরা দিতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই, কারণ আজকালকার এই নিদারুণ স্বার্থান্বেষণের যুগে ক'জন মানুষ পারে সম্পূর্ণ অপরিচিত দুটি ছেলেমেয়েকে নির্দ্বিধায় একেবারে আপন করে নিতে? আজকালকার অধিকাংশ বয়স্ক মানুষই কম বয়সী ছেলেমেয়েদের প্রায় সকলকেই চ্যাংড়া ভাবেন এবং করুণার দৃষ্টিতে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেন।' অভিরূপ থামতে না থামতেই তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুমিতা বলল, 'এর দায়-দায়িত্ব কিন্তু ঐ প্রবীণ বা বৃদ্ধদের উপর চাপাতে পার না, এর জন্য দায়ী আজকালকার তরুণ-তরুণীরাই, কারণ পথেঘাটে পিতৃ-পিতামহ-তুল্য মানুষের সামনে আধুনিক কালের ছেলেমেয়েরা এমন সমস্ত আচরণ করে, এমন সমস্ত কথাবার্তা বলে বা এমন সমস্ত বিষয় নিয়ে সোল্লাসে আলোচনা করে যে-গুলো মোটেই ভদ্রোচিত বা শালীন নয়। অনেক সময় বাসে ট্রেনে দেখি নাতির বয়সী একটি ছেলে মুখে বিড়ি বা সিগারেট গুঁজে পাশের ধূমপানরত কোন বয়স্ক মানুষের কাছে গিয়ে বলে, 'দাদা, আগুনটা একটু দিন তো।' ব্যাপারটা কত বিশ্রী একবার ভাব দেখি, পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকা আপন পিতাঠাকুরের কাছ থেকেই হয়ত এরা কোন দিন বিড়ি ধরাবার জন্য আগুন চেয়ে বসবে, কারণ বদ অভ্যাস এমনই খারাপ

জিনিস যে, সে অভ্যাসের কবলে পড়লে তার থেকে মুক্তি পাওয়া বড় সহজ নয়।'

সুমিতার কথাবার্তার মধ্যে প্রায় সব সময়েই পুরুষদের প্রতি একটা নির্দয়তার ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে বুঝে অভিরূপ বলল, 'তুমি দেখছি কোনদিন পুরুষবিরোধী নারী সমিতি গঠন করে ফেলবে।' একথায় সুমিতা ফুঁসে উঠে বলতে থাকে, 'পুরুষশাসিত এ সমাজে সেটা সম্ভব নয় বলেই তো পুরুষদের এত বাড়াবাড়ি। না হ'লে মেয়েদের থেকে সাধারণভাবে অধিকাংশ পুরুষই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনেক বেশী খারাপ আচরণ করে; ঐ দেখনা, হাওড়া কি শেয়ালদা স্টেশনে লোকাল গাড়ীগুলি মফঃস্বল থেকে গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে-সঙ্গে দু-কম্পার্টমেন্টের মাঝখানে সারমেয়বৎ জল বিয়োগের কিরকম প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয়! অথচ যেখানে দুষ্কর্মটি সমাধা করে ঠিক তার থেকে বিশ গজ দূরেই রয়েছে প্রস্রাবাগার কিন্তু সেখানে যাবার মত তাদের ধৈর্য্য বা মানসিকতা নেই। গাড়ীতে উঠে ভিতরে যতই খালি থাকুক তবু অন্য যাত্রীদের নামা ওঠার পথ বন্ধ করে দরজার সামনে দাঁড়াবার জন্যও প্রতি যোগিতায় মত্ত হয়ে পুরুষরাই। কখনও দেখেছ মেয়েদের এইরকম হীন কাজ করতে?' বলে সুমিতা অভিরূপের দিকে চেয়ে থাকে।

অভিরূপ বলে, এসমস্ত অন্যায় যেন আজকাল জল-ভাত হয়ে গেছে, সকলের গা-সওয়া হয়ে গেছে। এ সমস্ত না হওয়াটাই যেন আশ্চর্যজনক বলে মনে হয় সকলের। সত্যিই কি বিচিত্র মানসিকতা আজকের দিনের মানুষের!' অভিরূপ থামলে সুমিতা শুরু করল, 'এরপর দেখবে ঘর থেকে মেয়েদের টেনে-টেনে বের করে নিয়ে গেলেও তোমাদের কাছে তা গা-সওয়া হয়ে যাবে, কেউ কিচ্ছু বলবে না। সামান্য একটা চাকু, ক্ষুর কিংবা একটা পাইপগান হাতে নিয়ে একটা সতের আঠার বছরের ছেলে এক-একটা পাড়ার হাজার-হাজার লোকের উপর অন্যায় খবরদারী করে আর অন্য মানুষগুলো ভীতু খরগোসের মত ঘরে বসে জুল-জুল করে জানালা ফাঁক করে দেখে।

মানুষ এমনই ক্লীব হয়ে গেছে যে, পাশেই কিছু ঘটতে দেখলে নিজের ঘরের জানালাটা পুরো খুলে দেখবার মত সৎসাহসও নেই! ছিঃ ছিঃ, এই কি আজকের দিনের শিক্ষিত ধোপ-দুরস্ত সভ্য সমাজের মানুষের ব্যবহার! ট্রেনে-বাসে, রাস্তায়-ঘাটে পাশে দাঁড়ানো মানুষটিকে আপন পৌরুষের, আপন বীরত্বের, আপন কৃতিত্বের গল্প করবে আর আসল সময়ে কাজের অছিলায় বা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বার ভয়ে ল্যাজ গুটিয়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে যাবার জন্য দ্রুত পা চালাবে! বাঃ, সাবাস বাঙালী! বীরের জাতি! জানো অভিরূপদা আমি যদি এমন কোন যাদু জানতাম যাতে মৃত সব মানুষকে বাঁচানো যায়, তাহলে ক্ষুদিরাম, বিনয়- বাদল, দীনেশ, বিবেকানন্দদের বাঁচিয়ে তুলে ডেকে এনে বলতাম, —একবার দেখ তোমাদের বক্তৃতাবাগীশ বংশধরেরা আজকাল কি করছে!' কথা বলতে-বলতে খাবার সময় হয়েছিল তাই শ্রীলেখার ডাকে অভিরূপ-সুমিতা খাবার ঘরে গিয়ে পৌছল এবং খাওয়া-দাওয়া শেষে অনুরূপকে সঙ্গে নিয়ে সুমিতা বাড়ী ফিরল।

গ্রামে দিন তিনেক কাটার পর হঠাৎ একদিন সকালে উঠে অভিরূপ দেখল গোটা গ্রামটা রঙীন পতাকা ও তোরনে সজ্জিত হয়েছে অর্থাৎ কোন বড় উপরওয়ালা হয়ত এ গ্রামে আসবেন তাই গ্রাম সাজানো হয়েছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ রাস্তা থেকে মাইকের মাধ্যমে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আগামী কাল বিকেল তিনটেয় খেলার মাঠে বিরাট জন সমাবেশ, বক্তা গণদাস মাল, ও সত্যসুন্দর প্রভু আপনারা দলে-দলে যোগদান করুন।' বার কয়েক মাইকের প্রচার শুনে অভিরূপ ভাবল হঠাৎ অজ পাড়াগাঁয়ে এত বড় বড় উপরওয়ালার আবির্ভাব ঘটছে, পশ্চাতে নিশ্চিতই কিছু কারণ আছে, তাই সেও খবরাখবর সংগ্রহ করছে

যথাসাধ্য চেষ্টা করল কিন্তু যেটুকু খবর পেল তাতে সে কিছুই বুঝতে পারল না, কারন এ গ্রামে এত বড় ধরনের উপরওয়ালা আজ পর্যন্ত কেউ আসেনি অথচ একই সঙ্গে একই দিনে দু-দুজন এতবড় জাঁদরেল উপরওয়ালা আসছে! তার মনে সন্দেহের একটা দোলা থেকেই গেল কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে কারও সঙ্গে কিছু আলোচনা করতেও তার মন সায় দিল না। শুধু তার বিবেক এবং চিন্তাশক্তি তাকে যেন বলে দিল আগামীকাল গ্রামে একটা বিরাট গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে এবং সে গণ্ডগোলে হয়ত সুমিতা, অনুরূপ, মুরারিবাবু, ভৈরববাবু, ফণীবাবু ও মণ্টুর দল সবাই জড়িয়ে পড়বে। সারাদিনই সাত পাঁচ ভাবল কিন্তু কি ভাবে কোথা দিয়ে কি গণ্ডগোল যে ঘটবে সেটা সে আন্দাজ করতে পারল না। শুধু মনকে প্রবোধ দিল দেখা যাক না কি হয় শেষ পর্যন্ত।'

পর দিন বেলা একটা থেকেই দেখা গেল হাজার-হাজার মানুষ ভিন্ন গ্রাম থেকে এসে খেলার মাঠে জুটছে এবং তাদের সবার হাতেই লাঠিতে জড়ানো পতাকা কিংবা কাগজের ফেস্টুন। চতুর্দিক পুলিসে পুলিসে গিজ গিজ করছে। বেলা তিনটে বাজবার অনেক আগেই মাঠ কানায়-কানায় পূর্ণ হয়ে গেল। অভিরূপ বাড়ীতে বসেই সমস্ত খবরাখবর পাচ্ছিল। বেলা প্রায় তিনটের সময় মাঠের দিক থেকে বিরাট জয়ধ্বনি উঠতেই অভিরূপ বুঝল এতক্ষণে উপরওয়ালারা হয়ত এসে পৌছলেন, তাই সমবেত জনতা তাঁদের জয়ধ্বনি দিয়ে সম্বর্ধনা জানাল। অভিরূপ বাড়ীর দাওয়ায় বসে একটা বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিল এবং দূর থেকে যতখানি সম্ভব মাঠের চিৎকার চেঁচামেঁচির দিকে সাগ্রহে খেয়াল রাখছিল। এমন সময় মণ্টু ছুটতে-ছুটতে সেখানে এসে বলল, 'দাদাবাবু তুমি এক্ষুনি গ্রাম ছেড়ে পালাও, ভয়ানক বিপদ···' 'কেন? কি হয়েছে?' বলে অভিরূপ বই রেখে মণ্টুর দিকে চাইল, মণ্টু বলল, 'শুনলাম এ গ্রামের লোক দিয়ে হচ্ছে না বলে গাঁ-ভিন গাঁয়ের লোক দিয়ে ওরা আজ এই তিনটে বাড়ীতে খুন জখম লুঠতরাজ করবে, আজ আর রেহাই নেই, মাঠে হাজার-

হাজার লোক জমেছে।' 'জমুক, তোরা তো আছিস? তোরা কয়েক জন আমার পাশে থাকিস তাহলেই হবে, ফনীবাবু, ভৈরববাবুর বাড়ীতে খবর দিয়েছিস?' প্রশ্ন করে অভিরূপ চোয়াল শক্ত করে উঠোনের তার থেকে জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে চড়াল এবং মণ্টুকে বলল, 'চল, মাঠে যাই।'

অভিরূপের ব্যাপার-স্যাপার দেখে মণ্টু বলল, 'কি বলছ দাদাবাবু, তুমি মাঠে যাবে কি! মাঠে গেলে আর রক্ষে নেই।' 'আঃ মণ্টু' বলে অভিরূপ ধমকে উঠল, 'তোরা আমার পাশে থাকলে আমি কাউকে ভয় করি না, শুধু তোরা জনা দশেক টাঙ্গী নিয়ে আমার আশপাশটায় দাঁড়িয়ে থাকবি আর বাকী যা করার আমি করব, নেহাৎ প্রয়োজন না ঘটলে কাউকে মারবি না।' 'বলছ কি দাদাবাবু! তুমি কি ক্ষেপে গেলে! ওখানে ঐ হাজার-হাজার লোক আর আমরা মাত্র দশজন তোমাদের সামলাব? না, না, দাদাবাবু, এ পাগলামী কর না, তুমিও মরবে আর আমরাও মরব, তার চেয়ে বরং তুমি গাঁ ছেড়ে এক্ষুনি পালাও। আমি, সুমিতাদি, অনুরূপ ও ফণীবাবুদের সকলকে তাই বলে এসেছি', বলে মণ্টু হাঁপাতে লাগল। 'সবাই কি বলেছে? গাঁ ছেড়ে পালাবে বলেছে? না কি পালিয়ে গেছে?' অভিরূপ প্রশ্ন করল। 'না দাদাবাবু, সবাই বলেছে গাঁ ছেড়ে এক চুল নড়বে না, বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাবে না, জন্মেছে এই ভিটেতে, মরতে হয় এই ভিটেতেই মরবে।' মণ্টু থামতেই অভিরূপ বলল, 'নে চল এখন মাঠে যাই, টাঙ্গীর ফলাগুলো নীচের দিকে করে তোরা হেঁটে আয় আমার সঙ্গে, দেখি কে কি করে।' বলে অভিরূপ আগে-আগে হাঁটতে লাগল।

রাস্তায় বের হয়ে অভিরূপ একবার তালগাছের দিকে তাকিয়ে দেখল বীর আর বেঁটে সেখানে নেই। দূরের আকাশে লক্ষ্য পড়তেই অভিরূপ দেখল শয়ে শয়ে শকুন খেলার মাঠের ঠিক উপরটাতেই চক্কর দিচ্ছে। অভিরূপের বুকের বল দারুণ বেড়ে গেল। আকাশ থেকে চোখ মাটীতে ফেলতেই সে আরও দেখল দশজন নয় অন্ততঃ পঞ্চাশ-

খানা টাঙ্গী নিয়ে সার-সার দাঁড়িয়ে আছে মণ্টুদের পাড়ার জোয়ান ছেলেরা। অভিরূপ তাদের দিকে তাকিয়ে এবার বলল, এরপর যদি সুযোগ না পাই তাই আগে থাকতেই তোমাদের সকলকে আমার নমস্কার জানাচ্ছি; তোমরা আমাকে এত ভালবাস? চল, আজ আমাদের সবারই পরীক্ষা হবে, দেখা যাক কাদের লড়াইয়ের জোর বেশী? ঐ দাঙ্গাকারী ভণ্ড তপস্বীদের, না, আমাদের? চল সবাই মিলে গিয়ে মাঠের একধারে দাঁড়াই, দেখি ওরা কি করে।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ওরা সবাই মাঠের এক কোণে জড় হল এবং টাঙ্গীর ফলা নীচের দিকে করে এমন ভাবে দাঁড়াল যে সাধারণ ভাবে দেখলে তাদের হাতের অস্ত্রগুলোকে শুধু মাত্র লাঠি বলেই মনে হয়। ওদিকে অভিরূপের বাড়ীতে ছুটে এসে সুমিতা ও অনুরূপ শুনল যে, সে মাঠে গেছে তাই তারা দুজন আবার মাঠের দিকে দৌড়ল এবং তিন মিনিটের মধ্যে অভিরূপের পাশে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে পৌঁছেই জনা পঞ্চাশের হাতে টাঙ্গী দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে সুমিতা অভিরূপকে বলল, 'এ ভাবে আগুন নিয়ে খেলে কোন লাভ আছে? তুমি তো বাড়ীতে থাকলেই পারতে? এখানে আসতে গেলে কেন? অভিরূপ কেবল গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল, 'জনতার রোষ যদি পড়ে তাহলে বাড়ীতে থাকলেই কি আমি বাঁচতে পারব! বরং লড়াইটা খোলা ময়দানে হওয়াই ভাল, তাই এখানে এসেছি। তুমি এখানে না এলেই ভাল করতে, এখনও সময় আছে—অনুরূপ আর তুমি বাড়ী ফিরে যাও।' সুমিতা বলল, 'মরতে হলে এখানে তোমার পাশে দাঁড়িয়েই মরব, বাড়ীর ভিতর ইঁদুর-বেড়ালের মত মরতে আমি রাজী নই।'

ওদিকে মাইকে তখন গুণদাস মালের বক্তৃতা চলছে। 'মানুষের ভাল করাই আমাদের ব্রত, আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, আর এই ব্রত উদযাপনের জন্য অর্থাৎ মানুষের ভাল করতে গিয়েই আমাদের যে বন্ধুটিকে আমরা হারিয়েছি সেই দীননাথ নন্দীকে যাদের জন্য হারাতে হয়েছে তাদের কি ক্ষমা করা যায়? আপনারাই

বলুন এরা কি ক্ষমা পাবার যোগ্য? এই সব শত্রুরা বেঁচে থাকতে দেশের কোন উন্নতিই সম্ভব নয়। তাই ওদের বাঁচতে দেওয়া পাপ, শুনেছি ওদের বাড়ীও এই গ্রামে, ওরা নাকি জাদু জানে, ওরা নাকি শকুন দিয়ে কায়দা করে মানুষ মারে এবং সেই কায়দাতেই আমাদের একান্ত সেবক জনগণের দরদী বন্ধু দীননাথ শহীদ হয়েছে; বন্ধুগণ, একবার ভেবে দেখুন এটা কত বড় অপরাধ……,' এতগুলি উত্তেজক কথা বলার পর উপস্থিত জনতা হই-হই করে উঠল, কেউ বলল, 'চল শালাকে খতম করে দিই', কেউ বলল, 'শালার বাড়ীটা কোন খানে?' এরই মধ্যে ভীড়ের মাঝখান থেকে কানকাটা ত্বলো বলে উঠল, 'ওই তো, শালা এই মাঠেরই এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

ত্বলোর মুখ থেকে কথা খসতে না খসতে মাঠের মধ্যে থেকে শতখানেক লোক লাঠি উঁচিয়ে ছুটে অভিরূপের দিকে আসতে লাগল আর ওদিকে শয়ে-শয়ে শকুন তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোঁ মেরে-মেরে রক্তারক্তি করতে লাগল। একজনকে যখন কোন শকুন ছোঁ মারছে পাশ থেকে অন্যজন তখন শকুনের উদ্দেশে লাঠি চালাতে গিয়ে তারই পাশের সঙ্গীর মাথায় লাঠির ঘা বসাচ্ছে; এইভাবে মিনিট কয়েকের মধ্যে বহু লোক নিজেদের মধ্যে লাঠি চালাচালি করে আহত হয়ে মাঠের মধ্যে গড়িয়ে পড়তে লাগল। অবস্থা দেখে শকুনের ছোঁয়ে উত্যক্ত জনতা অধীর হয়ে মাঠ ছেড়ে যে যেদিকে পারল দৌড়তে লাগল।

জনতাকে পূর্বাহ্নে বোঝানো হয়েছিল মাত্র ত্বটো শকুন, তাই তারা ত্বটো শকুন আর কতক্ষণ লড়বে এই মনোভাব নিয়ে এই পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডে যোগ দিতে এসেছিল। কিন্তু এখন দেখল হাজার-হাজার শকুন তীক্ষ্ণ নখরে তাদের ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতে উদ্যত, তাই তারা প্রাণভয়ে দৌড় শুরু করল।

এই গোলমালে ভীড়ের মধ্য থেকে কে একজন পাইপগানের গুলি চালাল, কিন্তু গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে অনুরূপের পায়ে লাগল এবং পর মুহূর্তেই পাইপগানটা ছিটকে এসে অভিরূপের পায়ের

কাছে পড়ল। অভিরূপ বুঝল এটা বীরের কীর্ত্তি। মাঠ যখন প্রায় ফাঁকা তখন মঞ্চ থেকে গণদাস পুলিসের উদ্দেশে বললেন, ‘এখানে এত পুলিশ রয়েছে, তারা কি দেখতে পাচ্ছে না শকুনগুলো জনগণকে কি ভাবে ক্ষত বিক্ষত করছে! তাদের বন্দুকে কি টোটা ভরা নেই?’ গণদাসের উত্তেজিত কণ্ঠে উচ্চারিত শব্দ-গুলো শুনে উপস্থিত পুলিসের লোকেরা বুঝল এ-উপরওয়ালা তাহলে গুলি চালাতে নির্দ্দেশ দিচ্ছে। তারা সঙ্গে-সঙ্গে শকুনগুলোকে লক্ষ্য করে বন্দুক তাক করল, কিন্তু যেই বন্দুক তাক করল অমনি এক সঙ্গে কয়েকটা পাখী মিলে তাদের ক্ষত বিক্ষত করে তুলল এবং তাদের নিশানা ভুল হয়ে পলায়মান জনতার গায়ে গিয়ে গুলি লাগল। কয়েক মিনিটে অন্ততঃ রাউণ্ড পঞ্চাশ গুলি চালিয়ে পুলিসের লোকেরা চুপচাপ হয়ে গেল, কারণ তখন আর তাদের কাছে গুলি নেই, গুলি শেষ, তারা আকাশের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মাটিতে চাইল, দেখল পঞ্চাশ রাউণ্ড গুলিতে মাত্র গোটাছয়েক শকুন আহত হয়েছে আর অন্ততঃ জনা বিশেক মানুষ গুলিবিদ্ধ হয়ে মাঠে কাতরাচ্ছে।

বন্দুক থামানোর সঙ্গে-সঙ্গে পাখীগুলো আবার দ্বিগুন তেজে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাদের ক্ষত বিক্ষত করতে লাগল। পুলিসের লোকেরা—এস. আই, সিপাহী যে যেখানে ছিল সে সেখান থেকেই প্রাণ ভয়ে মাঠ ছেড়ে দৌড়তে লাগল।

ওদিকে মঞ্চে তখন অসহায় সত্যসুন্দর প্রভু ও গণদাস মাল ভিন্ন কেউ নেই, সবাই ভয়ে স্থানত্যাগ করেছে। অভিরূপ সুমিতাকে সঙ্গে নিয়ে ধীরে-ধীরে তাদের দিকে এগিয়ে গেল এবং বলল, ‘নেমে আসুন আর মঞ্চে দাঁড়িয়ে কি করবেন? যে কাজের জন্য এসেছিলেন সেটাই তো শেষ হয়নি, আমরা দু-জন তো এখনও জীবিত, এই নিন আপনাদের সামনে এসে গেছি। আপনাদেব পকেটে আত্মরক্ষার জন্য যে রিভালবারগুলো অছে সেগুলো দিয়ে আমাদের গুলি করুন, কই আসুন।’

সত্যসুন্দর প্রভু এতক্ষণ মঞ্চের একপাশে দাঁড়িয়ে ব্যাপার-স্যাপার দেখে হতভম্ভ হয়ে গিয়েছিলেন, রাগে তাঁর শরীর কাঁপছিল। অভিরূপের এই উপহাসের সুরে বলা কথায় উত্তেজিত হয়ে মঞ্চ থেকে নেমে যেই পকেটে হাত ঢুকিয়ে রিভলবার বের করেছেন অমনি বেঁটে ও বীর দুজনে দুদিকে থেকে এসে তাঁর হাতে ও চোখে ছোঁ মারল, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর রিভলবার ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল এবং একটা চোখ উপড়ে গেল। তাঁর এই অবস্থা দেখে এতক্ষণ পর বাকপটু উত্তেজক বক্তৃতাদাতা নিরস্ত্র গণদাস বাবু সঙ্গে-সঙ্গে অভিরূপের পা জড়িয়ে ধরে বলতে শুরু করলেন, 'তোমরা আমাদের বাঁচাও। অভিরূপের পা ধরার সঙ্গে-সঙ্গে বেঁটে ও বীর দুজনে দুদিক থেকে এসে তাঁর দুটো কান ছিঁড়ে অভিরূপের ও সুমিতার পায়ের তলায় ফেলে দিল। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে তাঁরা দৌড় দিলেন নিজেদের জীপের দিকে, কিন্তু জীপের ভিতর ড্রাইভার নাই, তাই চুপচাপ জীপে বসে থাকা বোকামী ভেবে আবার নেমে তাঁরা মাঠের মধ্য দিয়ে দৌড়তে লাগলেন। ওদিকে শকুনের ছোঁ থেকে বাঁচবার জন্য পুলিসের ভ্যানের মধ্যে ঢুকে জনা দশেক পুলিস চুপচাপ বসেছিল, মণ্টুর দল তাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। মণ্টু হঠাৎ চিৎকার করে অভিরূপকে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদাবাবু, এই দশটা উপরওয়ালার বাচ্চাকে কি করব? শালাদের দু-চার ঘা করে লাগাব নাকি?' অভিরূপ বলল, 'ওদের কি দোষ? ওরা উপরওয়ালার চাকরী করে পেটের ভাত জোগাড় করে, হুকুম তামিল করাই ওদের কাজ, ওদের যেতে দে, আর বলে দে এ গাঁয়ে যেন আর কক্ষনো না ঢোকে।' অভিরূপের কথা শুনে দশটা সিপাই ভ্যানের ভিতর থেকে হাত জোড় করে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল এবং বলে উঠল, 'বাবু, আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আপনার ঐ শকুন সিপাহীরা আমাদের থেকে অনেক সেয়ানা, অনেক বেশী শক্তি ধরে। বাবু আমরা কথা দিচ্ছি আপনি হাতে পেয়েও আমাদের ছেড়ে দিচ্ছেন এর জন্য জীবনে কোনদিন আপনার এবং এই দিদিমনির

কোন ক্ষতি করব না। বরং আপনি আমাদের কাছে কোন কাজের জন্য গেলে আমরা আপনার উপকার করারই চেষ্টা করব।' তাদের দিকে তাকিয়ে অভিরূপ বুঝল, ভ্যানের ভিতরে বসেও মৃত্যু ভয়ে লোকগুলো ঠক্ঠক্ করে কাঁপছে। সে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'ঠিক আছে একটা কাগজে তোমাদের নাম ঠিকানাগুলো লিখে আমায় দাও।' তার কথায় দু তিন জনে মিলে তাদের নাম ও বাড়ীর ঠিকানা এবং কে কোন থানায় কাজ করে লিখে অভিরূপের হাতে দিল। এরপর মণ্টুকে নির্দ্দেশ দিতেই মণ্টু তাদের পথ ছেড়ে দিল এবং তাদের নিয়ে ভ্যান চলে গেল।

এতক্ষণে অভিরূপ অনুরূপের দিকে মন দিল, দেখল পাইপ গানের গুলিটা তার পায়ের সামান্য চামড়া ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। সুমিতাকে অনুরূপের ক্ষতের জন্য ব্যবস্থা করতে নির্দ্দেশ দিয়ে সে আহত শকুনগুলোর কাছে গিয়ে তাদের সকলের গায়ে হাত বুলিয়ে দিল এবং কোনটার আঘাত কি রকম বুঝে গোটা দুয়েক বাদে বাকী চারটে শকুনকে নিয়ে মণ্টুকে তার বাড়ীতে যেতে বলল। অভিরূপের হাতের সযত্ন স্পর্শ পেয়ে শকুন-দুটোর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। অভিরূপ তাদের মুখে একটু করে জল দেওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তারা দেহত্যাগ করল। মৃত শকুন দুটোকে বাড়ী নিয়ে এসে দুটো ঝুড়িতে ফুল দিয়ে সাজিয়ে তাদের কবর দেবার জন্য মণ্টুকে নির্দ্দেশ দিয়ে আহত শকুন চারটেকে নিয়ে গিয়ে সে নানা রকম ওষুধ পত্র ও মলম দিয়ে সেবা করতে লাগল। এই সেবা করা দেখে তার বাড়ীর বেড়ার দেওয়ালে বেঁটে ও বীরের সঙ্গে আরও কয়েকশ শকুন এসে বসল। শ্রীলেখা দেবী শকুনগুলোকে দেখে ঘরে যতটুকু যা খাবার ছিল তার সবটুকু এবং এক কড়াই দুধ এনে তাদের সামনে বসিয়ে দিলে শকুনগুলোর কোনটাই সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না, বরং আহত শকুন চারটের দিকে নজর রেখে চিঁ চিঁ চিঁ করে আওয়াজ করতে লাগল। কিছুক্ষন সেবা যত্ন করার পর মাত্র একটা শকুন উড়ে গিয়ে বেড়ায় বসল। বাকী তিনটে উড়তে পারল না, তাই বেঁটে-বীরের

সেই পুরোন খাঁচাটাতে তাদের ভরে অভিরূপ তাদের জন্য দুধও অন্যান্য খাবারের ব্যবস্থা করে দিল। সবশেষে প্রায় সন্ধ্যার সময় সমস্ত শকুন উড়ে চলে গেল। ইতিমধ্যে মণ্টু ও মৃত শকুন দুটোকে গ্রামের বাইরে কবর দিয়ে ফিরে এল। সুমিতা, অনুরূপ, ফনীবাবু, ভৈরববাবু সকলে মাঠ থেকে সোজা মুরারিবাবুর বাড়ীতে এসে এতক্ষণ অভিরূপের শকুন সেবা লক্ষ্য করছিলেন। শকুনগুলোর ব্যবস্থা হয়ে যেতেই অভিরূপ দাওয়ায় উঠে দঁড়িয়ে দেখল আজ শুধু এই তিনটি বাড়ী ও মণ্টুর দলই নয়, গোটা গ্রামের প্রায় সমস্ত পরিবারই তাদের বাড়ীর উঠোনে ভেঙে পড়েছে।

উঠোনের চতুর্দিকে এক নজর চোখ বুলিয়ে অভিরূপ বলল, 'আজ আমার সামান্য কিছু বলার আছে। আপনারা যদি অনুগ্রহ করে শোনেন তো আমি সামান্য কয়েকটা কথা বলি।' উপস্থিত সকলে হৈহৈ করে উঠল, বলল 'বল বল তুমি কিছু বল, আমরা সবাই শুনতে প্রস্তুত।' অভিরূপ শুরু করল, 'আজ এই মুহূর্তে যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন তাঁরা বলুন, 'এ-গ্রাম কাদের? সকলে, একই সঙ্গে বলল, 'আমাদের, আমাদের।' অভিরূপ পুনরায় বলল, 'কারও বাড়ীতে যদি মায়ের অসুখ করে তবে তাঁকে বাঁচাবার জন্য তাঁর সন্তানেরা কি করে? না, ছুটোছুটি করে ডাক্তার ওষুধ জোগাড় করে, না হলে মা মারা যায়। তেমনি আমাদের গ্রাম এই কুরচি-মায়ের আজ বড় অসুখ আর এ অসুখের জন্য ওষুধের ব্যবস্থা আমরা যারা এ মায়ের সন্তান তাদেরই করা উচিত অর্থাৎ এ গ্রামকে বাঁচাতে গেলে আমাদের সকলের সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে এ গ্রামের শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। যারা এ গ্রামের শান্তি বিঘ্নিত করছে এবং গ্রামেরই এক শ্রেণীর লোকদের দ্বারা আর এক শ্রেণীর লোকদের উপর অত্যাচার করাচ্ছে তাদের আঘাত হানতে হবে! বুঝিয়ে দিতে হবে যে, আমার মায়ের শরীরে খাবল মারতে দিতে আমরা রাজী নই। এক বার ভাবুন তো এ গ্রাম যদি ধ্বংস হয়ে যায় তো আমরা যাব কোথায়? কোথায় পাব আশ্রয়? বিভিন্ন

কারণে নানারকম অহেতুক আন্দোলন বাড়িয়ে তুলে যারা এ গ্রামের কৃষি ব্যবস্থার ক্ষতি সাধনে তৎপর, আগামী মরশুমে এ গ্রামের মাঠে যদি ধান না ফলে তারা কি গোটা গ্রামের মানুষকে প্রত্যেকদিন দু-বেলা পেট ভরে খাওয়াতে পারবে? আমরা প্রত্যেকেই খাই আমাদের নিজেদের গতরের জোরে, কারও দয়ায় নয়, তাই আপনাদের সকলকে অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের এই মাকে বাঁচাবার জন্য একজোট হোন। গ্রামের বাইরে থেকে কয়েকজন উপরওয়ালা কি নির্দ্দেশ দেবে আর এই গ্রামেরই দু-এক জন অমনি আমাদের সকলের বিরুদ্ধে লেগে পড়বে, এ-জিনিস চলতে দেওয়া যায় না। যে উপরওয়ালারা দূর থেকে নির্দ্দেশ দেন তারা কি এ-গ্রামের সুখ-দুঃখের দিনে আপনাদের পাশে এসে দাঁড়ান, না, এই গ্রামের লোকই একে অপরকে দেখেন? নিজের মায়ের প্রতি সন্তানের যতটা দরদ, অপরের মায়ের প্রতি কি ঠিক ততটা দরদ থাকে? উপর ওয়ালারা যেহেতু স্থানীয় মানুষ নন সুতরাং এ-গ্রামের প্রতি তাঁদের দরদ আপনাদের চেয়ে বেশী হওয়া কি সম্ভব? বহুদূরে সুরক্ষিত প্রাসাদে থেকে গোঁফে তা দিয়ে উপরওয়ালারা ছক কষে দেবেন আর ভালমন্দ না বুঝে ভবিষ্যতের ভাবনা না ভেবে আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে নিজেরা ধ্বংস হয়ে যাব, এইটাই কি চিরকাল চলবে? আপনারা ভাল করে ভেবে দেখুন। তাছাড়া আপনারা আজ পর্য্যন্ত শুনেছেন কি কোথাও কোন উপরওয়ালার গায়ে হাত পড়েছে? তাদের কারও ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে? সংবাদপত্রে তো উপরওয়ালাদের অনেক কু-কীর্ত্তির খবর আপনারা প্রায়ই পড়ে থাকেন কিন্তু কোনদিন শুনেছেন কি ওদের কারও কোন শাস্তি হয়েছে! আজ এ-গ্রামের আমরা সকলে একজোট হয়ে যদি এ-গ্রামে শান্তি বজায় রাখি, প্রতিটা কাজে যদি একে অপরের পাশে দাঁড়াই তাহলে আমাদের ভাবনা কিসে? আর ঠিক এই রকম ভাবে গোটা দেশের প্রত্যেকটি গ্রামে যদি শান্তি বজায় থাকে তাহলে এদেশ সত্যিকারের সোনার দেশ হতে পারে।'

অভিরূপের কথা শেষ হতে মাষ্টার মশায় অর্থাৎ ফনীবাবু দাওয়ায় উঠে সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কি, আপনারা সকলে শুনলেন তো? এবার বলুন আপনাদের মতামত কি? আপনারা কি একজোট হয়ে থাকতে পারবেন?' মাষ্টার মশায়ের কথা ডুবিয়ে দিয়ে সহস্র কণ্ঠে চিৎকার উঠল, হ্যাঁ, এতদিন আমরা ভুল করেছি, কিন্তু এবার থেকে আমরা একজোট হয়ে লড়ব। জান দিয়ে এ-গ্রামের ইজ্জত রাখব। অভিরূপ ঘোষ এ-গ্রামের গৌরব, তার কথায় আমরা উঠব-বসব এই আমরা বুকে হাত দিয়ে শপথ করে বলছি। কোনদিন কোন ব্যাপারে অভিরূপের সঙ্গে যুক্তি না করে কোন কাজ করব না।'

সকলে থামতে অভিরূপ বলল, আপনারা যে আমায় এত ভালবাসেন সেজন্য আপনাদের সকলকে আমার প্রণাম।' কৃতজ্ঞতায় আনন্দে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। সে আবার বলল, 'আমিও আপনাদের নিকট কথা দিচ্ছি সকলের সুখে-দুঃখে আমি প্রাণপাত করে আপনাদের সেবা করব।' একটু থেমে অভিরূপ বলল, শকুন দুটি অর্থাৎ বেঁটে আর বীরের জন্য আজ আপনাদের এই অভিরূপ প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরেছে। সেই পাখী দুটির উদ্দেশে আমাদের একবার জয়ধ্বনি দেওয়া উচিত. কারণ আমার মনে হয়, ঐ পাখী দুটি শুধু মাত্র শকুন নয়, ওরা দেবদূত, ওরা আমাদের মত দ্বিধাদীর্ণ অকৃতজ্ঞ স্বার্থান্বেষী মানুষদের শিক্ষা দেবার জন্যই হয়ত স্বর্গ হতে অভিশপ্ত হয়ে শকুন বেশে এই তালগাছে এসে শকুন মাতার কোলে জন্ম গ্রহণ করেছে। আসুন সকলে একসঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা একবার ওদের নামে জয়ধ্বনি করি।'

অভিরূপের কথা শেষ হতে-না-হতেই সহস্র কণ্ঠে, 'জয় বেঁটের জয়, জয় বীরের জয়' শব্দে গ্রাম মুখরিত হয়ে উঠল। এরপর ভৈরববাবুর আনানো সিঁড়ির-নাড়ু আর ছোলার-নাড়ু সকলের মধ্যে বিতরণ করা হল এবং ঘরোয়া সভা ভঙ্গ হ'ল।

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ গ্রামে খবরের কাগজ আসতে অনুরূপ

ও সুমিতা খবরের কাগজ হাতে করে ছুটতে-ছুটতে অভিরূপের কাছে এল। ওরা ঢোকার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে আরও অন্ততঃ জনা বিশেক গ্রাম বাসিন্দা এসে হাজির হল। সবারই হাতে সংবাদপত্র এবং সবাই খবরের কাগজ খুলে অভিরূপকে বলতে লাগল যে, 'গত বিকেলের আমাদের গ্রামের ঘটনাটা বেশ ফলাও করে সব কাগজেই ছেপেছে ?

অভিরূপ সুমিতার হাত থেকে নিয়ে একখানা ইংরাজী দৈনিক খুলে দেখল সংবাদ পত্রে গ্রামের মাঠের শকুন-মানুষের মারামারির ছবি ছেপেছে যার হেডিং করেছে, 'এ ইয়ং সেইণ্ট্ উইথ হিজ্ ভালচার আরমি।' নিউজটায় মোটামুটি চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফণীবাবুর হাত থেকে একটি বাংলা দৈনিক নিয়ে দেখল তাঁরা লিখেছেন, 'হীরের টুকরোর বুকে আগুন,' ঐই কাগজের সংবাদের ভিতরে চোখ বুলিয়ে দেখল তার উজ্জ্বল ছাত্রজীবনের সঙ্গে-সঙ্গে দেশ-প্রেমিকতার কথা বর্ণনা করেছে এবং শকুন পাখীর ছবিও ছেপেছে। অন্য একটি বাংলা দৈনিক হেডিং করেছে, 'তবে কি সত্যিই পশু পক্ষীরা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ?' এই সংবাদ পত্রে শকুন গুলোর কথা লিখতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছে, 'গতকাল সন্ধ্যায় বর্দ্ধমানের কুরচির খেলার মাঠে শকুনগুলোর কীর্ত্তিকলাপ দেখে প্রত্যক্ষদর্শীদের মনে হয়েছে এদেশের পশুপক্ষীরাও নিজেদের ভাল বোঝে, কৃতঘ্ন নয়। সাধারণ মানুষের এদের নিকটে শিক্ষা নেবার সময় এসেছে।' এরা আবার গণদাস মালের পায়ে ধরার ছবিটাও তুলে দিয়েছে।

সমস্ত কাগজগুলো একে-একে দেখে অভিরূপ নীরবে অন্যমনস্ক-ভাবে তাল গাছের দিকে তাকিয়ে বেঁটে আর বীরকে ডাক দিতেই তারা পোঁ করে নেমে এসে বেড়ার উপর বসল। অভিরূপ তাদের পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে আপন মনে বলে উঠল, 'তোরা দুজনে আজ এই গণ্ডগ্রাম কুরচির ইজ্জত বাড়িয়ে দিলি, আজ দেশ-বিদেশের লোকের কাছে আমাদের গ্রাম পরিচিত হয়ে গেল, আমরা বিখ্যাত হয়ে গেলাম।' শকুনগুলোকে অভিরূপের আদর করা দেখে উপস্থিত

সকলে তাদের উদ্দেশে একবার কপালে হাত ঠেকাল আর মনে মনে বলতে লাগল, 'তোরা দেবতা, তোরা দেবতা।'

দিন তিনেক পরে অভিরূপের নামে পোষ্টে একটা ইনল্যাণ্ড লেটার এল সুন্দর অক্ষরে অপরিচিত হাতের লেখা। ঠিকানাটা দেখে বুঝতে না পেরে অভিরূপ চিঠি খুলে পড়ে বুঝতে পারল সংবাদ পত্রে সেদিনের সমস্ত ঘটনা পাঠ করে রামমোহন জেঠু উত্তরপাড়া থেকে তাকে ও সুমিতাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং লিখেছেন দু-একদিনের মধ্যে তিনি এই কুরচি গ্রামে আসছেন। গ্রামবাসীদের গান শোনাবেন। চিঠির বিষয়বস্তু পাঠ করে অভিরূপ যৎপরোনাস্তি খুশী হয়ে সুমিতা, অনুরূপ, ফণীবাবু সমেত সমস্ত গ্রামবাসীকে খবরটা জানিয়ে দিল।

সংবাদটা শুনে কিছু উৎসাহী যুবক সেইদিনই বিকেলে বারোয়ারী তলার নাট মন্দিরের সামনের প্রাঙ্গনটা ত্রিপল দিয়ে ছেয়ে এমন ব্যবস্থা করে ফেলল যাতে তার নীচে বসে গ্রামবাসীরা গান শুনতে পারে। রামমোহন বাবুর মত বড় শিল্পী বিনা পয়সায় নিজের খরচে তাদের গ্রামে এসে গান শোনাবেন এবং তিনি যে কোন মুহূর্ত্তে এসে পড়তে পারেন, তাই সেইদিনই ছেলেরা ব্যবস্থাটা করে ফেলল।

পরদিন বেলা দেড়টা নাগাদ রামমোহন বাবু নিজের গাড়ীতে তাঁর অর্কেস্ট্রা পার্টি নিয়ে হাজির হলেন। প্রখ্যাত সঙ্গীত ও বাদ্য শিল্পী রামমোহন মুখোপাধ্যায় এসেছেন শুনে তাঁকে দেখবার জন্য প্রায় গোটা গ্রামটা অভিরূপের বাড়ীর উঠানে ভেঙ্গে পড়ল। স্বচোখে রামমোহন বাবুকে দেখে সকলে একে…একে প্রস্থান করল। ভর-দুপুরে দশ বার জন গুণী লোক হঠাৎ হাজির হওয়াতে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে প্রথমটায় অসুবিধা বোধ হলেও অভিরূপের নির্দ্দেশে পাড়ার পাঁচজনের বাড়ী থেকে রান্না-করা মাছ-মাংস ভাত ডাল তরি তরকারী

সবই জোগাড় হয়ে গেল। প্রথমে সরবৎ এবং মিষ্টি জলে আপ্যায়িত করে সুমিতা ও শ্রীলেখা দেবী তাঁদের স্নানের ব্যবস্থা করে দিলেন। স্নান শেষে দুপুরের আহার্য্য গ্রহণ করে রামমোহন বাবু অভিরূপের খাটে গা এলিয়ে দিলেন আর অর্কেস্ট্রা পার্টির বাকী নয় জন মুরারি বাবুর ঘর ও দাওয়া মিলিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শুয়ে বিশ্রামে রত হলেন।

বেলা চারটে নাগাদ বিছানা ছেড়ে রামবাবু অভিরূপকে বললেন, 'চল তোমাদের চতুর্থ পাণিপথের প্রান্তরটা একবার দেখে আসি।' অভিরূপ প্রথমটায় থতমত খেয়ে গেলেও কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বুঝতে পারল যে, রাম জেঠু সেদিনের সেই মারামারির জায়গা অর্থাৎ খেলার মাঠে যেতে চাইছেন। ব্যাপারটা বুঝতে পারার সঙ্গে-সঙ্গে সে হেসে উঠে বলল, 'ওঃ, আপনি খেলার মাঠে যেতে চাইছেন? কিন্তু সে তো এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে আপনার যেতে কষ্ট হবে।' 'আরে না, না, কষ্ট হবে না, তোমার জেঠু একদিন তোমাদের মতই অত্যন্ত সাধারণ পরিবারে জন্মেছিল। চিরকাল কি এ জেঠু আর্টিষ্ট রামমোহন মুখুজ্যে ছিল, না, গাড়ী নিয়ে ঘোরা ফেরা করত? নাও চল দেখি।' বলে অভিরূপের হাতটা ধরে টান দিতে অভিরূপ তাঁকে নিয়ে বের হল। ওঁরা রাস্তায় বের হতেই সুমিতা, অনুরূপ এবং গ্রামের আরও বহু তরুণ-তরুণী ওঁদের সঙ্গে-সঙ্গে চলতে লাগল।

গ্রামের রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে রামমোহন বাবু সুমিতার উদ্দেশে বললেন, 'জানো মা-মনি, কতদিন পর এই তোমাদের গ্রামে এসে আজ খোলা হাওয়ায় স্বচ্ছন্দে হাঁটবার সুযোগ পেলাম। জানো তো মা মনি; ইংরাজীতে একটা কথা আছে যার বাংলা অর্থ হল 'খ্যাতির বিড়ম্বনা'! সঙ্গীতে বিখ্যাত হওয়ার জন্য কোথাও খোলামেলা জায়গায় পাঁচ মিনিট দাঁড়াবার উপায় নেই। যেখানেই যাই সেখানেই দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যে মানুষ এসে ঘিরে ধরে। কেউ অটোগ্রাফ চায়, কেউ গান সম্বন্ধে নানারকম বিরক্তিকর প্রশ্ন করে। কেউ উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে গদগদ হয়ে পড়ে, কেউ-কেউ আবার নানারকম অপ্রীতিকর কটু ভাষণও নিক্ষেপ করে। সব মিলিয়ে লোকে এমন

অবস্থা করে তোলে যে, মনে হয় এর চেয়ে গৃহবন্দী হয়ে থাকাই ভাল। জেঠুর কথার উত্তরে সুমিতা বলল, 'হ্যাঁ জেঠু, আপনি ঠিক বলেছেন আর শুধু তাইই নয়, ঐ সমস্ত বিরক্তি-উৎপাদক সাধারণ মানুষের সঙ্গ যদি এড়িয়ে চলতে চাওয়া হয় তখন আবার বলে, দেখেছিস লোকটার কি ডাঁট! যার জন্য সাধারণ মানুষের থেকে উপরের পর্য্যায়ে গিয়ে নিজস্ব অধ্যবসায় ও অনুশীলনের জোরে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন তাঁদের সব সময়েই একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হয়। না হলে তারা ঐ সব খ্যাতনামা ব্যক্তিদেরও নিজেদের মত সাধারণ ভেবে নিয়ে তাঁদের মানমর্যাদা ধুলায় মিশিয়ে দিতে চায়।' সুমিতা থামতে রামজেঠু বলে ওঠেন, 'তুমি ঠিক ধরেছ, তা তুমিতো ধরবেই, তুমি ও অভিরূপ যে বিখ্যাত হয়ে গেছ, তোমরা বুঝবেই আমার কথা।' 'কি যে বলেন জেঠু, কোথায় আপনি আর কোথায় আমরা! আশীর্ব্বাদ করুন যাতে একদিন আমরা বিখ্যাত হতে পারি', বলে সুমিতা মুখ টিপে হাসতে থাকে আর রাম জেঠু তাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বলতে থাকেন, 'আশীর্বাদ একমাত্র ভগবানই করতে পারেন মা। তবে আমি বলে যাচ্ছি তোমরা দু-জনে একদিন খুব বড় হবে এবং এ-দেশের মানুষের অশেষ উপকারে লাগবে। এ-গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষ একদিন তোমাদের দু-জনকে মাথার মণি করে রাখবে।'

জেঠুর কথা শেষ হতে-না-হতে সুমিতা ও অভিরূপ মাথা নিচু করে তাঁর পা ছুঁয়ে আচম্বিতে প্রণাম করতে তিনি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এ কি, হঠাৎ প্রণাম কেন?' সুমিতা বলে উঠল, 'বাঃ আপনি আশীর্বাদ করলেন আর আমরা প্রণাম করব না?' তার এ কথায় রামমোহনবাবু মুগ্ধ বিস্ময়ে নব পরিচিত এই তরুণ তরুণীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে তাদের দুজনকে এক সাথে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং সবার সামনে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আজ এদের আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি যতদিন বাঁচব অভিরূপ সুমিতা যদি ডাকে তো যে কোন দিন যে কোন সময়ই আমি এসে তোমাদের

গান শুনিয়ে যাব। এমনিতেই আমার অনেক বয়স হয়েছে, তবু যতদিন আমার কণ্ঠে গান থাকবে হাতের আঙ্গুলে সুরের ঝঙ্কার থাকবে আমি এ-গ্রামে আসব।'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই চারদিক থেকে ধ্বনি উঠল, 'জয়, রাম জেঠুর জয়, জয় অভিরূপদার জয়, জয় সুমিতাদির জয়,' রামমোহনবাবুর কথায় উল্লসিত আনন্দ মুখর তরুণ-তরুণীদের আচম্বিত জয়ধ্বনির মধ্যেই রামবাবু, অভিরূপ ও সুমিতা পুনরায় চলতে লাগলেন। ঠিক এমন সময় ডালপালা সমেত এক থোকা অর্দ্ধশুষ্ক জুঁই ফুল এসে রাম বাবুর পায়ের কাছে পড়ল, কোন কিছু বোঝবার আগেই অভিরূপ দেখল বেঁটে ফুলের থোকাটা ফেলে দিয়ে দূরে উড়ে যাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি রামজেঠুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে উঠল, 'দেখলেন আমার বেঁটের কাণ্ড। কোথা থেকে ভর দুপুরে আধ-শুকনো ফুল ছিঁড়ে এনে আপনাকে পুজো দিয়ে গেল।' অভিরূপের আঙ্গুলের সঙ্কেত অনুযায়ী আকাশে তাকিয়ে রামবাবু দেখলেন সত্যি-সত্যি একটা শকুন ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর মাথার উপর সামান্য কিছুটা দূরে উড়ে যাচ্ছে, তিনি চেয়ে থাকতে-থাকতেই আর একটা শকুন উড়ে এসে আবার এক থোকা ফুল এনে ফেলে দিল। তার দিকে চেয়ে অভিরূপ হাসতে-হাসতে বলল, 'এটা হল আমার বীর, বেঁটের ভক্তি দেখে ও-ব্যাটা থাকতে পারে নি, আপনাকে ভক্তি জানাবার জন্য ও-ব্যাটাও এক থোকা ফুল ছিঁড়ে এনেছে।'

কথাগুলো অভিরূপ হাসতে-হাসতে হাল্কা ভাবে বললেও রাম-মোহনবাবু ততক্ষণে রীতিমত অবাক হয়ে গেছেন। থমকে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে শকুন দুটোকে দেখে তিনি তখন আপন মনে বলে চলেছেন, 'আশ্চর্য্য। সত্যি এ এক অদ্ভুত ঘটনা। আমার জীবনে এ রকম ঘটনা চোখে দেখব এ যে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। সত্যিই, এই শকুনগুলো যে শুধুমাত্র শকুন একথা মানতে মন চাইছে না।' তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অভিরূপ বলল, 'আপনি ঠিক বলেছেন, মাঝে-মাঝে আমারও মনে হয়

কোন সৎ আত্মা অভিশাপ-গ্রস্ত হয়ে ঐ শকুনদুটোর দেহ ধরে আমাদের এই গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। হয়ত কোন স্মরণাতীত কালে এই গ্রামকে ভালবেসে এই গ্রামের জন্যই ওরা মৃত্যু বরণ করেছিল, তাই আজ শকুন হয়ে আবার এই গ্রামকে রসাতলে যাওয়ার পথ থেকে সরিয়ে আনবার জন্য ওরা কাজ করে যাচ্ছে। জানেন জেঠু. ওদের চিন্তাশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং সর্বোপরি প্রয়োজন অনুযায়ী অত্যন্ত তৎপরতায় শত্রুপক্ষের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।' অভিরূপের কথা শেষ হতে-না-হতে পাশ থেকে আর একটি ছেলে বলে উঠল, 'সত্যি, শকুন দুটোর ব্যবহার দেখলে মাঝে-মাঝে মনে হয় ও দুটো যেন কোন বিরাট সৈন্য দলের কর্নেল ছিল, নয় অভিরূপ-দা?' কথাটা শুনে বক্তার দিকে তাকিয়ে অভিরূপ বলল, 'জানিস আমাদের সকলকে ঐ বেঁটে আর বীরের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ও লড়াকু মনোভাব সম্পন্ন হতে হবে। অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে দুর্ব্বার বেগে রুখে দাঁড়াবার মত সৎসাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সেই কোন ছোটবেলায় পড়েছি 'একতাই বল।' সেদিন মাঠে দেখলি তো আমাদের খতম করবে বলে লোকজন জড় করে মিটিং করার অছিলায় যারা হামলা করবার জন্য একতাবদ্ধ হয়েছিল শকুনগুলো দলে দলে এক জোটে তাদের কি রকম ভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে দিল। প্রতিপক্ষ যতই শক্তিশালী হোক অন্য পক্ষও যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে তাহলে শক্তিশালী প্রতিপক্ষকেও একটা সময় মাথা নত কবতেই হয়।'

অভিরূপের কথা শেষ হতে রামজেঠু বললেন, 'তুমি ঠিক বলেছ! 'একতাই বল' এই পুরাতন কথাটা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আজকে আবার নতুন করে প্রচার করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আজকের দিনে উপরওয়ালারা সভার নামে, জন সাধারণের পকেটের টাকায় মঞ্চ তৈরী করে সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে একে অপরের গায়ে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করছে আর মঞ্চের সামনে লক্ষ-লক্ষ মানুষ পাথরের স্তূপের মত বসে-বসে সেই সব কথা শুনে জীবনের অনেক মূল্যবান

সময় নষ্ট করছে, যেন এই সব অকথা-কুকথা শোনবার জন্যই তাদের এ দেশে জন্ম! সবচেয়ে পীড়াদায়ক হচ্ছে আজকের দিনের সার্ব্বিক আত্মিক অবমূল্যায়ণ। জন সাধারণের কষ্টার্জ্জিত অর্থ নিয়ে উপর-ওয়ালারা দশকের পর দশক ছিনিমিনি খেলছে, নিজেরা বিলাস ব্যসনে মত্ত হচ্ছে অথচ সাধারণ মানুষের পায়ে চলার রাস্তাটুকু পর্য্যন্ত মেরামত হয় না। হাসপাতালগুলো কুকুর-বেড়ালের আখড়া; স্কুলকলেজগুলো পড়াশুনা ব্যতীত অন্য সব কিছুর জন্যই বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। সমাজের জন্য স্বার্থত্যাগের ভাবনা আজকের ভারতবর্ষে উপহসিত। আধুনিক হওয়ার নামে আখের গুছোন ছাড়া আর কিছুই কেউ জানে না। অন্নময় কোষের চাইতে উৎকৃষ্ট কোন কোষ যেন কারও শরীরে নেই। উপরওয়ালাদের সম্পত্তির পরিমানই আজ সাফল্যের অবি-সংবাদী নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেবদেবীর উপাসনার পরিবর্ত্তে চতুর্দ্দিকে শুধু অর্থরূপ একেশ্বরের সাধনা ভিন্ন আর কিছুই নেই। মানুষ গড়ার চাইতে মানুষকে মুনিষ করে রাখাই বোধ হয় সমীচীন বলে ভেবে নিয়েছে উপরওয়ালারা। সাধারণ লোককে আসল সত্য ওরা কোনও দিনই জানতে দিতে রাজী নয়, কারণ জানতে দিলেই উপরওয়ালাদের পৃষ্ঠদেশ হতে উপশমের পুরুষ্টু তাকিয়াটি তারা কেড়ে নেবে। তাই মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকারের জন্য পুনঃ-পুনঃ বেতন বৃদ্ধির ফলে অলাত-চক্রের আকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা অশান্তি ও চরম উদ্বেগ এবং এই অশান্তি ও উদ্বেগ থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি সরিয়ে দেবার জন্য ওরা একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে ব্যক্তিগত ভাবে বা গোষ্ঠীগত ভাবে, কে কতটা ভাল বা খারাপ তার কুট-কচালিতেই আজীবন মত্ত থেকে যাচ্ছে। ছিঃ ছিঃ গণতন্ত্রের নামে এদেশে কি প্রহসনটাই না চলছে। দেখা যাচ্ছে বিবেকহীন কতিপয় করণিক ও বুদ্ধিহীন কিছু বুদ্ধিজীবী উপরওয়ালার হাতে পড়ে গণতন্ত্র অকূল সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে।'

রামজেঠুর কথা শেষ হতেই অভিরূপ বলল, 'তাছাড়া আর একটা ব্যাপার খেয়াল করেছেন জেঠু? গণতন্ত্রের নামে এদেশের সাধারণ

মানুষ এমন বাকস্বাধীনতা ভোগ করে চলেছে যে, পথেঘাটে মাঠে-ময়দানে কিছু না জেনেই কিছু না বুঝেই মান্যগণ্য ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যার যা খুশী মন্তব্য করে চলেছে। থাকছে ভারতবর্ষে, এ-দেশের অন্ন-জলে দেহ পরিপুষ্ট করে সব সময় চিন্তা করছে নিকারাগুয়া পক্-প্রনালীর কথা! পাশের বাড়ীর দুঃস্থ অসুস্থ মানুষটির যারা খোঁজ রাখে না, কোন উপকারে লাগে না, তারা চব্বিশ নম্বর বাসে হাওড়া থেকে শেয়ালদা যেতে-যেতে কেন যে নিকারাগুয়া নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি-গালাগালিতে মত্ত হয় তা বুঝি না।' সুমিতা পাশ থেকে বলে উঠল, 'এটা আর বুঝলে না, এটা হল, নাই কাজ তো খই ভাজ, কোনরূপ সৃষ্টিমূলক কাজ করতে বা গঠন মূলক কাজ করতে যারা অক্ষম, তাদের হাতে অঢেল সময়। খাওয়া, শোওয়া আর জন্ম দেওয়াই যাদের জীবনের ধ্যান জ্ঞান তপস্যা তারা কি আর করবে বল? অক্ষম যারা যত বেশী, বাক চাতুর্য্য তাদের তত বেশী। এদেশের মানুষ গড়ার চেয়ে ভাঙতে ওস্তাদ, তাই সব কিছু ভাঙাতেই তাদের আনন্দ। এ যেন······নির্ম্মীয়মাণ মন্দিরের ভিতরে হাতুড়ী হাতে শিশুর দল, এ যেন শাল পিয়ালের জঙ্গলের ভিতর কুঠার হস্তে ইন্ধন সন্ধানী প্রলুব্ধ কাষ্ঠ-তস্করের দল।'

'তোমাদেরই গড়তে হবে, যুবক-ছাত্র-তরুণ-তরুণীরাই পারে উদ্দাম বেগে সব কিছু ভেঙে তছনছ করে দিয়ে সব কিছু নতুন করে গড়ে তুলতে। একমাত্র তোমরাই এ দেশের ভরসা, আসলে বন্দুকের সামনে বুক পেতে দেবার সাহসটাই হল বীরত্ব। আজকের দিনে যুবকেরা তরুণ তরুণীরা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতেই ভুলে গেছে। ভুলে গেছে কিসে তাদের ভবিষ্যতে ভাল হবে, কিসে তাদের চারিত্রিক ও মানসিক উন্নতি ঘটবে। এই তো মাত্র কয়েক বছর আগেও খাদ্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ত, পুলিশের লাঠির সামনে বন্দুকের সামনে বুক পেতে দিত আর আজকাল দেখ সরষের তেল তিরিশ টাকা কে. জি. হলেও, পটল দশ টাকা কে. জি হলেও কোন লোক

এই যুবক ছাত্র ছাত্রীদের সংগঠিত করে কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারছেন না, বরং ছাত্রছাত্রীরা বিপথে পরিচালিত হয়ে গুরুজন তুল্য শিক্ষক বা অধ্যাপকদের ঘেরাও করে হেনস্তা করে, অসম্মান করে, নিজেদের পায়ে ক্রমাগত ভাবে কুঠারাঘাত করে চলেছে। কল-কারখানাতে, কৃষি-ভূমিতে সর্ব্বত্রই সমস্ত আন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত করা হচ্ছে।

কারখানায় বেতন বৃদ্ধির দাবী, বোনাস বৃদ্ধির দাবীতে যারা চিরকাল আন্দোলন করে চলেছে তারা মুখ ফুটে কেউ কিন্তু কোনদিন কোন শ্রমিককে বলছে না যে, তোমাকে কাজের সময় আট ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। মালিক পক্ষের কাছে উপস্থাপিত দাবীগুলির অধিকাংশ মিটে গেলেই আবার কাজে ফাঁকি দিচ্ছে, আবার যেমন খুশী কাজ করছে, আবার দাবী জানাচ্ছে এই ভাবে কি কলকারখানা বা কৃষি কাজ চলে! একটা কারখানা তৈরী করেই মালিকও আগে থেকে ভেবে রাখছে যে এ-কারখানা তো বেশীদিন চালানো যাবে না। শ্রমিকদের জন্য নানা ঝঞ্ঝাট তো হবেই, সুতরাং যত তাড়াতাড়ি পারি সরকারী অর্থ লুটে নিয়ে কেটে পড়ি। দু-পক্ষের এই মনোভাব থেকেই আজকের কলকারখানায় শিল্পের ক্ষেত্রে যত অসঙ্গতি ঘটছে। কলকারখানাগুলো যে আমাদের এই দেশেরই, ওগুলোর উন্নতি ঘটলে যে আমাদের এই দেশেরই উন্নতি ঘটবে এ কথাটা কেউ ভাবছে না। এ সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়তে গেলে সর্ব্বাগ্রে এগিয়ে আসা উচিত যুব-ছাত্র সম্প্রদায়ের, কারণ দেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, সব কিছু ঠিকঠাক চললে তবেই তাদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের পথগুলি খোলা থাকে, না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়েও বেকার থেকে যাওয়া ছাড়া কোন গতি থাকে না।

কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে রাম জেঠু থামতেই অভিরূপ বলল, 'কিন্তু জেঠু, কে একথা যুবকদের ছাত্রদের বোঝাবে? দেখছেন না নিজেদের পড়াশুনার ব্যাপার নিয়ে বা স্কুল কলেজে ভর্ত্তির ব্যাপার নিয়েও ছাত্রছাত্রী বা অভিভাবকদের কোন সৎ চিন্তা নেই। একজন

স্কুলের মাষ্টার মশাই কোন ছাত্রকে প্রাইভেট টিউশন দিলে একটা সাবজেক্টে সপ্তাহে হুদিন ঘণ্টা দেড়েক করে পড়াবার জন্য মাসে হু-শ টাকা হেঁকে বসছেন। মধ্যবিত্ত ঘরের বহু ভাল ছেলে মাষ্টার মশাইদের কাছে সামান্য পড়াশুনার সুযোগ পেলে অনেক ভাল রেজাল্ট করতে পারে, কিন্তু অর্থের অভাবে তারা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে পরীক্ষার ফলও খারাপ হচ্ছে আর স্কুল-লেভেলে পরীক্ষার ফল খারাপ হলে কলেজ লেভেলে পড়বার সুযোগ পর্য্যন্ত পাচ্ছে না। ফলে উচ্চ শিক্ষার অভাবে ভাল কাজকর্মের সুযোগগুলি তাদের হাত-ছাড়া হয়ে যাচ্ছে আর সে সমস্ত পদে বাইরের লোক বসে যাচ্ছে। খোঁজ নিলে দেখতে পাবেন পশ্চিমবাংলার কোন-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উনিশশো পঁচাশী সালের স্নাতক বা স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষা উনিশশো সাতাশীতেও নেওয়া সম্ভব হয় না, কিন্তু কেন হচ্ছে না? কেন অকারণে পরীক্ষা নিতে হু-বছর, তিন বছর দেরী করিয়ে তাদের বয়স বাড়িয়ে দিয়ে সরকারী চাকরীর সুযোগগুলো হাতছাড়া করে দেওয়া হচ্ছে, এর কৈফিয়ৎ পর্য্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা নিতে ভুলে যাচ্ছে। তারা নিজেদের মধ্যে দলাদলির খেলায় মত্ত হয়ে নিজেদের ভবিষ্যত নিজেরাই অন্ধকারের গিরিগুহায় নির্ব্বাসিত করছে। সব ছাত্রই ছাত্র, দলমত নির্ব্বিশেষে এরা যদি সোচ্চার হয়, কেন সময়ে আমাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে না, কেন আমাদের নিয়মিত ক্লাস নেওয়া হবে না, কেন আমাদের কোর্স যথাযথভাবে সময়ে শেষ করা হচ্ছে না, তাহলে পরিচালকরা পারেন কি চুপচাপ চেয়ারে বসে থাকতে? দিনের পর দিন বছরের পর বছর ফাঁকি দিয়ে তাঁরা এমনই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে, ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানোর চেয়ে অফিসে বা টিচার্স রুমে বসে-বসে রোম-নিকারাগুয়া করতে করতেই তাঁদের দিন কেটে যাচ্ছে এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে কচি ছেলেমেয়েগুলোর মধ্যে নানা রকম দলগত দ্বন্দ্ব লাগিয়ে রেখে নিজেদের ফাঁকি দেবার সুযোগগুলি বাড়িয়ে চলেছেন। ক্লাসে না পড়িয়ে, কলেজে কিচ্ছু না শিখিয়ে কায়দা করে বাড়ীতে বসে-বসে প্রাইভেট টিউশানী করে-করে অর্থ উপার্জ্জনের

নেশায় মত্ত হয়েছেন। আজকাল কোন মেয়েকে যদি কোন বিষয়ে রিসার্চ করতে হয় তো অনেক আগে থেকে অনেক বাছ-বিচার করে তবেই গাইড ঠিক করতে হয়, না হলে তার চরম সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত ঘটে যায়। অথচ দেখুন এ সমস্তের বিরুদ্ধে যাদের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা তারা কেমন নির্বিবাদে বছরের পর বছর অভিভাবকদের অর্থহানি ঘটিয়ে চলেছে। যেখানে দু বছরে কোর্স শেষ হওয়ার কথা সেখানে চার বছর ধরে যদি কলেজে যেতে হয় তো কত অর্থের অপব্যয় ঘটে একবার ভাবুন তো! বছরের পর বছর অকারণে তাঁদের অর্থদণ্ড দিতে হচ্ছে বুঝেও অভিভাবকরা ঐ পরিচালকবর্গের বিরুদ্ধে কিছু করছেন না, কি অদ্ভুত পরিস্থিতি।'

'সত্য বড় দুঃখের ব্যাপার অভিরূপ, বড় দুর্ভাগ্য এ দেশের মানুষের, এদেশের যুব-ছাত্র সম্প্রদায়ের,' বলে রাম জেঠু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে পুনরায় শুরু করলেন, 'আর দেখ, এই জন্যই দেশে ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে; একটা ছাত্রের পড়াশুনার খরচ মেটাতে গিয়ে অভিভাবককে যেন তেন প্রকারেণ বেশী রোজগার করতে হচ্ছে। প্রত্যেকটি ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন কাজের জন্য ট্রেড্ লাইসেন্স, সেলস্ ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স, অক্টোরয়, এক্সাইজ, কাস্টম্স্, সি-আই-বি প্রভৃতি সরকারী দপ্তরগুলির বিভিন্ন জায়গায় ঘুষ দিতে, ব্যবসায়-স্থানের মস্তানের তোলার টাকা এবং মালপত্র চলাচলের জন্য ট্রাফিক পুলিসের ঘুষ বাবদ প্রদেয় টাকা রোজগার করবার জন্য তার দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটাতে হচ্ছে। একজন চাকুরীজীবীকে তার পারিবারিক খরচ চালানোর জন্য মরিয়া হয়ে ন্যায়-অন্যায় যে কোন পথেই অর্থ উপার্জনের জন্য প্রাণপাত করতে হচ্ছে। এইসব করতে গিয়েই সর্ব্ব স্তরের মানুষের মন থেকে ন্যায় অন্যায়ের বোধ ক্রমাগত জলাঞ্জলি যাচ্ছে। সততা, বিশ্বাস, ধর্ম্ম সব জনজীবন থেকে মুছে যাচ্ছে। এ বড় কঠিন সময়! অভিরূপ, এ বড় কঠিন সময়। ঠিক এই রকম সময়েই তোমার এই শকুন ছুটোর মত সংগ্রামী একদল তরুণের বড় প্রয়োজন, বড় প্রয়োজন!'

কথা বলতে-বলতে রামমোহনবাবুর কণ্ঠও আবেগে থর থর করে কেঁপে ওঠে, তিনি নিজেকে একটু সংযত করে নিয়ে আবার শুরু করলেন, 'তোমাদের জন্য বড় দুঃখ হয় অভিরূপ, বড় দুঃখ হয়। তোমাদের জন্য, ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য আমরা ইচ্ছা করলে কত কিইই না দিতে পারতাম, অথচ দিলাম কি! না, অশ্বডিম্ব। ভবিষ্যতের দেশবাসীদের জন্য যা দিলে পেতাম আমরা অশেষ শ্রদ্ধা, ভালবাসা, তা না দিয়ে যা দিলাম তার বিনিময়ে তারা কি দেবে? দেবে চরম অভিশাপ, লাঞ্ছনা ও স্তূপীকৃত ঘৃণা। ছিঃ ছিঃ। এ আমরা কি করলাম অভিরূপ, এ আমরা কি করলাম? স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর চল্লিশ বছরেও একটা সুস্থিত ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবেই বিশ্বের জনগণের কাছে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারলাম না। গত চল্লিশ বছরে যা করলে চারিদিকে জ্বলে উঠতো সার্থকতার আলো, বেজে উঠতো আন্তরিক আনন্দের বাঁশরী, জয়ধ্বনিতে দিগঙ্গন হতো মুখরিত তা না করে সর্ব্বস্তরের মানুষের জন্য রেখে গেলাম ঘন অন্ধকার ও কণ্টকখচিত বিষগুল্মে পূর্ণ গভীর জঙ্গল! চল্লিশ বছর ধরে যা করলে মানুষের হৃদয় যেত ভরে তা না করে যা করলাম তার জন্য প্রতি পদক্ষেপে তাদের পদতলে ফুটবে বিষের কাঁটা যার যন্ত্রণায় অধীর হয়ে তারা আজীবন দেবে শত অভিশম্পাত! ছিঃ ছিঃ, অভিরূপ, এ আমরা কি করলাম বাবা!' বলতে-বলতে রামজেঠুর দু-চোখের কোল বেয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে দেখে সুমিতা তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে এসে তাঁর হাত দুটো ধরে বলল, 'জেঠু, এখন থাক এ-সমস্ত কথা, আপনার কষ্ট হচ্ছে।' তার মুখের দিকে চেয়ে রামজেঠু বললেন,' 'বাইরে কথাটা না হয় এখন বন্ধ করলাম কিন্তু ভিতরের বোঝাটা কি করে নামাই বল দেখি মা। ভিতরের আমিটা যে তোর এ রামজেঠুকে দিবারাত্র কুরে কুরে খাচ্ছে তার কি উপায় করি বল দেখি। সুমিতা, আমরা সবাই যে শেষ হয়ে যাচ্ছি রে!'

রামজেঠু যতক্ষণ বলছিলেন ততক্ষণ অভিরূপ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাঁর কথাগুলো শুনছিল। শেষের দিকে দেশের মানুষের

ভাবনায় চিন্তিত জেঠুকে কাঁদতে দেখে অভিরূপ বুঝল যে, রামজেঠু অতবড় শিল্পী অথচ দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য কত ভাবেন, কেঁদে মরেন, আর এরকম শত শত রামজেঠু হয়ত ভারতবর্ষের কোণে-কোণে বসে নীরবে অশ্রুপাত করে চলেছেন, অথচ যে সমস্ত উপরওয়ালার হাতে দেশের মানুষের দায়িত্ব তারা কিছুমাত্র বিচলিত নয়, নয় অণু-মাত্র চিন্তিত। কি আশ্চর্য্য, কি অদ্ভুত! এ দেশের কোটি কোটি মানুষকেও বলিহারী! তারা 'আমাদের সস্তায় ভাল খাদ্য দাও, আমাদের চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা দাও, আমাদের ভাল পথঘাট দাও, আমাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা কর, চুরি বন্ধ করে আমাদের ঘাড় থেকে করের বোঝা কমাও বলে কোটি কণ্ঠে কেন যে আওয়াজ তোলে না তা বোঝা যায় না। তবে কি এত দেখেও, এত কষ্ট স্বীকার করেও তারা শবদেহের মত জীবন্ত দেহ নিয়েই চিরকাল ঘুরবে? আর অন্য এক পক্ষ পাঁচ বছর অন্তর দিন দশেক হাত জোড় করে দুয়ারে-দুয়ারে ঘুরে মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে চিরকাল এই কোটি-কোটি কণ্ঠকে স্তব্ধ করে রাখবে? মাত্র কয়েক'শ মানুষ সত্তর কোটিকে বোকা বানিয়ে তাদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে তাদেরই বাড়ীর বাগানের চালডাল, শাকসজি, ফলমূল, লুট করে নিয়ে চলে যাবে? এই কি গণতন্ত্র? গণতন্ত্র মানে কি যা খুশী করবার অধিকার? যার যা খুশী বলবার অধিকার? পদে পদে শালীনতার সভ্যতার সীমা লঙ্ঘন করার নামই কি গণতন্ত্র? চারিদিকের ব্যাপার স্যাপার দেখে শুনে মনে হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষ গণতন্ত্র শব্দটার অর্থ নিজের মনের মত করে বানিয়ে নিয়েছে, বাঃ চমৎকার!' নিজের মনের ভিতর তোলপাড় করে কোন কূল কিনারা না পেয়ে, অভিরূপ ধীরে ধীরে রামজেঠুর পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে খেলার মাঠে এসে পৌঁছল।

মাঠে পৌঁছেই রামমোহন বাবু প্রশ্ন করেন, তাহলে এই তোমার পাণিপথের চতুর্থ যুদ্ধের প্রান্তর বাবাজী? এই সেই শকুন সৈনিকদের রণরঙ্গস্থল? বাঃ চমৎকার চৌকো মাঠটি তো।' অভিরূপ কিছু বলার আগে সুমিতা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল, 'হাঁ জেঠু আমরা যখন

স্কুলে পড়তাম তখন রাত্রে ঠিকা মজুরীতে লোকের ধান কেটে দিয়ে, চাঁদা তুলে, নিজেদের টিফিনের পয়সা জমিয়ে, বহু কষ্ট করে এই খেলার মাঠ তৈরী করেছিলাম, এখন এ মাঠে ছেলেদের খেলাধূলোর চেয়ে বেশী হয় উপরওয়ালাদের মিটিং, সার্কাস, যাত্রা, থিয়েটার ও ম্যাজিক প্রদর্শনী।' রাম জেঠু বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন 'সে কি? খেলাধুলো হয় না!' 'হয়, সে নামে মাত্র, আর তাও যা হয় তার মধ্যে খেলার চেয়ে মারামারিই বেশী হয়, এটাকে এখন ক্রীড়া প্রাঙ্গন না বলে লেঠেল-অঙ্গন বলাই বোধ হয় ভাল,' সুমিতার কণ্ঠে আক্ষেপের সুর ধ্বনিত হতে শুনে রাম জেঠু বলে উঠলেন, 'গ্রামের ছেলেদের, ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝাও যে এটা তাদের সম্পত্তি, এটা সারা বছর ধরে নানা রকম বাণিজ্য করবার স্থান নয়, তারপর সকলে মিলে যারা এটাকে বাণিজ্যকেন্দ্র করে তুলতে চাইছে তাদের নিকট একজোট হয়ে প্রতিবাদ কর তবেই আবার খেলার অধিকার ফিরে পাবে। ছেলেদের তো আগে বোঝা উচিত যে স্কুল কলেজ পড়ার জন্য, খেলার মাঠ খেলারই জন্য, তবে না তারা তাদের অধিকার বজায় রাখতে পারবে। রামজেঠুর কথার মাঝখানেই সুমিতা বলল, 'আমরা থাকতে এই মাঠের চারধারে কি সুন্দর বাগান করেছিলাম কত রকমের ফুলের গাছ লাগিয়েছিলাম আর এখন দেখুন কিচ্ছু নেই, একেবারে ন্যাড়া মাঠ উদোম হয়ে পড়ে আছে; মাঠের সে বাহারই নেই। ফুলগাছগুলোকে পর্য্যন্ত ধ্বংস করে ফেলেছে!' 'জানো তো ফুলগাছ হত্যা আর শিশুহত্যা সমান অপরাধ!' বলে রামজেঠু মুখ তুলে চতুর্দ্দিকে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'সত্যি মাঠটি ভারী সুন্দর, কেমন সুন্দর সমান এবং ঘাসের সবুজে পরিপূর্ণভাবে মোড়া! এই মাঠকে ধ্বংস করতে মায়া লাগে না!' সুমিতা বলল, যারা ধ্বংসের খেলায় মাতে তাদের যদি মায়ামমতা বোধ থাকত, তারা কি করছে তা যদি বুঝতে পারত তা হলে তারা ধ্বংসের খেলায় তো লিপ্তই হত না। একটা জিনিষ গড়া কত কঠিন সে কথা তাদের কে বোঝাবে? আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে দ্বিতীয় তাজমহল আর হলো না, রবীন্দ্র সেতু আর একটা করা যাচ্ছে

না, অথচ চতুর্দ্দিকে শুধু ধ্বংসের খেলা। কোন জিনিষটা কে কত তাড়াতাড়ি ধ্বংস করে শেষ করে দিতে পারে এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সব সময় যেন তার প্রতিযোগিতা চলছে।' 'তুমি ঠিক বলেছ মা-মণি, কিন্তু হায় এ-তরঙ্গ রোধিবে কে? কে ভেঙে দেবে তাদের কঠিন নিষ্ঠুর হাত, যারা সারা ভারতবর্ষব্যাপী আজ শুধু ধ্বংসের খেলায় মত্ত?' কথা থামিয়ে রামজেঠু ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চল এবার ফেরা যাক, সন্ধ্যায় আবার আসর বসাতে হবে।'

সকলে কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করে রাস্তায় সুমিতাদের বাড়ীর কাছে আসতেই সুমিতা হাত ধরে টানাটানি করে জেঠুকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বাবা-মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে তাঁরা প্রবীণ শিল্পীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে যথাসাধ্য আপ্যায়িত করলেন। কিছুক্ষণ তাঁদের সঙ্গে গল্পগুজব করে রামমোহন-বাবু অভিরূপের বাড়ীতে এসে বৈকালিক স্নানপর্ব সমাধা করে জামাকাপড় পরিবর্ত্তন করে দলবল নিয়ে আসরে গিয়ে যখন বসলেন তখন সন্ধ্যা ছটা।

সঙ্গীতের আসরে বসে তিনি প্রথমেই হাওড়া স্টেশনে সুমিতা ও অভিরূপের সঙ্গে আচম্বিত পরিচয়ের কথা সংক্ষেপে সেরে নিয়ে তাদের যে নিজের সন্তানের মতই ভালবাসেন এবং তাদের টানেই এই গ্রামে এসেছেন একথা জানিয়ে গ্রামবাসীদের আতিথেয়তা ও প্রীতিতে তিনি ও তাঁর দলের সকলে মুগ্ধ একথা বলে, সকলকে নমস্কার ও ধন্যবাদ জানিয়ে গান ধরলেন। প্রথমেই দেশমাতার বন্দনা গান, বন্দেমাতরম্ দিয়ে শুরু করে পরপর আরও খান পাঁচেক দেশপ্রেমের গান গাইলেন। তাঁর গম্ভীর কণ্ঠে সুললিত সুরের লয়ে-তানে কুরচি গ্রামের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে তাঁর আগমনের সংবাদ লোক মুখে প্রচারিত হয়ে যাওয়াতে শুধু কুরচি গ্রামেরই নয়, আশ পাশের দু-চার খানা গ্রামের মানুষও কুরচি গ্রামের বারোয়ারী তলায় এসে ভীড় জমিয়ে ছিল। রামবাবুর ছ-খানি দেশ-বন্দনার গান যখন শেষ হলো তখনো কাতারে-কাতারে মানুষ এসে কুরচি গ্রামের

বারোয়ারীতলার বিস্তীর্ণ স্থান পূর্ণ করে তুলছে। দেশ প্রেমের গানের পর তিনি পূরবী রাগে বিলম্বিত ত্রিতালে তানসেন রচিত ধ্রুপদ 'বহুর বজাও বংশী' এবং কল্যাণ রাগের চৌতালে দরিয়া-খানের রচনায় ধ্রুপদ 'জেতে গুণী জ্ঞানী' গান দুখানি গাইলেন। তাঁর হৃদয়-দ্রাবী কণ্ঠের সুধামাধুর্য্যে সুর ও স্বরের উত্থান পতনের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে উপস্থিত শ্রোতৃকুল তৃষিত চাতকের বৈশাখী দিনের বারি-ধারা পানের আনন্দ অনুভব করতে লাগল, নিঃশব্দ অনড় হয়ে বসে তারা গান শুনতে থাকল। এক সময় ধ্রুপদ শেষ হলে শ্রোতাদের কাছ থেকে অনুরোধ এল দু-একখানা আধুনিক বাংলা গানের জন্য। তিনি গ্রাম্য শ্রোতাদের খুশী করবার জন্য তাঁরই প্রদত্ত সুরের দুখানি আধুনিক গান গাইলেন :

চারিদিকে দেখি মিথ্যারই জয়
সত্যের নেই দাম,
আঁধার এ-যুগে আর একবার
এস রঘুবীর রাম
জয় রাম রাম রাম রাম জয় রাজারাম।
ভায়ের বুকেতে ছুরি মারে ভাই
নেই কোন স্নেহ প্রীতি,
স্বার্থের ঘোরে অন্ধ মানুষ
ডুবিয়া মরিছে নিতি
কুটিলতা যত ভেঙ্গে দিতে তুমি
পুনরায় এস রাম,
জয় রাম রাম রাম রাম জয় রাজারাম।
পড়ে নাক কেউ বেদ-বাইবেল
অমর গ্রন্থ গীতা,
পাপের শ্মশান এই সমাজেতে,
বধু-বেশে পোড়ে সীতা।
এই অনাচার শেষ করে দিতে

এবার এস হে রাম,
জয় রাম রাম রাম রাম জয় রাজারাম

রামবাবু প্রথম গান শেষ করে দ্বিতীয় গান ধরলেন।

হাত দুটি ধরে মিনতি করি হে
এবার দাও বিদায়,
বহুদিন আগে এসেছিনু আমি
এখন ছাড়ো আমায়।
এই পৃথিবীতে মানুষ কোথায়
রয়েছে মূর্ত্তি অনেক,
খেয়ালের বশে খেলে যায় তারা
মাত্র বছর কয়েক,
তার পরে আর চিহ্ন তাদের
থাকে না এই ধরায়॥
অমন মূর্ত্তি হতে চাইনিক
চেয়েছি মানুষ হতে,
সৃষ্টির মাঝে সামান্য কিছু
আমিও পেরেছি দিতে,
এই সুখ মোর এ মোর গর্ব্ব
জীবনের এই মেলায়।

গান শেষ হলে হারমোনিয়াম ছাড়বার পূর্ব্বে তিনি হারমোনিয়ামে আরও দু-চারখানি জনপ্রিয় গানের সুর বাজিয়ে আসরে উঠে দাঁড়ালেন। এবার বাদ্যযন্ত্র বেহালা তুলে নিয়ে খান কয়েক বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীতের সুর বাজিয়ে সবশেষে ধরলেন ইয়ামা ইলেক্ট্রো-অরগ্যান। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে নানারকম সুরে নানা বাজনা-বাজিয়ে তিনি যখন যন্ত্র ছাড়লেন তখন রাত্রি প্রায় দশটা। তাঁর বাজনা শেষ হতেই অভিরূপ তাঁর পাশে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে

ধন্যবাদ জানিয়ে গ্রামবাসীদের তরফ থেকে একটি ফুলের তোড়া ও পট্টবস্ত্রের জোড় তাঁর হাতে তুলে দিলে তিনি সভাস্থলে দাঁড়িয়ে তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে সুমিতাকেও ইশারায় কাছে ডেকে নিয়ে তাঁরই দলের একজনকে নির্দ্দেশ দিলেন তাঁদের একটা ছবি তুলতে। তিনজনের ছবি ওঠার পর তিনি সভাস্থলের মাঝখানে নেমে গ্রামবাসীদের সঙ্গে আরও দু-খানা ছবি তুলে সকলকে নমস্কার জানিয়ে অভিরূপের সঙ্গে তার বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। গ্রামের বারোয়ারীতলা থেকে অভিরূপদের বাড়ী সামান্য পথ কিন্তু এইটুকু পথেই তাঁর সঙ্গী হবার জন্য শত-শত স্ত্রী-পুরুষ তাঁর পিছন-পিছন চলতে লাগল। অবশেষে অভিরূপদের বাড়ীতে পৌঁছে আর একবার সকলকে নমস্কার করে রামবাবু ঘরে ঢুকে গেলেন।

পরদিন সকালে রামজেঠু বিদায় নিয়ে চলে গেলে সুমিতা ও অভিরূপের সঙ্গে গোটা গ্রামটার মানুষের মনের ভিতর যেন কি একটা হারানোর বেদনায় রণিত হয়ে উঠল। পূজা শেষে বিজয়ার পর দূর্গা-দালানের সামনে দাঁড়াল মনের কোনে যে ব্যথার তাপ অনুভূত হয়, যে নীরব আর্ত্তধ্বনি জেগে ওঠে কুরচি গ্রামের বারোয়ারী তলার দূর্গা মণ্ডপের সামনে দাঁড়ালে আজকে এ গ্রামের অধিবাসীদের চিত্ত সেইরূপ ব্যথাতুর হয়ে উঠছিল। একটি মাত্র সন্ধ্যায় রামবাবু যেন তাদের ঘরের লোক হয়ে পড়েছিলেন। রামবাবুর বিদায় তাদের কাছে কোন স্বজন বিদায়ের মতই মনে হল। রামবাবুর মত গুণী, সর্ব্বজন-শ্রদ্ধেয় শিল্পী যে অভিরূপ-সুমিতার জন্য আজ তাদের আপনজন হয়েছেন এ কথাটা চিন্তা করে গ্রামের সর্ব্বস্তরের মানুষের ওদের দু-জনের প্রতি প্রীতি আরও বর্দ্ধিত হল।

আরও দিন দশেক গ্রামে কাটিয়ে অভিরূপ ও সুমিতা গ্রামের সকলের বাড়ী-বাড়ী গিয়ে সকলকে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকবার অনুরোধ করে বিপ্লব, মন্টু, এবং আরও কিছু ছেলের উপর সবাইকে দেখাশুনা করবার এবং খবরাখবর নেবার ভার অর্পণ করে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হল। যাত্রার সময় গোটা গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা

ওদের দু-জনকে বাসস্ট্যাণ্ড পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। বাসে উঠে কিছুদূর গিয়ে বসার জায়গা পেয়ে অভিরূপ ও সুমিতা গত কয়েকদিনের সমস্ত ঘটনা নিয়ে আপন-আপন মনে পর্য্যালোচনা করতে লাগল। তাদের মনে হল রামজেঠু আচম্বিতে এসে গ্রামবাসীদের নিকট তাদের মূল্য বেশ কিছুটা বাড়িয়ে দিয়ে গেলেন। মনে-মনে তারা রামজেঠুর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করল। যথা সময়ে কলকাতা পৌঁছে তারা আবার পড়াশুনায় মন দিল, কারণ সামনে আর মাস কয়েক পরেই য়্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ্ সার্ভিসের পরীক্ষা। পোষ্ট গ্রাজুয়েট পড়তে-পড়তেই আই-এ-এসের জন্য তৈরী হচ্ছিল, এবার শুধু আই. এ. এসের জন্যই তৈরী হতে লাগল। সুমিতা আবার আই, এ, এস-এ কোচিং নেওয়ার সময় ল-কলেজেও ভর্ত্তি হল।

মাস দুয়েক যেতে-না-যেতেই হঠাৎ একদিন মামীমার ডাকে বেহালার বাড়ীতে সুমিতার ঘুম ভাঙ্গলো। সদ্য ঘুম-ভাঙা চোখ রগড়াতে-রগড়াতে সুমিতা বাইরে বের হয়ে এলে বৈঠকখানা ঘরে বসে থাকা একদল সাংবাদিক বাইরে এসে তাকে ছেঁকে ধরল, কেউ বলল, '—ম্যাডাম, গুড মর্নিং, উইস্ ইউ এ হ্যাপী লাইফ,' কেউ বলল, 'নমস্কার ম্যাডাম, আপনি রেকর্ড করেছেন।' প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়ে সুমিতা প্রশ্ন করল, 'কি ব্যাপার? হঠাৎ এতগুলি দাদা এই ছোটবোনকে এক সঙ্গে আশীর্ব্বাদ দিচ্ছেন, ব্যাপারটা কি?' তার কথায় সাংবাদিকগণ একসঙ্গে হৈ হৈ করে উঠলেন, 'ব্যাপার কি মানে? আপনি এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীতে এম. এ. পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হয়েছেন জানেন? গত পনের বছর ইংরাজীতে কেউ ফার্ষ্ট ক্লাশ পায় নি, আর টোটাল কত হয়েছে জানেন? টোটাল ন-শ বাহাত্তর, তার অর্থ এইটটি ওয়ান পার্সেণ্ট।' এতক্ষণে সুমিতা বুঝতে পারল যে তার পরীক্ষায় অসম্ভব ভাল ফল হয়েছে, তাই সাত সকালে এতগুলি সংবাদিক মামার বাড়ীতে তার ইণ্টারভিউ নিতে এসেছেন। সুমিতা খুশীতে উচ্ছল হয়ে সকলকে সাদরে বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে নিজে মুখহাত ধুয়ে সজ্জা পরিবর্ত্তন করে দু-হাতে

খাবারের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল। মোট সাতজন সাংবাদিককে সাতখানা প্লেট দিয়ে জলের গ্লাসগুলি তাঁদের সামনে রেখে সে বের হয়ে যাচ্ছিল এমন সময় একজন কম বয়স্ক সাংবাদিক বলল, 'ম্যাডাম, প্লেটে এত বড়-বড় রসগোল্লা কেন? পরীক্ষায় আপনি তো গোল্লা পাননি, আপনি কি রসগোল্লা খাইয়ে আমাদের গোল্লায় পাঠাতে চান?' তাঁর রসিকতায় একসঙ্গে সকলে হো হো করে হেসে উঠল, সুমিতাও সে হাসিতে যোগ দিল?

এরপর চা পানান্তে ইণ্টারভিউয়ের জন্য সাংবাদিকরা সুমিতাকে তাদের কাছে বসতে অনুরোধ করলে সুমিতা একটা চেয়ার নিয়ে তাঁদের সামনে বসল। বাবা-মায়ের নাম, গ্রামের নাম ইত্যাদি বিষয়ে খোঁজখবর নেওবার পর একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, 'এরপর আপনার কি করার ইচ্ছা?' সুমিতার জবাব, 'আই এ. এস এবং ল পড়ছি এখন। এ জবাবে সকলে উৎসাহিত হয়ে প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করল, 'ম্যাডাম, হঠাৎ এরকম কম্বিনেশন কেন?' সুমিতার জবাব, 'কারণ এ দেশে য়্যাডমিনিস্ট্রেটিভ্ অফিসারদের হাতে অঢেল সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা জনগণের স্বার্থে জনগণের সেবা মূলক কাজ কর্ম খুব কমই করেন, তাই এই সার্ভিসে ঢুকে জনগণের সেবা মূলক কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই, সঙ্গে সঙ্গে সমর‍্যাঙ্কের কলিগদের অনুরোধ করে করে তাদের আজকের এই মানসিকতার পরিবর্ত্তন ঘটাতে চাই, যাতে তাঁরাও সাধারণ মানুষের দোর-গোড়ায় পৌঁছে তাদের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করার কাজে সহযোগিতা করতে পারেন।' এই সময় একজন সাংবাদিক হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেন, 'আপনি অনুরোধ করলেই তাঁরা শুনবেন সে-বিষয়ে কি আপনি নিশ্চিত?' 'না, মোটেই নই, তবে একটা টিয়া পাখীকে বুলি শেখাতে-শেখাতে সে যেমন একদিন হঠাৎ 'রাধাকৃষ্ণ' বলে ডেকে ওঠে তেমনি একদল মানুষের কাছে রোজ যদি অনুরোধ করা হয় তবে তাঁরাও নিশ্চয়ই সেবামূলক কাজের দিকে একটু-আধটু লক্ষ্য বা নজর দেবেন।' একজন সাংবাদিক বলে ওঠেন, 'কিন্তু তাঁরা তো উপরওয়ালাদের হাতের পুতুল,

উপরওয়ালারা যে ছকে চলতে বলবেন তাঁদের তো সেই ছকেই চলতে হবে, না হলে ট্রান্সফার, সাস্‌পেন্‌শন্‌ শো-কজ আছেই, চাই কি, পৃষ্ঠদেশে দানাও ঢুকে যেতে পারে, সেটা ভেবেছেন কি?' 'দেখুন সমাজে পরিবর্ত্তন আনতে গেলে কিছু লোককে জীবন দিতেই হয়, য়্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটিভ্‌ সার্ভিসের লোক বা আই. পি. এস্‌ এর লোকদের মধ্যেও ক্লীবত্ব এসে গিয়েছে এবং হুকুম অন্যায় বুঝেও তারা অনেক অন্যায়ের সঙ্গে সমঝোতা করে চলছেন ঠিকই, কিন্তু একটা গুণ্ডা যদি কোন পুলিস সার্ভিসের লোকের ছেলেকে মার্ডার করতে আসে বা তাঁর মেয়েকে রেপ করতে আসে তখন কি তিনি সেই গুণ্ডার সঙ্গে আপোষ করে নিজের ছেলেকে এগিয়ে দেবেন, না, মেয়েকে বিলিয়ে দেবেন? তখন তাঁর হাতের রিভলবার নিশ্চয়ই গর্জ্জে উঠবে।' 'সে তো নিজের ছেলের বেলায়, কিন্তু অপরের ছেলে-মেয়ের বেলায় তো তা হচ্ছে না, বরং রিপোর্ট ঘুরিয়ে সত্য ঘটনা ঢাকা দিয়ে কোন রকমে নিজেদের দায়িত্ব খালাস করেন,' বলে একজন সাংবাদিক মন্তব্য করতেই সুমিতা বলে উঠল, 'হ্যাঁ এর জন্য দায়ী উপরওয়ালারা। তাঁদের চাপে পড়েই অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পুলিশের লোকদের অনেক কাজ করতে হয় যেটা হওয়া উচিত নয়। শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল প্রযুক্তিবিদ, পুলিস, সাংবাদিক এঁদের দায়িত্ব অসীম। সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে গেলে এঁদের সততা অবশ্য প্রয়োজনীয় একথা এঁরা ভুলে যান এবং দু-চারজন উপরওয়ালার অন্যায় চাপের কাছে নতি স্বীকার করে নিজেদের মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দেন বলেই আজ সমাজ ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। এই ধরুন না, অনেক সত্য আপনারা অর্থাৎ সাংবাদিকগণ যদি যথাসময়ে উদ্‌ঘাটন না করে দেন তো আমরা সাধারণ মানুষরা সে সমস্ত বিষয়ে কিছুই জানতে পারি না, অন্ধকারে থেকে যাই। সত্যকে উদ্‌ঘাটন করা যেমন সংবাদ পত্রের দায়িত্ব, উপরওয়ালাদের ভয়ে যেমন সাংবাদিকগণ কোন সময়েই ভীত হয়ে চুপ করে থাকেন না বা সত্যকে রঙ বুলিয়ে জটিল করে জনগণকে বিপথে চালিত করেন না বরং শাস্তি ভোগ করেন; অর্থাৎ উপরওয়ালাদের বক্তব্যগুলি যথাযথ ভাবে

পরিবেশন করেন যাতে জনগণ তাদের অভিভাবক ঐ উপরওয়ালাদের চরিত্রগুলির সম্পর্কে পূর্ণ ধারনা পেতে পারে এবং তাদের সম্বন্ধে সাবধান হবার সুযোগ পেতে পারে, তেমনি সমাজের অন্য স্তরের সকলেরও উচিত মানুষের জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য, নিজের জীবন বিপন্ন হলেও সত্যের আলো বুকের ভিতর জ্বালিয়ে রেখে নিজের কর্ত্তব্য-কর্মে অবিচল থাকা। লোভ, লালসা, ভয়ের কাছে ক্রমাগত নতি স্বীকার করে করেই আমরা আজ সর্ব্বনাশের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছি। এখনও যদি আমরা সাবধান না হই তো সমগ্র জাতি অদূর ভবিষ্যতে ধ্বংস হয়ে যাবে, আবার আমরা অপরের পদানত হয়ে পড়ব।'

সুমিতার কথার মাঝখানেই, 'এক্সকিউজ মি' বলে অন্য একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, 'য়্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ্ সার্ভিসে আপনার আসার আগ্রহটা কেন সেটা তো বোঝা গেল কিন্তু একই সঙ্গে আপনি আইন পড়ছেন কেন? এটা দিয়ে কি সুবিধা হবে বলে মনে করেন?' 'দেখুন য়্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ্ সার্ভিসের এবং পুলিস সার্ভিসের লোকদের আইন পড়া থাকলে বহু সুবিধা, যেমন ধরুন, কোন আসামীর বিরুদ্ধে রিপোর্ট লিখবার সময় আইনের ধারাগুলি যথাযথ ভাবে ব্যবহৃত হলে আসামী কোর্ট থেকে বেকসুর খালাস পেয়ে বেরিয়ে আসতে পারে না বা চট্ করে জামিন পায় না। তাছাড়া প্রয়োজনে দুঃস্থ গরীব লোকের হয়ে বিনা পয়সায় কোর্টে দাঁড়িয়ে সওয়ালও করা যায়, তাতে বহু দুঃস্থ লোকের উপকার হতে পারে।' 'ম্যাডাম আপনাকে ধন্যবাদ, আপনার জীবনের লক্ষ্য সার্থক হোক আমরা সকলে আপনার জন্য শুভ কামনা করছি, কিন্তু যাবার আগে কাগজে ছাপবার জন্য আপনার ফটো তুলতে চাই, কি, অনুমতি দিচ্ছেন তো?' বলে একজন সাংবাদিক উঠে দাঁড়াতেই সুমিতাও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সচ্ছন্দে।' তার অনুমতির সঙ্গে-সঙ্গে ফ্লাশ-গানের আলোয় ঘর ভরে গেল। সাতজন সাংবাদিক পরপর নিজের কাগজের জন্য সাত খানা ছবি তুলে বিদায় নিলে সুমিতার বন্দী দশা কাটল। এবার

সে সুশান্ত, তনু ও বিনুকে নিয়ে হুল্লোড়ে মেতে উঠল। পরীক্ষায় সাফল্যের আনন্দে কিছুটা খুশী হয়েই আজ সে সামান্য হুল্লোড়ে যোগ দিল, কিন্তু হুল্লোড়ের ফাঁকে-ফাঁকেও একজনকে মনে পড়তে লাগল যার জন্য মনটা তার বিষণ্ণ হয়ে উঠল। অভিরূপের কাছে যাবার ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু যতই আনন্দ হোক শুধুমাত্র পুরুষ পরিশোভিত মেসে অভিরূপের কাছে যেতে তার মন দ্বিধাগ্রস্ত হল, তাই না যেতে পারার বেদনা বুকের ভিতর পুঞ্জীভূত রেখেই সে সারাদিন ভাই-বোনদের সঙ্গে মাতামাতি ও সংসারে টুকিটাকি কাজ করতে লাগল।

ওদিকে বিকেলের দিকে ইউনিভার্সিটিতে এম. এস-সি পরীক্ষায় রেজাল্ট কবে বের হবে জানতে গিয়ে অভিরূপ সুমিতার রেজাল্টের কথা জানতে পারল। সঙ্গে-সঙ্গে সে সূর্য্য সেন ষ্ট্রীটের পুঁটিরাম সুইটস্ থেকে সন্দেশ কিনে বেহালার দিকে পা বাড়াল। সতীনাথ বাবুর বাড়ীতে এসে, 'কইরে সুশান্ত, তোর বড়দি কই ?' বলে হাঁক দিতেই রান্নাঘরে মামীমার পাশে উপবিষ্টা সুমিতার বুকের ভিতরের সমস্ত রক্ত ছলাৎ করে উঠল। সারাদিন ধরে মনে-মনে যার উপস্থিতি সে কামনা করেছে সেই অভিরূপের আচম্বিত এই ডাকে কে যেন তার মুখে লজ্জার আবীর ঢেলে দিল। সে ভুলে গেল যে, সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থানাধিকারিনী রমণী। গর্ব করে মাত্র মাস কয়েক আগে সে অভিরূপকে বলেছিল যে, তার রেজাল্ট ভাল হবে কিন্তু রেজাল্ট ভাল হওয়া সত্ত্বেও তার হৃদয়ের অন্দরে কে যেন এখন একরাশ লজ্জা এনে সমস্ত উচ্ছলতা ঢেকে দিতে চাইল। অবনত মুখে অতি সন্তর্পনে সে ঘর থেকে উঠে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই অভিরূপ তার দিকে চেয়ে দেখল এ যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ষ্ট-গার্ল নয়, এ যেন কোন সদ্য বিবাহিতা নববধূর ব্রীড়াবনতা আনন দর্শন করছে। কাছে গিয়ে সুমিতার চিবুকে হাত দিয়ে তার মুখটা তুলে ধরে অভিরূপ বলল, 'জীবনে এই প্রথম আমি দারুণ খুশী,' বলে প্যাকেট থেকে একটা সন্দেশ বের করে সুমিতার মুখে ভরে দিল। ঢিপ করে একটা প্রণাম করে সুমিতা

'যাও' বলে দৌড়ে গিয়ে তার নিজের ঘরে ঢুকল। সুমিতার পিছনে-পিছনে মামীমাও এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন, এবার অভিরূপ সুরুচিকে প্রণাম করে সন্দেশের প্যাকেটটা সুশান্তর হাতে ধরিয়ে দিয়ে সোজা গিয়ে সুমিতার ঘরে ঢুকল। মামীমা সঙ্গে-সঙ্গে এসে অভিরূপকে বললেন, 'আজ তুমি এখানেই থেকে যাও, একেবারে কাল মেসে ফিরবে।' সুরুচির একথায় অভিরূপ বলল, 'না মামীমা,, আজকালের মধ্যেই আমার রেজাল্ট আউট হবে, সুতরাং এখানে থাকা চলবে না,' 'কেন চলবে না বাবা, রেজাল্ট যখন বের হবে তখন না হয় দেখতে যাবে,' বলে সুরুচি থামতেই অভিরূপ বলল, 'হ্যাঁ মামীমা সেই জন্য ইউনিভার্সিটির কাছাকাছি থাকাই ভাল, তা হলে চট্ করে খবরটা জানতে পারব, এতদূরে থাকলে খবরটা পেতে দেরী হবে।' সুরুচি হাসতে-হাসতে বললেন, 'তোমার খবর তো লোকে নিয়ে আসবে বাবা, ও ব্যাপারে দৌড়ঝাঁপ না করাই ভাল, বরং তুমি কালকের দিনটিও এবাড়ীতে থেকে যাও, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্পগুজব করে সময়টা কাটাও,' সুরুচির কথা শেষ হতে না হতে দরজার কাছে থেকে সতীনাথ বাবু বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ বাবা, এ সময় তোমার বেশী একলা থাকা ভাল নয়, তাতে ভীষণ টেনশন হবে। তুমি দুদিন এখানেই থেকে যাও, আমি বরং প্রত্যেকদিন অফিস থেকে ফেরবার পথে খবরটা নিয়ে আসব।'

সতীনাথ বাবুর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে অভিরূপ বাইরে তাকিয়ে বুঝল কথাবার্তার মাঝখানেই তিনি কখন এসে মামীমার পিছনে দাঁড়িয়েছেন। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে মামাবাবুকে প্রণাম করে আমতা-আমতা করে অভিরূপ বলল, 'কিন্তু', 'এরপর আর কিন্তুব কি আছে বাবা? তোমার মামাবাবু তো খবর এনে দেবেন বলেছেন, তা ছাড়া আজ সুমিতার রেজাল্ট বেরিয়েছে, ঠিকই করেছিলাম তুমি এলে, রাত্রে একটু পায়েস টায়েস রাঁধব, সবাই মিলে একটু আনন্দ-আহ্লাদ করব কিন্তু তুমি এসেও যদি চলে যাও তাহলে আমরা সবাই তো দুঃখ পাবই, আর ও বেচারী মরমে মরে থাকবে।' মরমে মরে থাকবে বলে

মামীমা যে সুমিতার উদ্দেশেই ইঙ্গিত করলেন এটা বুঝে অভিরূপও লজ্জা পেল। মনে-মনে বুঝল, তাহলে মামা-মামীর চোখকে তারা ফাঁকি দিতে পারে নি। তাঁরা অবশ্যই জানেন যে, তারা দুজনে দুজনকে ভালবাসে। ব্যাপারটা অনুধাবন করে অভিরূপ আর কথা না বাড়িয়ে থেকে যাবার কথাতেই সায় দিল।

অভিরূপের অভিমত পেয়ে মামা মামী সে স্থান ত্যাগ করতেই সুমিতা আস্তে-আস্তে হাততালি দিয়ে, 'কেমন জব্দ, ভাল-ছেলে কেমন জব্দ? বেশ হয়েছে আমার মনে খুব সুখ হয়েছে, বেশ হয়েছে,' বলে তিড়িং-তিড়িং করে ঘরের মেঝেয় লাফাতে লাগল, আর অভিরূপ, 'ওরে পাজী', বলে তার দিকে তাড়া করে এল। অভিরূপ তাড়া করে আসতেই সুমিতা ঘরের দরজার পর্দাটা চট্ করে ফেলে দিয়ে একলাফে গিয়ে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখটা ঘষতে লাগল। সুমিতা আচম্বিতে জাপটে ধরায় অভিরূপ প্রথমটায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল কিন্তু মুহূর্ত কয়েকের মধ্যেই সে বুঝতে পারল যে, এটা পরীক্ষার ফল ভাল হওয়ায় সুমিতার মনের আনন্দের অভিব্যক্তি, তাই আজ অভিরূপ সুমিতাকে তার আনন্দের ভাগটুকু পুরোপুরি উপভোগ করতে দিল। তার মুখটা মিনিট খানেকের জন্য নিজের বুকে চেপে ধরে মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিল। অভিরূপের আদরের স্বীকৃতিটুকু পেয়ে সুমিতা নিজেকে সংযত করে নিয়ে সামান্য দূরে সরে দাঁড়িয়ে তার দিকে ঘুরে বলল, 'তুমি বোস, আমি তোমার জন্য জলখাবার নিয়ে আসি।' অভিরূপ বলল, 'অনেকটা আনবে, সেই কোন সকাল দশটায় খেয়েছি, পেটে বাঘ-সিংহ এখন উঠ-বোস করছে।' অভিরূপের কথায় হাসতে-হাসতে সুমিতা বের হয়ে গেল এবং মিনিট পাঁচেকের মধ্যে এক থালা মুড়ি, চানাচুর, শশা-কুচি, পিঁয়াজ-কুচি, সিঙ্গারা ও দু-তিন রকমের সন্দেশ নিয়ে হাজির করল। থালার সাইজ ও খাবারের পরিমাণ দেখে অভিরূপ বলল, 'আমাকে কি লঙ্কেশ্বরের একজন বংশধর বলে মনে হয়?' সোজাসুজি নিজেকে রাক্ষস না বলে অভিরূপ যে ঘুরিয়ে শুনিয়ে দিল সে রাক্ষস নয়, এটা বুঝে সুমিতা

নাতি-উচ্চ কণ্ঠে হেসে মন্তব্য করল, 'তুমিই তো বললে ভীষণ খিদে পেয়েছে, এক মরাই মুড়ি খাবে।' 'য়্যাই য়্যাই পাজী, আমি বলেছি এ-কথা?' বলে মুড়ির থালাটা খাটের পাশে নামিয়ে রেখে অভিরূপ এবার নিজেই গিয়ে তাকে টেনে ধরল। তার হাতে টান পড়তেই সুমিতা পোষা ময়নার মত নিজের মুখটা অভিরূপের বুকে গুঁজে দিল। সুমিতার গাল দুটোয় একটু হাত বুলিয়ে অভিরূপ, 'আজ একই থালা থেকে তুমিও আমার সঙ্গে খাও,' বলে বাইরে গিয়ে সুশান্ত, চিনু, বিনুকেও ডেকে নিয়ে এল এবং সকলে মিলে একই থালা থেকে মুড়ি খেতে লাগল।

মুড়ি খাওয়া শেষ হতে-না-হতেই দরজার কলিং বেলটা বেজে উঠতে সুমিতা দৌড়ে দরজায় গিয়ে দেখল সকালের সেই সাংবাদিকের দল বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। সে তাড়াতাড়ি তাঁদের সকলকে বাড়ীতে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসে বৈঠকখানা ঘরে বসাতেই প্রায় সমস্বরে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করে উঠলেন, 'ম্যাডাম, অভিরূপ ঘোষ কি এ বাড়ীতে এসেছেন?' 'কেন বলুন তো?' বলে তাঁদের দিকে চাইতেই একজন সাংবাদিক বললেন, 'আর বলবেন না, একই খনিতে এমন উজ্জ্বল দুটি হীরকখণ্ড লুকিয়ে আছে তা আমরা ভাবতেই পারিনি, সকালে আপনার জন্য আর এখন এই মিঃ ঘোষের জন্য আমাদের এখানে ছুটে আসতে হয়েছে। এর কারণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবছর ব্যবহারিক রসায়নে অভিরূপ ঘোষ রেকর্ড মার্কস নিয়ে ফার্স্ট হয়েছেন। অনুগ্রহ করে তাঁকে একবার ডেকে দিন।' সুমিতা নেহাতই মজা করবার জন্য বলল, 'কিন্তু তিনি তো এখানে থাকেন না।' 'না, থাকেন না তা জানি, কিন্তু ম্যাডাম, তিনি আজ নিশ্চয়ই এখানে এসেছেন, কারন আমরা মেসে গিয়ে তাঁর রুমমেটের কাছে সন্ধান নিয়ে তবেই এখানে এসেছি। প্লীজ ম্যাডাম, প্লীজ, তাঁকে একবার ডেকে দিন,' বলে একজন সাংবাদিক অনুরোধ জানালেন।

অভিরূপ ঐ ঘরেরই একটি চেয়ারে বসে একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল। সাংবাদিকরা অনুনয়ের সুরে পুনরায় সুমিতার উদ্দেশে

বলে উঠলেন, 'ম্যাডাম, আমাদের হাতে সময় খুব কম, কারণ দেখুন এখন সন্ধ্যা প্রায় ছটা বাজে, এরপর তাঁর ইন্টারভিউ নিয়ে অফিসে গিয়ে রিপোর্ট তৈরী করে দিলে তবেই ভোরবেলায় কাগজে বের হবে। আপনি এবং মিঃ ঘোষ যেহেতু একই গ্রামের বাসিন্দা এবং ছুজনেই যেহেতু বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাইগ্রেশন নিয়ে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এসেছেন সেহেতু আপনাদের এই রেজাল্টের ব্যাপারটা একটা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আমরা ছাপতে চাই এবং দুজনের ছবিও পাশাপাশি রাখতে চাই। প্লীজ ম্যাডাম, অভিরূপ বাবুকে একটু ডেকে দিন।'

সুমিতা মজা করছে বুঝে অভিরূপ এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, কিন্তু সাংবাদিকদের কথার গুরুত্ব বুঝে এবার সে চেয়ারটা ঘুরিয়ে সোজাসুজি তাঁদের দিকে চেয়ে বলল 'সে কি, আপনারা আমাকে বাবু করে ফেলছেন যে? আমি আপনাদের ছোট ভাই।' তার কথায় বিস্মিত দৃষ্টিতে অভিরূপের দিকে একবার চেয়ে সুমিতার দিকে প্রশ্নাতুর ভঙ্গীতে চাইতেই সুমিতা বলল, 'হ্যাঁ উনিই অভিরূপ ঘোষ আমার রেজাল্ট জানতে পেরে উনি আমায় কনগ্রাচুলেট করতে এসেছেন।' 'ওঃ হাউ ফাইন,' আমাদের সাংবাদিক জীবনে এও একটা রেকর্ড। একই বাড়ীতে একই সঙ্গে একই গ্রামের বাসিন্দা একই বিশ্ববিদ্যালয়ের দু-দুটো বিষয়ের প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্র ছাত্রীকে দেখতে পাওয়া, সত্যই এটা একটা অদ্ভুত যোগাযোগ,' বলে সাংবাদিকগণ হাসতে থাকেন। এরপর সাংবাদিকদের নিকট নিজের পারিবারিক পরিচয় রেখে অভিরূপ তাঁদের একের পর এক প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকল। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল যে, সে পুলিস-সার্ভিসে যোগ দিয়ে চোর গুণ্ডা বদমাসদের হাত থেকে সাধারণ মানুষের ধন-মান-জীবন রক্ষা করতে চায় এবং একাজ করতে গিয়ে প্রাণ দিতে হলেও সে কোনদিন কুণ্ঠিত হবে না। দশের ও দেশের জন্য নতুন করে চিন্তা করার দিন এসেছে আর এই চিন্তা যত বেশী মানুষের মনে ঢুকবে তত তাড়াতাড়ি দেশের মানুষের দৈনন্দিন যন্ত্রণার অবসান ঘটবে।

সকালে সুমিতা সরকার ও সন্ধ্যায় অভিরূপ ঘোষের মুখ থেকে একই ধরনের কথাবার্ত্তা শুনে সাংবাদিকগণ চেয়ার ছেড়ে উঠে একে-একে তাদের দুজনকে হ্যাণ্ডশেক করে বললেন, 'আপনাদের দু-জনের আদর্শ এক, আপনাদের ভবিষ্যত কর্ম্মে সফলতা কামনা করছি, আর এও কথা দিচ্ছি যে, যতদিন আমরা এই সাংবাদিকের তল্পি পিঠে নিয়ে বেড়াব আপনাদের সমস্ত শুভ প্রচেষ্টাকে সাধারণ্যে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করব, নিখাদ ভালবাসা ও আন্তরিক শুভেচ্ছার স্পর্শ দিয়ে আপনাদের দু-জনের প্রত্যেকটি সৎ প্রচেষ্টাকে জনসমক্ষে তুলে ধরব।' সুমিতা ও অভিরূপ সাংবাদিকদের এ-কথার প্রত্যুত্তরে তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে মিষ্টান্ন ও চায়ে আপ্যায়িত করল, তারপর তাঁদের সদর দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিল। সাংবাদিকদের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে অভিরূপ গিয়ে মামা-মামীকে প্রণাম করলে তাঁরা প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'আমরা তো জানতাম তুমি ফার্ষ্ট হবে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমরা দু-জনে আরও বড় হও।'

প্রণাম সেরে অভিরূপ পুনরায় সুমিতার ঘরে এসে ঢুকল এবং দেখল সুমিতা তখন একটা ছোট ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সামান্য সাজ গোছ করছে। সে চুপিচুপি গিয়ে হঠাৎ তার চোখদুটো টিপে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'কি, এত সাজ কিসের!' 'যাও তোমার জন্য সেজেছি নাকি?' বলে চোখ দুটোর উপর থেকে অভিরূপের হাত সরাতে চেষ্টা করল কিন্তু অভিরূপ চোখ ছেড়ে দিয়ে তার কাঁধের কাছে চেপে ধরে সুমিতাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে তাকে সজোরে বুকের উপর জাপটে ধরল। সুমিতা হঠাৎ এই অস্বস্তির মধ্যে পড়ে বলল, 'প্লীজ অভিরূপদা প্লীজ, আমাকে ছেড়ে দাও সকাল থেকে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছি, তুমি আর আমায় এভাবে দিশেহারা করে দিও না।'

তার কথায় অভিরূপ বুঝল যে, সুমিতা তার কাছে ধরা দেবার জন্যই সর্ব্বদা উন্মুখ হয়ে রয়েছে, কিন্তু পাছে অভিরূপ কিছু ভাবে বা সেই দিনের মত সংযমের কথা বলে বসে তাই নিজেকে নির্ম্মম

ভাবে সংযত করে রেখেছে। তাছাড়া রমণীর রমণীয় ধন লজ্জা, সেই জন্মগত লজ্জারূপ সংযমের সোনার শিকল সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে। অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলা সুমিতার কথা শুনে অভিরূপ বলল, 'আর একটু থাক, তোমার ভয় নেই। তুমি ভেঙ্গে পড়তে চাইলেও আমি তোমাকে ভাঙতে দেব না, কারণ তুমিই আমার সারাজীবনের কর্ম্মের সঙ্গিনী। তুমি ভেঙ্গে পড়লে আমি অসহায় হয়ে পড়ব। সুতরাং তোমাকে ঠিক রাখার দায়িত্ব আমার।' 'কিন্তু তোমার বুকে নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে আমি কি ঠিক থাকতে পারি! আমার যে ভীষণ কষ্ট হয়,' বলে সুমিতা মুখ তুলে অভিরূপের দিকে তাকাল। অভিরূপ বলল 'এটা তোমার পরীক্ষা, যত কষ্টই হোক এ পরীক্ষায় তোমাকে পাশ করতেই হবে। জীবনে কারও প্রতি বিশেষ দুর্বলতা রাখলে তুমি দেশ সেবার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবে কি ভাবে? আমি যদি কোন দিন অন্যায় নির্দ্দেশ দিই তাহলে কি আমার প্রতি দুর্ব্বলতার বশে তুমি নিজের বিবেককে জলাঞ্জলি দেবে?' অভিরূপের কথাগুলো যে অন্য অর্থে বলা সেটা বুঝে সুমিতা বলল, 'কখনই নয়, অন্তরে তুমি আমার দেবতা, কিন্তু বাইরে তুমি অন্যায় কম্যাণ্ড দিলে এই আমিই বিদ্রোহিনী হয়ে উঠতে বিন্দু মাত্র দেরী করব না, প্রয়োজনে তোমার বুকেও গুলি চালাব,' বলতে-বলতে সুমিতা ছিটকে অভিরূপের কাছ থেকে দূরে সরে গেল, আর অভিরূপ বলল, 'সাবাস, এই না হলে মাতঙ্গিনীর দেশের, লক্ষ্মীবাইয়ের দেশের মেয়ে, সত্যি সুমিতা, তোমাকে দেখলেও মন ভরে যায়, তোমার মত যদি হাজার খানেক মেয়ে এদেশে থাকত!'

অভিরূপের ক্ষেদোক্তি শুনে সুমিতা আবার ঝলসে উঠল, বলল, 'আছে আছে অনেক আছে, আমার মত অনেক মেয়ের বুকের মধ্যে ধিকিধিকি জ্বলছে তুঁষের আগুন, বারুদের ছোঁয়া পেলে তারা ঠিক ঝলসে উঠবে, তবে কতদিনে যে সেই বারুদের ছোঁয়া অর্থাৎ নেতাজীর মত আর একজন ক্ষাত্রতেজে উদ্দীপ্ত মানুষের সাক্ষাৎ পাবে কে জানে।' সুমিতার সঙ্গে-সঙ্গে অভিরূপও আবেগপূর্ণ মুগ্ধকণ্ঠে একবার উচ্চারণ করল, 'নেতাজী, নেতাজী সুভাষ বোস।'

নামটা উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে তার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, দু-চোখের তারায় যেন বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে গেল। নেতাজীর কথা ভাবতে গিয়ে একে একে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশগ্রহনকারী কত বীর শহীদের কথাই তার মনে পড়ল, যাঁদের সে চোখে কোনদিন দেখে নি কিন্তু তাঁদের বীরত্বের কথা বই পড়ে জেনেছে। হাজার-হাজার তরুণ শহীদের রক্তে রঞ্জিত, হাজার-হাজার নির্য্যাতিতা নারীর মর্য্যাদার বিনিময়ে অর্জ্জিত স্বাধীনতা নিয়ে কি ছিনিমিনি খেলাই না চলেছে সারা দেশে। শতাব্দীর সাধনায় অর্জ্জিত স্বাধীনতার যেন কোন মূল্যাই নেই, এ স্বাধীনতা যেন বাড়ীতে বাগানের গাছের পাকা আমটি ছিল ইচ্ছা হয়েছে আর টুপ্ করে পেড়ে নিয়ে দেশবাসীর হাতে ভোগের জন্য ভাগ করে দিয়ে গেছেন আমাদের স্বাধীনতাকামী, জীবন-যৌবন-পাত কারী পূর্ব্বপুরুষগণ! আজকের মানুষের মনোভাব প্রায় এইরকম। কথাটা মনে হতেই স্বদেশ বাসীর একাংশের প্রতি ঘৃণায় তার মনটা পূর্ণ হয়ে উঠল। সুমিতাকে কাছে ডেকে অভিরূপ বলল, 'দেখ মানুষের সেবা, সমাজের সেবা দেশের সেবা করতে গেলে তখত্-তাউশ থেকে নেমে কাদা-মাটির উপর হেঁটে, বনে-বাদাড়ে পথ তৈরী করে সর্ব্বস্তরের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। একেবারে তাদের বাড়ীর উঠোনে গিয়ে পৌঁছনো দরকার। বাংলায় একটা কথা আছে, উঠোন দেখলে ঘর বোঝা যায়! তার অর্থ হলো কারও বাড়ীর উঠোন যদি পরিষ্কার থাকে তো ঘরের ভিতরটাও পরিষ্কার থাকাই স্বাভাবিক, তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে পারলেই তবে তাদের সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনা, চাওয়া-পাওয়ার কথা জানতে পারা যায়। দূর থেকে দূত মারফত বা কতকগুলো পেটোয়া লোক মারফত সংবাদ নিয়ে মানুষের যন্ত্রনা লাঘব করা সম্ভব নয়।' সুমিতা অভিরূপের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে বলল, 'সে তো ঠিকই, রোগী না দেখে লোকের মুখে রোগলক্ষণের কথা শুনে চিকিৎসা করলে কি রোগ সারে? ভুল ওষুধে শুধু ডাক্তারের বদনাম হয়। রোগীর কাছে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওষুধ দিলে তবেই রোগ নিরাময় করা যায় কিন্তু আমাদের দেশের

ডাক্তারগণ অর্থাং ঐ উপরওয়ালারা কেউই কোনদিন তা করেন না, সাধারণ মানুষের থেকে অনেক দূরে সুরক্ষিত প্রাসাদে বসে শুধু মাত্র ফতোয়া জাহির করেই খালাস! এ-যেন সেই পুরাতন জমিদারী প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তন! আর আমরা বুঝছি না যে এতেই আমাদের দেশেব জনগণের সর্ব্বনাশ ঘটে যাচ্ছে।'

কথায়-কথায় বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল, মামীমার ডাকে দু-জনের চমক ভাঙ্গল এবং আহারেব জন্য খাবার ঘরের দিকে পা বাড়াল। খেতে-খেতে সারাদিনের ঘটে যাওয়া মজার ঘটনাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে-করতে এক সময় খাওয়া শেষ করে সবাই উঠে পড়ল। এরপর সতীনাথ বাবুর ঘরে বসে,' অভিরূপ সুমিতা ভবিষ্যৎ কর্ম্মসূচী নিয়ে তাঁর সঙ্গে কিছুটা আলোচনা করল এবং অভিরূপ সতীনাথ বাবুর খাটে তাঁর পাশেই শুয়ে পড়ল। সুমিতা মামার খাটের মশারির ধারগুলো ঠিক ঠাক করে দিয়ে মামীমাকে সঙ্গে নিয়ে এসে নিজের ঘরে ঢুকল। মামীমা নীচে মেঝেয় একটা বিছানা করে নিলে সুমিতা মেঝেয় মামীমার কাছেই শুয়ে পড়ল। সারাদিনের কর্ম ক্লান্ত শরীরে প্রায় শোয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সুরুচি গভীর নিদ্রায় মগ্ন হলেন, সুমিতার কিন্তু ঘুম এল না। সারাদিনের সমস্ত উত্তেজনাময় পরিস্থিতি তার মনের ভিতর তোলপাড় করতে লাগল। একসময় তার তেষ্টা পেতে বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে ঘরের একপাশে রাখা গেলাস থেকে জল পান করল, এ-সময় অভিরূপের কথা মনে পড়তেই ঘরের ছিটকিনি খুলে বাইরে বের হয়ে এল এবং মামার ঘরের ভিতরের দু-জনের গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ ভিন্ন কোন কিছু শুনতে পেল না। তার মন চাইলেও এ নীরব নিশীথে অভিরূপকে ডেকে গল্প করতে চাওয়াটা সমস্ত শোভনতা ও শালীনতার বাইরে, হঠাৎ একথাটা মনে হওয়ায় সুমিতা ত্রস্ত পদে নিজের ঘরে এসে ছিটকিনি তুলে দিয়ে আবার বিছানায় প্রবেশ করল।

অভিরূপ স্বভাবশান্ত, সুমিতাকে প্রাণপণ ভালবাসলেও তার মধ্যে কোন চঞ্চলতা নেই, তাই পাশের ঘরেই সুমিতা মামীমার কাছে শুয়ে

আছে জেনেও তার মনের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হল না, শুধু ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসবার মুহূর্ত পর্য্যন্ত সুমিতার হাস্যময়ী মুখখানি তার দু-চোখের সামনে ভেসে রইল এবং এক সময় ক্লান্ত হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল। সুমিতা যে প্রাণের টানে তারই দরজার বাহিরে হতে তার গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে অনস্নুভূতপূর্ব এক অভিমান বুকের মধ্যে ভরে নিয়ে গিয়ে পুনরায় নিজের বিছানায় ঢুকল এ খবর অভিরূপ জানল না।

পরদিন যথারীতি ঘুম থেকে উঠে অভিরূপ বারান্দায় মামাবাবুর পাশে বসে মামীর দেওয়া চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছে এমন সময় দু'খানা খবরের কাগজ এসে বাড়ীর উঠোনে পড়তেই সুশান্ত গিযে তাড়াতাড়ি কাগজ দু-খানা কুড়িয়ে আনবার সময় কাগজের দিকে চোখ পড়তেই তার মুখটা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি 'এই দেখ' বলে বাংলা কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতেই সতীনাথবাবু ও অভিরূপ দেখল প্রথম এবং দ্বিতীয় কলামে রমাথায় তার আর সুমিতার ছবি আর হেডিং, 'ইতিহাস সৃষ্টিকারী দুই ছাত্র ছাত্রী।' অভিরূপ একবার দেখে কাগজের উপর থেকে মুখটা সরিয়ে নিল, কিন্তু সতীনাথ বাবু ওখান থেকেই, 'কই গো, কই গো', বলে চিৎকার করে সুরুচিকে ডাকতে লাগলেন। সুরুচি কাছে আসতেই বললেন, 'দ্যাখ দ্যাখ, সুমিতা-অভিরূপের জন্য আমাদের দু-জনেরও কাগজে নাম বেরিয়ে গেল,' বলে তিনি সমস্তটা পড়ে শোনাতে লাগলেন।

রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়ায় সুমিতা ভোরের দিকটায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাই বাইরে বারান্দায় যে খবরের কাগজ নিয়ে এতকাণ্ড ঘটে গেল তা সে বুঝতে পারেনি; পারল তখন, যখন সুশান্ত এসে, 'য়্যাই দিদি, য়্যাই দিদি ওঠ না,' বলে ধাক্কা দিয়ে তাকে তুলে দিল। সুমিতা ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে সুশান্ত তার হাত ধরে টানতে-টানতে বলল, 'চল না বাইরে, একটা মজা দেখবে।' 'কি আবার মজা দেখাবি এত ভোর বেলায়?' বলে সুমিতা বাইরে আসতেই অভিরূপ বলে উঠল,

বেলা সাতটাতেও আজকাল ভোর থাকছে নাকি? তোমার তো দেখি খুব ঘুম। এত বেলা পর্য্যন্ত পড়ে-পড়ে ঘুমোও কি করে?' এ কথায় সুমিতা বলতে গিয়েও বলতে পারল না যে, তোমার জন্য শুধু তোমারই জন্য সারা রাত দু-চোখের পাতা এক করতে না পেরে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কি করে বলবে, একথা কি বলা যায়! তাও আবার মামা মামীর সামনে? তাই তার কথায় কোন উত্তর না দিয়ে সুমিতা বারান্দায় বেসিনের কাছে গিয়ে নিজের মুখে-চোখে জল দিয়ে পেষ্ট-ব্রাশ তুলে নিয়ে বাথরুমে প্রবেশ করল। মিনিট বিশেক পরে বাথরুম থেকে যখন বের হল তখন তার স্নান-টান সব সারা। তার দিকে তাকিয়ে অভিরূপের মনে হল এ যেন প্রভাতের সূর্য্যমুখী, একেবারে ঝরঝরে তাজা ফুলের মতন। সুমিতা যে ইতিমধ্যে এত রূপবতী হয়ে উঠেছে তা তো অভিরূপ কোন দিন লক্ষ্য করেনি! আজ এই মুহূর্তে তার মনে হল এ-যেন অন্য সুমিতা, এ যেন অন্য এক শোভনাঙ্গী রূপোত্তমা সুমিতা! এ যেন সেই বর্দ্ধমান জেলার অজ পাড়াগাঁয়ের সুমিতা সরকার নয় এ যেন অত্যন্ত মাননীয়া স্পৃহনীয়া অন্য এক রমনী, যার দিকে তাকালে অন্তরে শ্রদ্ধা ও অননুভূতপূর্ব্ব এক আকর্ষণ জেগে ওঠে।

বাথরুম থেকে বের হয়ে নিজের জামা কাপড়গুলি উঠোনের তারে মেলে দিচ্ছিল সুমিতা আর অভিরূপ চা খেতে খেতে তার দিকে বারে বারে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। দেখে যেন তার আশ মিটছিল না, তাই তার প্রতিটি পদবিক্ষেপের সঙ্গে অভিরূপের দু-চোখের মনি দুটোও চোখের ভিতরে থেকে সুমিতার চলা ফেরার ছন্দে নিঃশব্দে নৃত্য করছিল। কিছুতেই অভিরূপ সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না। প্রভাতী সূর্য্যের সোনালী আলোর মত এক সোনালী চিন্তা তখন তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সে ভাবছে তবে কি ভালবাসলে এই রকমই হয়! এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে সুমিতাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু সেটা অত্যন্ত রুচিহীন গর্হিত কাজ বুঝে অভিরূপ চুপচাপ বসে রইল।

ওদিকে কাপড় জামার জল নিঙরে সেগুলোকে তারে টাঙ্গিয়ে দিয়ে সুমিতা যেই বারন্দায় উঠতে যাবে অমনি দরজার বেলটা বেজে উঠল। বেলটা বাজতেই সুশান্ত ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল আর সঙ্গে-সঙ্গে পাড়ার অনেক তরুণ, প্রবীন, বৃদ্ধ মিলিয়ে প্রায় জনা বিশেক মানুষ হুড়-মুড় করে সতীনাথ বাবুর উঠোনে ঢুকে পড়লেন এবং বলতে শুরু করলেন, 'ওঃ, আপনি মশাই আচ্ছা মানুষ তো সতীনাথবাবু? আপনার ভাগ্নী যে এতবড় স্কলার তা তো কোনদিন বলেন নি? ওঃ কি চাপা মানুষ আপনি, য়্যাঁ? কইরে সুমিতা মা-মণি কই?' বলে হাঁক দিতেই বারান্দা থেকে সুমিতা নেমে উঠোনে গিয়ে হাজির হল। সুমিতা সেখানে হাজির হতেই খান-বিশেক ফুলের তোড়া আর এক গাদা সন্দেশের প্যাকেট তার দু-হাত পূর্ণ করে বুকের উপর জমা হতে থাকল। সে তাড়াতাড়ি বলল, কই অভিরূপদা এগিয়ে এসো, ধর এগুলো, দেখছ না আমার কি অবস্থা! তার কথা শুনে অভিরূপ এগিয়ে আসতেই সুমিতা তাড়াতাড়ি তার সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিল এবং কাগজে তার পাশেই অভিরূপের ছবিটা দেখিয়ে দিল।

অভিরূপও যে ইউনিভার্সিটির আর একটি জুয়েল এবং সম্পর্কে সতীনাথ বাবুদের নিজের লোক জানতে পেরে উপস্থিত সকলে আনন্দে হৈ হৈ করে উঠল এবং ওঁদেরই মধ্যে থেকে একটি ছেলে ছুটে বের হয়ে গিয়ে চটকরে অভিরূপের জন্য আলাদা করে একগাদা ফুল ও মিষ্টি নিয়ে হাজির হল। ব্যাপার দেখেশুনে সুরুচি ও সতীনাথ বাবু উঠোনে তাঁদের পাশে নেমে এসেছিলেন। উপস্থিত পাড়ার ছেলেদের মধ্যে একজন বলল, 'ওঃ এ যে কল্পনাই করতে পারছি না, সুমিতাদি এত চুপচাপ থাকেন অথচ…।' তার কথা কেড়ে নিয়ে সুরুচি বললেন, 'তোমাদের কারও কিন্তু এক্ষুনি যাওয়া চলবে না, মিষ্টিমুখ করে চা খেয়ে তবে ছাড়ান পাবে।' উপস্থিত সকলে তৎক্ষণাৎ, 'হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই' বলে যে যেখানে পারল বসে পড়ল। তাঁদের এই ভাবে স্বেচ্ছায় ফুল মিষ্টি নিয়ে হৈ হৈ করে বাড়ী

ঢোকা, মিষ্টি-মুখ করার কথায় বিনা আসনে ধুলোবালির উপর যত্রতত্র বসে পড়া দেখে অভিরূপের ও সুমিতার মনটা আনন্দে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠল। তারা ভাবতে লাগল, তাহলে এখনও আশা আছে, পরের আনন্দে উচ্ছল হবার মত বা পরের দুঃখে কাতর হবার মত লোকের সম্পূর্ণ অভাব তাহলে এদেশে এখনও হয়নি। অভিরূপ ও সুমিতা নিজেদের মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় করে নিল। সুমিতা এরপর মামীমাকে সাহায্য করবার জন্য ঘরে ঢুকে গেল এবং মিনিট দশেকের মধ্যেই এসে সকলের হাতে জলখাবারের প্লেট ধরিয়ে দিল। আরও মিনিট দশেকের ভিতর চাও এসে গেল। সতীনাথ বাবুর বাড়ীর বাতাসে আনন্দের হিল্লোল তুলে পাড়ার সমাজিকগণ বিদায় নিলে সতীনাথ বাবু শান্ত কণ্ঠে সুরুচিকে বললেন, 'সুমি-মা আর অভিরূপের জন্য আজ থেকে পাড়ায় আমাদের সম্মান আরও বেড়ে গেল', সুরুচি সংক্ষিপ্ত জবাবে বললেন, 'সবই ঈশ্বরের করুণায়।'

সংবাদ পত্র মারফৎ গ্রামে গিয়ে খবরটা পৌছতেই গোটা করুচি গ্রাম এবং আশপাশের দু-চার খানা গ্রামে আনন্দের জোয়ার বইতে শুরু করল, কারণ ইতিমধ্যেই নানা রকম ঘটনার এবং শকুন-ঘটিত ব্যাপারগুলোর জন্য অভিরূপ ও সুমিতা তাদের গ্রামে ও তদঞ্চলে এমন কি প্রায় সারা জেলাতেই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। ইচ্ছায় না হলেও কিছুটা ভীতিতে অভিরূপ ও সুমিতা সম্বন্ধে স্থানীয় মানুষের মনে একটা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব জন্মেছিল তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় দু-জনেই দু-টি বিষয়ে প্রথম হয়েছে শুনে তাদের দেখার জন্য লোক-জনের মনে প্রবল আগ্রহের সঞ্চার হল। অভিরূপ ও সুমিতাকে দেখার জন্য আশপাশের গ্রাম থেকে দলে দলে লোক কুরচিতে মুরারিবাবু ও ভৈরববাবুর বাড়ীতে এসে যখন শুনল যে তারা কলকাতায়, তখন হতাশ হল।

ওদিকে দিন দুই পরে সমস্ত উত্তেজনার অবসান হলে অভিরূপ ও সুমিতা একদিনের জন্য গ্রামে এসে নীরবে গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে পর দিন আবার কলকাতায় ফিরে গেল। অভিরূপ ও

সুমিতা এটা ইচ্ছা করেই করল, কারণ রেজাল্ট নিয়ে এত হৈ হৈ তাদের কারোরই বিশেষ ভাল লাগছিল না। তাদের মনে সব সময়ই শঙ্কা জাগছিল পরের পরীক্ষায় ফল যদি ভাল না হয় তো নিজেদের মর্য্যাদা হারাতে হবে, তাই তারা কলকাতায় ফিরেই চুপচাপ আবার পড়াশুনায় মেতে উঠল।

যথাসময়ে আই, পি. এস এবং আই এ এস এর রেজাল্ট বের হলে দেখা গেল এ-তুটি পরীক্ষাতেও অভিরূপ ও সুমিতা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এবার আরও বছর দেড়েক পরে তারা আইনের ডিগ্রীও নিল, আইন পরীক্ষায় অভিরূপ ফার্ষ্ট ও সুমিতা দ্বিতীয় স্থান দখল করল. তাদের তু-জনের মোট নম্বরে মাত্র তু-নম্বরের তফাৎ হল। আবার কাগজে ছবি, আবার জনে-জনে সম্বর্ধনা, এবার অভিরূপ আর কাউকে বাধা দিল না। ব্যক্তিগত ভাবে যে যেভাবে খুশী তাদের সম্বধিত করল, অভিরূপ ও সুমিতা তা হৃষ্টচিত্ত গ্রহণ করল, কিন্তু তদানীন্তন উপরওয়ালাদের একজন যখন নাগরিক সম্বর্ধনার আয়োজন করে তাদের নিমন্ত্রণ জানালেন তখন অভিরূপ ও সুমিতা একযোগে সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে চিঠি লিখে জানিয়ে দিল যে, 'মানুষের সেবার জন্য যাঁরা নিয়োজিত, যাঁরা নিজেদের মানুষের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ বলে দাবী করে থাকেন অথচ আসল কাজ কিছুই করেন না তাঁদের হাত থেকে লোক দেখানো পুরস্কার নিতে আমাদের লজ্জা বোধ হয়, তাই আপনাদের সম্বর্ধনা সভায় যোগ দিতে পারলাম না। আমাদের এই অনুপস্থিতিকে যদি ধৃষ্টতা বলে মনে হয় তবে স্ব-গুণে মার্জনা করে নেবেন। আপনাদের মনে যদি কোনদিন সত্যিকারের সেবামূলক চিন্তার উদয় হয়, মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করবার আগ্রহ জন্মে, যদি দেখি যে ধূলো কাদা মেখে, সাধারণ মানুষের তুঃখ-তুর্দ্দশার সঙ্গী হয়ে আপনারা পথেঘাটে ঘুরে জনসেবামূলক কাজকর্ম্ম করছেন সেইদিন আমরা নিজেরা যেচে হাঁটু গেড়ে আপনাদের পদতলে বসে আপনাদের দেওয়া পুরস্কার হাতে তুলে নেব।'

অভিরূপ সুমিতার ব্যক্তিগত উপস্থিতির পরিবর্ত্তে চিঠিখানা যথাসময়ে সম্বর্ধনা সভায় পৌছল এবং একজন পাঠ করলেন। চিঠির বয়ান শুনে সেখানে উপস্থিত উপর-ওয়ালাদের কয়েকজন সমেত সমবেত জনতা এবং সাংবাদিকগণ হৈ হৈ করে উঠল। আজ পর্যন্ত এ-দেশের ইতিহাসে এরকম সৎসাহস খুব কম সংখ্যক তরুণতরুণীই দেখাতে পেরেছে, বরং সম্বর্ধনা ও মানপত্র নেবার জন্যই ঘর থেকে লোকে টাকা গুঁজে দেন, এ ধারণাই সকলের আছে আর মাত্র পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের তু-তুটি তরতাজা তরুণ তরুণীর এতবড় সৎসাহস দেখে সবাই একেবারে তাজ্জব বনে গেল। কেউ বলল, 'ঠিক হয়েছে', এখনও এ দেশে তাহলে বাঘের বাচ্চার অভাব হয় নি' কেউ বলল, 'কি সাহস'! আবার কেউ কেউ অতি উৎসাহে সম্বর্ধনা সভাস্থলে উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছ-থেকে ঠিকানা জোগাড় করে অভিরূপের মেসে ও সুমিতার মামার বাড়ীতে তু-জনকে দেখবার জন্য রওনা হল।

পরদিন এইরকম অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনার বিবরণ শুনে সারা দেশের লোকের অন্তর আলোড়িত হয়ে উঠল, আর উপরওয়ালারা তাদের প্রতি দেশের তু-তুটি স্কলার তরুণ তরুণীর চাপা ক্রোধ ও আন্তরিক ঘৃণার অভিব্যক্তি দেখে আত্মসমীক্ষায় বসে গেলেন। তাঁদের নিজেদের মধ্যে অনেক আলাপ-আলোচনা-কথান্তর-মতান্তর শেষে একদল উপরওয়ালা অভিরূপ-সুমিতার নির্দ্দেশিত পথকেই ঠিক পথ বলে মত দিলেন। অধিকাংশ উপরওয়ালাই সুমিতা অভিরূপের স্বপক্ষে দেখে অন্য উপরওয়ালারা চুপ করে গেলেন, কিন্তু তাঁরা ভিতরে-ভিতরে এতবড় অপমানের প্রতিশোধ নিতে তৎপর হয়ে উঠলেন। দুর্বৃত্তের ছলনার অভাব হয় না, তাই দিন ক্ষণ ঠিক করে অনুষ্ঠান করে, তাঁরা অভিরূপের গ্রামে এসে উপস্থিত হয়ে তাকে সম্বর্ধিত করতে চাইলেন। এ ব্যাপারে অভিরূপ-সুমিতার আন্তরিক ইচ্ছা না থাকলেও গ্রামের এবং আশ-পাশের তু-দশখানা গ্রামের লোকের চাপে পড়ে অবশেষে তাদেরও রাজী হতে হল, কিন্তু এ-ভাবে

উপযাচক হয়ে এসে সম্বর্ধনা দানের মধ্যে একটা কিছু বিশেষ ব্যাপার আছে এ-সন্দেহ অভিরূপ ও সুমিতার মনে-মনে জেগে রইল।

নির্দ্ধারিত দিনে অসংখ্য পুলিস ও পারিষদ সহ উপরওয়ালারা যথাসময়ে সম্বর্ধনা সভার নামে কুরচি গ্রামের সেই খেলার মাঠে হাজির হলেন। এবার কিন্তু পরিস্থিতি অন্যরূপ। এতদঞ্চলের দশ-বিশখানা গ্রামের লোক আগে থাকতেই মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ করে রেখেছিল। মাঠের মধ্যে উপরওয়ালারা এবং খান দুয়েক পুলিসের গাড়ী ঢুকতেই নীরবে ধীরে-ধীরে তারা সকলকে ঘিরে মাঠের মধ্যে মঞ্চের চার পাশটায় খুব ঘন করে আটকে রাখল। মন্টুর সাঙ্গপাঙ্গদের হাতে টাঙ্গীর ফলাগুলো ঝকঝক করছিল। সব দেখে শুনে উপরওয়ালারা বুঝলেন যে, সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে ফেলে এরা তাঁদেরই ঘিরে রেখেছে কিন্তু তবু কাজ হাসিল করবার উদ্দেশ্যে মঞ্চ থেকে একজন উপরওয়ালা হুকুম দিলেন সভায় যাদের হাতে অস্ত্র আছে তারা যেন অবিলম্বে পুলিসের কাছে অস্ত্র জমা দেয়। দু-তিনবার ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর ভীড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলল, 'দুটো ছেলে-মেয়েকে মালা দিয়ে মিষ্টিমুখ করাতে আসবার সময় বন্দুকধারী এত পুলিস কেন সঙ্গে আনা হয়েছে আমরা তার কৈফিয়ৎ চাই। সম্বর্ধনা সভার সঙ্গে পুলিসের বন্দুকের কি সম্পর্ক আমরা তার জবাব চাই। মঞ্চ থেকে কে একজন পারিষদ জবাব দিল, 'ওরা উপর-ওয়ালাদের নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে এসেছে, এটাই নিয়ম।' এবার বিপ্লব মঞ্চের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'এদেশে কি উপরওয়ালারাই একমাত্র মানুষ, বাকী সবাই গরু, ভেড়া? উপরওয়ালাদের জীবন রক্ষার জন্য যদি পুলিসের দল ও বন্দুক টোটার প্রয়োজন হয় তাহ'লে আমাদের জীবনের জন্যও টাঙ্গীর প্রয়োজন আছে। আগে পুলিস বন্দুক রেখে দিক তাহলে আমরাও এই পাঁচ হাজার টাঙ্গী রেখে দেব' বলে সে তার নিজের হাতের টাঙ্গীটা উঁচু করে তুলে ধরতেই সঙ্গে সঙ্গে মাঠের চারিদিক থেকে পাঁচ হাজার মতন টাঙ্গী একেবারে বিষধর সাপের ফনার মত চক চক করে উঠল।

বিপ্লবের কথায় মঞ্চে উপবিষ্ট একজন উপরওয়ালা যিনি এর আগে একবার অভিরূপের পায়ে ধরে মার্জ্জনা ভিক্ষা করে ছিলেন সেই গণদাস মাল হঠাৎ একজন পুলিস অফিসারকে নির্দ্দেশ দিলেন বিপ্লবকে য়্যারেষ্ট করবার জন্য। এবার পুলিসের মধ্যে থেকে জনা দশেক সিপাহী বন্দুক উঁচিয়ে বিপ্লবকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'খবরদার, কেউ একে য়্যারেষ্ট করতে এলে জান নিয়ে ফিরতে পারবে না, খবরদার, বলে তারা বিপ্লবকে ঘিরে দাঁড়াল!'

ভিড়ের মধ্য থেকে এতক্ষণে অভিরূপ ও সুমিতা মঞ্চের দিকে এগোতে লাগল, তারা যেন এসব ব্যাপার কিছু জানে না এমনভাবে এগোতে লাগল। বিপ্লবের কাছ পর্য্যন্ত এসে অভিরূপ একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল পুলিসের যে সিপাহীরা বিপ্লবকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তারা দুবছর পূর্ব্বের সেদিনের সসম্মানে মুক্তি প্রাপ্ত সেই সিপাহী দশজন। অভিরূপ তাঁদের দিকে চেয়ে মাথা নীচু করে তাদের সম্মান জানাল এবং মঞ্চের নীচে দাঁড়িয়েই উপরওয়ালাদের অনুরোধ করল তাদের গলায় মালা দিয়ে তাদের সম্বর্ধিত করবার জন্য। তাদের কথায় উপরওয়ালাদের একজন তাদের দুজনকে মঞ্চে উঠবার জন্য ইঙ্গিত করতে অভিরূপ ও সুমিতা একসঙ্গে সজোরে বলে উঠল, 'আমরা এই বিপুল জনতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই বিপুল জনতাকে যদি মঞ্চে তুলে নিতে না পারি তো আমাদেরও ঐ-সুসজ্জিত মঞ্চে উঠবার কোন অধিকার নেই, এই সরল গ্রাম্য দীন দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষগুলির স্নেহ ভালবাসাময় সান্নিধ্য থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে মঞ্চে উঠবার অধিকার আমাদের নেই। আমাদের সম্বর্ধনা এই মাটিতে ধুলায় দাঁড়িয়েই হোক এই'ই আমরা চাই।'

তাদের কথা শুনে এবং জিদ দেখে গণদাস মাল পার্শ্বে উপবিষ্ট বড় উপরওয়ালার সঙ্গে কানে কানে কিছু যুক্তি করে দু-গাছা মালা হাতে দু-জনে মঞ্চের উপর থেকে নেমে নীচে দাঁড়িয়ে থাকা অভিরূপ ও সুমিতার গলায় মালা পরাতে গিয়ে সজোরে তাদের গলা দুটো চেপে ধরলেন, আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বেঁটে এবং বীর এসে দুজনের

দুটো কান ছিঁড়ে নিয়ে জনতার মাঝখানে উড়ে গিয়ে পুলিশগুলোর পায়ের কাছে ফেলে দিল। যন্ত্রণায় কাতর উপরওয়ালারা তখন-পাখীগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে কান চেপে ধরে পুলিসদের দিকে চেয়ে নির্দ্দেশ দিলেন 'ফায়ার'। একসঙ্গে পুলিসের তিরিশ বত্রিশখানা বন্দুক গর্জ্জে উঠল কিন্তু ঐ একবারই মাত্র। দ্বিতীয় বার আর কাউকে বন্দুকের ট্রিগারে হাত দিতে হল না তার আগেই শয়ে শয়ে শকুন এসে ছোঁ মেরে, ঠোক্কর মেরে ঐ ক-জন পুলিসের লোককে বিপর্য্যস্ত করে তুলল!

শকুনের ছোঁয়ের আঘাতে এবং ধারালো ঠোঁটের আঘাতে কারও কান গেল, কারও চোখ গেল, কারও গালের এক খাবলা মাংস গেল, সবাই ভয়ে তখন বন্দুক ফেলে যে যেদিকে পারল দৌড়তে শুরু করল কিন্তু পালাতে চেষ্টা করলেও কারও যাবার উপায় নেই, কারণ মণ্টুর দল তখন সম্পূর্ণ শিক্ষিত এক সৈন্য বাহিনীর মত পাহাড়ের অটল ধৈর্য্য নিয়ে গোটা মাঠ ঘিরে রেখেছে। পালাতে গিয়ে মণ্টুর দলের লোকের হাতে টাঙ্গীর ফলা দেখে ভয়ে আর্ত্তচিৎকার করতে করতে তারা ফিরে এসে মঞ্চের নিকট দণ্ডায়মান যন্ত্রণায় কাতর দুই উপরওয়ালার পায়ের তলায় পড়ে লুটোপুটি করতে লাগল। পুলিস বাহিনীর হাতের বন্দুকগুলো মাটিতে পড়ে যেতেই অভিরূপের নির্দ্দেশে তার দলের কয়েকজন বন্দুকগুলো কুড়িয়ে উপরওয়ালাদের পায়ের কাছে এনে জড় করে দিল। বিপ্লবের পাশে দণ্ডায়মান দশজন পুলিসও তাদের বন্দুক থেকে টোটাগুলো বের করে বিপ্লবের হাতে দিয়ে বন্দুকগুলো ছুঁড়ে উপরওয়ালাদের পায়ের কাছে নিক্ষেপ করল এবং সমস্বরে চিৎকার করে, 'আজ এই মুহূর্ত থেকে আমরা আর এই উপরওয়ালাদের গোলামী করব না। আজ থেকে আমরা এই অভিরূপ ঘোষ আর সুমিতা সরকারের তথা জনতার গোলাম,' বলে জনতার দিকে তাকিয়ে পুলিসি কায়দায় স্যালুট দিয়ে জনতার সঙ্গে মিশে গেল।

এবার অভিরূপ সুমিতা এগিয়ে এসে উপরওয়ালাদের দিকে

চেয়ে বলল, 'এবার কি করবেন ভাবছেন? এতক্ষণ তারা দুজন অবাক হয়ে অভিরূপ ও সুমিতার কাণ্ডকারখানা দেখছিলেন। প্রাণ ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে তাঁরা অভিরূপ ও সুমিতার পায়ে ধরে মার্জনা চেয়ে নিয়ে চলে যেতে চাইলেন এবং বললেন যে, 'আমরা কথা দিচ্ছি এ গ্রামে আর কোন দিন কোন ঝামেলা হবে না।' অভিরূপ ও সুমিতা গম্ভীর কণ্ঠে তাদের দুজনকে ধমকে উঠে বলল, 'না, তা হবে না, এত সহজে আপনাদের ছাড়া হবে না। তা ছাড়া শুধু এ গ্রামের ঝামেলা নয়, সমস্ত দেশ ব্যাপী কোন গ্রামে, কোন শহরে কোন ঝামেলা হবে না বলে আপনাদের লিখে দিতে হবে।'

তাদের কথামত পাঁচহাজার লোকের সামনে দুজন উপরওয়ালা মুচলেকা লিখে সই করে দিলেন এবং হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আবার যেতে চাইলেন, কিন্তু অভিরূপ ও সুমিতা আগের মতই গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'না আপনাদের এখনও অনেক কাজ বাকী এরই মধ্যে যাবেন কি?' উপরওয়ালা দুজন তখন যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট মুখে নিজেদের কানের দিকে ইঙ্গিত করে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললেন, 'যন্ত্রণায় শরীর বিবশ হয়ে যাচ্ছে, দয়া করে আমাদের ছেড়ে দাও।' পাশ থেকে বিপ্লব বলল, 'নিজের শরীরের যন্ত্রণাটাই কেবল যন্ত্রণা বলে মনে হয়? অন্যদের উপর অত্যাচার করবার জন্য যখন সাকরেদ পাঠান, তখন মার খেয়ে তাদেরও যে এরকম যন্ত্রণা হয় সেটা কখনো ভেবেছেন? আজ সারারাত এই মাঠে আপনাদের আটকে রাখা হবে।' বিপ্লবের কথা শুনে উপরওয়ালা দু-জন কেঁদে ফেললেন এবং অভিরূপ ও সুমিতার দিকে চেয়ে করুণ স্বরে বললেন, 'তাহলে তো আমরা মরেই যাবো!' বিপ্লব বলল, 'তার আমরা কি করব? শয়তানী করতে গিয়ে নিজেরাই তো শেষে কানকাটা হয়ে গেলেন!'

সুমিতা বিপ্লবকে ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে এবার উপরওয়ালাদের কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'না কাকাবাবু আপনাদের মরতে আমরা দেব না, আজ আমরা নিজের হাতে আপনাদের সেবা করব আর আপনারা দু-জন ঐ পুলিসদের দেখা শোনা করবেন।' কাকাবাবু

সম্বোধনে চমকিত হয়ে উপরওয়ালা দুজন অভিরূপ ও সুমিতার দিকে বিস্ময়ান্বিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই তাঁদের মনের কথা বুঝে অভিরূপ বলল, 'হ্যাঁ আজ থেকে আপনারা আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় কাকাবাবু। ক্ষমতায় মদমত্ত হয়ে পারিবারিক, লৌকিক এবং জন্মগত সম্পর্কের কথাও আজকাল আপনারা ভুলে গেছেন, তাই সুমিতা কথাটা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিল। নিজেদের ব্যক্তিগত মতামত জবরদস্তিতে জাহির করতে গিয়ে, নিজেদের কুটনীতিগত দক্ষতা প্রদর্শন করতে গিয়ে বিপরীত বা বিরুদ্ধ-পক্ষ হিসাবে যাদেরকে শত্রু বলে মনে করে খতম করার অভিযানে মাতেন তারা যে আপনাদেরই ঘরের ছেলে মেয়ে, এ কথা আপনারা ভুলে যান, তাই এ-কথা আজ মনে করিয়ে দিতে হল। আপনাদের প্রতি আমার শকুন-বাহিনী যে অত্যাচার করেছে সেটুকুর অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। অবশ্যই এর জন্য আমরা আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।'

অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে হত্যার চেষ্টার পরেও যে টগবগে ফুটন্ত দুই তরুণ তরুণী তাঁদেরকে কাকাবাবু বলে সম্বোধন করতে পারে, এ যেন কল্পনারও অতীত। মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করে একটু আগে যে হাত দিয়ে তাঁরা অভিরূপের ও সুমিতার গলা টিপে ধরতে গিয়েছিলেন সেই হাত দিয়েই তাদের দুজনকে বুকে টেনে নিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে, 'এতদিন পরে আমাদের সত্যিকারের শিক্ষা সমাপ্ত হল, আমরা আজ নিশ্চিত ভাবে বুঝলাম যে, তোমাদের পথই সত্যিকারের পথ, তোমাদের শকুন বাহিনীই সত্যিকারের যোদ্ধ-বাহিনী,' বলে দু-জনকে দুই হাতে ধরে দু-জন উপরওয়ালা মঞ্চে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এর পর থেকে এ-দেশের শাসন ভার অভিরূপ-সুমিতার মত যোগ্য তরুণ তরুণীদের হাতেই ন্যস্ত হওয়া উচিত। সমবেত জনতার নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এর পরের বারে যেন অভিরূপ-সুমিতার মত সত্যিকারের জনগণ-অনুরাগী তরুণ-তরুণীদের উপরেই দেশের শাসন ভার ন্যস্ত করা হয়।' এরপর তাঁরা নিজেরাই 'জয় সুমিতা সরকারের জয়, জয় অভিরূপ ঘোষের জয়,'

বলে ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। তাঁদের জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মাঠে উপস্থিত জনতা অভিরূপ-সুমিতার জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল।

স্লোগান কিছুটা থামতে এবার অভিরূপ-সুমিতা দ্বৈত-কণ্ঠে ধ্বনি তুলল, 'জয় শকুন পাখীর জয়, জয় শকুন বাহিনীর জয়।' সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র কণ্ঠে শকুন বাহিনীর জয় ধ্বনি আকাশে বাতাসে মন্ত্রিত হয়ে উঠল, আর ঠিক তক্ষুনি সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে লক্ষ্য করল আকাশ থেকে সহস্র সহস্র ফুল পাতা মাঠে এসে পড়ছে। জনতার বুঝতে বাকী থাকল না যে এই সমস্ত ফুল পাতা বর্ষণ উপরে উড়ন্ত সহস্র শকুনের দলেরই কীর্ত্তি। তারা অপার বিস্ময়ে আকাশের দিকে চেয়ে আবার জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল, 'জয় শকুন বাহিনীর জয়, জয় মানুষের জয়, জয় জনতার জয়।'